বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধীনে এম, ফিল গবেষণার থিসিস

খতীবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রাঃ) ও তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা।

মোঃ নেছার উদ্দিন

এম,ফিল গবেষক

উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া

অধ্যাপক

উর্দূ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ- ৩০/০৬/২০০৮

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধেয় আব্বা

ও

পরম শ্রদ্ধেয় আম্মাকে

সূচী পত্র

সংকেত পরিচয়

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রাঃ)

(স.)	ঃ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ্ তাঁর উপর ঃ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)।
(আ.)	ঃ আলাইহিস সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।
(রা.)	ঃ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।
(র.)	ঃ রহমাতুল্লাহি আল্লাইহি (তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক)।
হি.)	ঃ হিজরী ।
খ্রী.)	ঃ খ্রীষ্টাব্দ/ খ্রীষ্টাব্দে
(ব.)	ঃ বঙ্গাব্দ/ বঙ্গাব্দে
ই.বি.	ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ।
স.ই.বি.	ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ
স.ই.বি.প	ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট।
অনু.	ঃ অনুবাদ/ অনূদিত।
ইফাবা	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তা.বি	ঃ তারিখ বিহীন।
সম্পা.	ঃ সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ/ সম্পাদিত

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উর্দূ বিভাগের এম, ফিল গবেষক জনাব মোঃ নেছার উদ্দিন কর্তৃক এম, ফিল ডিগ্রীর জন্যে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে দাখিল কৃত, "খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ)ও তার বিপ্লবী চিন্তা ধারা" শীর্ষক এম,ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ, তত্ত্বাবধানে প্রনয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম,ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চুড়ান্ত কপি অদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম,ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্যে অনুমোদন করছি।

ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া
সাবেক চেয়ারম্যান
অধ্যাপক
ফার্সী ও উর্দূ বিভাগ,
উর্দূ বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ।

ঘোষনা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষররকারী এ মর্মে ঘোষনা প্রদান করছি যে, খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ও তাঁর বিপ্লবী চিন্তা ধারা শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা অংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

মোঃ নেছার উদ্দিন
এম,ফিল, গবেষক
উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যে যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃজন করেছেন। কুরআন শিখিয়ে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন। সালাত আর সালাম তাঁর প্রতি যিনি জগৎবাসীর প্রতি রহমত সরূপ, যাঁর আদর্শে গড়ে উঠে ছিলেন সাহাবা, তাবেঈন, তাবউত তাবেঈন, আইয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন, ফুকাহা, মুজাদ্দেদ্বীন, উলামা মাশায়েখ ও দ্বীনের সহীহ দায়ীগন, আলোচ্য অভিন্দর্ভটি এমনই একজন ব্যক্তিত্বের যিনি তৎকালীন পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের ইমান, আমল শানিত করে সিরাতুল মুস্তাকীমে আনার জন্যে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত স্বীয় শক্তি সামর্থ, মেধা, বুদ্ধিমত্তা, লিখনী, বক্তৃতা, নিঃস্বার্থ ভাবে উৎসর্গ করেছেন। তিনি হলেন খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ)।

পরম করম্নণা ময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে "খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ও তাঁর বিপস্নবী চিন্তাধারা" শিরোনামে এ অভিনন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরে খুবই আনন্দ বোধ এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এ জন্যে আমার এ গভেষণা কর্মের তত্ত্ববধায়ক ও আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উর্দূ বিভাগের বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ড.জাফর আহমদ ভূঁইয়াকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেননা আমার রচিত অভি নন্দর্ভের গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সূচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা, নিরলস আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা গবেষনা কমিটিকে মান সম্মত করে তুলেছে। তাঁর এ ঋন পরিশোধ যোগ্য নহে।

আমার এ গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাওয়ার পথে যাঁরা আমাকে সর্বদা উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সর্বোত ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে জনাব মাহমুদুর রহমান, জনাব আব্দুল মুকতাদির (রহঃ) এর নাম উল্লেখ না করে পারলাম না।

আমার এ গবেষনা কর্ম চালাতে গিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও ব্যক্তি থেকে উপাত্ত, উপকরণ সংগ্রহ করেছি তম্মধ্যে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, আল হেলাল পাঠাগার, রামু, শাহ ওলী উল্ল্যাহ একাডেমী, চট্টগ্রাম, দারম্নল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম, পটিয়া মাদ্রাসা, কক্সবাজার মশরফিয়া মাদ্রাসার উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ নুরম্নল করিম হেলালী, সাতকানিয়া পদুয়া হেমায়েতুল ইসলাম মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল জনাব আলহাজ্ব মাওলানা সরওয়ার

কামাল আজীজী, চট্টগ্রাম ওমর গণী কলেজের সহ অধ্যপক জনাব আ,ফ,ম খালিদ হোসেন। চট্টগ্রাম দারুল্ল মাআরিফের অধ্যক্ষ মুহতারাম মাওলানা সুলতান জওক নদভী ও তার ব্যক্তিগত পাঠাগার, একই মাদ্রাসার অধ্যাপক জনাব মাওলানা ফুরকানুলল্লাহ ছাহেব, খতীবে আজমের ছাহেব জাদা বৃদ্ধ, রামগতির চরকলা কোপা কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ আমানাতুলল্লাহ, চন্দ্রগঞ্জ কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ নোমান, খতীবে আযমের ব্যাপারে যে সকল উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন যে গুলোর কারণে আমার অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ হয়েছে, তাদের ঋণ কোন দিন ভুলবোনা। বিশেষ করে পদুয়া হেমায়েতুল ইসলাম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শাহ ওয়ালী উল্ল্যাহ একাডেমীর মহা পরিচালক জনাব মাওলানা সরওয়ার কামাল আজীজী (দাঃ বাঃ) তার নিজ চোখে দেখা খতীবে আযমের বিভিন্ন দিক আমার নিকট খুব চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। সে জন্যে তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আরো অনেক সুধী ও পন্ডিতবর্গের কাছ থেকে যেসব মূল্যবান পরামর্শ, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ ক্ষেত্রে আমার পরম শ্রদ্ধা ভাজন পিতা হযরত মাওলানা শায়খ আহমদ অধ্যক্ষ, ছয়ানী ইমামিয়া ফাজিল মাদরাসা, নোয়াখালী। আমার পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান। আমার শ্রদ্ধেয় শশুর জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুলল্লাহ ছাহেব, বি, ডি, আর, ইমাম, এবং আমার জীবন সঙ্গীনী যার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এ গভেষনা কর্মটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। এ ছাড়া ও নানা বিধ প্রতিকূলতার মাঝে গবেষনা কর্মটি সম্পাদন করার সময় আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহস দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সে জন্যে তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারক বাদ।

পরিশেষে, নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীর সৌদিয়া কম্পিউটারের অপারেটর আমার স্নেহধন্য ছোটভাই ফয়জুলল্লাহ মুহাম্মদ নাজমুছছায়াদাত অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে যে সহযোগীতা করেছে তাও স্বরণ করার মতো। অনেক প্রতিকুলতার মাঝে সে আমার গবেষনা কর্মটি নির্ভূল ভাবে কম্পোজ ও প্রিন্ট করতে সর্বোত ভাবে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব কাছেমী অভিসন্দর্ভটি প্রুপ দেখার কাজে যে সহযোগিতা করেছেন তা ভুলবার মত নয়। আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

নিবেদক–

মোঃ নেছার উদ্দিন

মোঃ নেছার উদ্দিন

এম,ফিল গবেষক

উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপক্রনমিকা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে যে সব নিষ্ঠাবান খোদাভীরু আলেম ইসলামী শিক্ষা, প্রাজ্ঞ আদর্শের বিস্তার ও এর স্থায়িত্ব বিধান কল্পে কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পূর্ন দক্ষতা সহ অসংখ্য ওলামা তৈরী করে গেছেন। খতীবে আযম ছিলেন সে সব মহান ব্যক্তিত্বেরই একজন। তিনি এক দিকে কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ জ্ঞানের মশালকে প্রজ্জলিত করেছেন অন্য দিকে ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন ও মূল্যবোধকে উপমহাদেশে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আন্দোলন করেছেন। ইলমে দ্বীনের সেবার সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের শিক্ষা আদর্শ বাস্তবায়ন কল্পে আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শ্রেষ্ঠ আলেম ও সংগ্রামী নেতা। তিনিই ছিলেন এদেশের ওলামা ঐক্যের সর্বশেষ মাধ্যম। যার যুক্তি আহ্বানের প্রতি ছিল আলেম সমাজ ও দেশের ইসলামী জনতার আকুণ্ঠসমর্থন।

মননশীল ব্যক্তিরা সাধারণত জ্ঞানের দু একটি শাখায় আপন সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে থাকেন। কিন্তু মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) এর মতো এমন সৃষ্টি ধর্মী প্রতিভায় বিরল। যিনি জ্ঞানের প্রায় সবকটি শাখায় মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেগেছেন। তিনি যেমন ছিলেন কুরআন সুন্নাহ এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞানে সু-পণ্ডিত, তেমনি ছিলেন আধ্যাত্মিক আকর্ষন যুক্ত এক অনবর্ষী বক্তা, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, দার্শনিক, দেশ বিখ্যাত বাগ্নী, উপ-মহাদেশখ্যাত মোহাক্কেক ও সুপন্ডিত আলেম। ইসলামী অনুশাসনের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণকারিতাকে তিনি এতই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় যুক্তি তর্ক দিয়ে উপস্থাপনে স্বক্ষম ছিলেন যে, তাঁর বক্তৃতার অংশ বিশেষ শোনার পর তা শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন শ্রোতা স্থান ত্যাগ করতে পারতো না। গ্রামগঞ্জে অনুষ্ঠিত অনাড়াম্বর ওয়াজ মাহফিল থেকে শুরন্ন করে বিশ্ব বিদ্যালয় এবং উচ্চতর বুদ্ধি বৃত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহে সমান সার্থকতার সাথে তিনি ইসলামের প্রকৃষ্ট তাত্বিক নিদর্শনাদি ব্যাখ্যা করে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

খতীবে আজম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ছিলেন বৃহত্তম বাংলায় সর্বাধিক ভাবে নন্দিত ওলামাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তিত্ব। যিনি ছিলেন চমৎকার বুদ্ধি মত্তা। বিচক্ষনতা এবং অমিত বিক্রম বিজতা সহকারে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পদস্থ এবং প্রতিষ্ঠিত কর্তা ব্যক্তি এবং নেতৃবৃন্দের সাথে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সমান সমান পালস্না দিয়ে ব্যক্তিগত প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে স্বক্ষম। তিনি তার ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা আধুনিক সভ্যতা, জীবনবোধ ও আধুনিক জাহিলিয়াত থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী ছিলেন। ইমান আকীদাহ হরনকারী আধুনিক জিজ্ঞাসা চ্যালেঞ্জের দাঁতভাঙ্গাঁ জবাব দিতেন। তাঁর সমকালে তাঁর

মত যুক্তিবাদী আলেম না থাকলে, আধুনিক জাহিলিয়াতের ভিত এদেশে আরো বহু বহু মজবুত হয়ে যেতো। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) এর মাধ্যমে বহু পথহারা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিই কেবল পূর্ণরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসেননি, দেশের ওলামায়ে কিরাম ও তাঁর আন্দোলনে নতুন ভাবে আত্ম চেতনা ফিরে পান।

খতীবে আযম তার সমকালে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন বিদয়াত, শিরক, কবর পূজা, পীরপুজা, ইত্যাদি কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ মুফতী এ, আযম মাওলানা ফায়জুলস্নাহ সাহেবের শুরু করা সংস্কার আন্দোলন খতীবে আজমের দ্বারাই জোরদার হয়ে উঠে। সুবিধাবাদী ও বিদ'আত শিরকে লিপ্ত পীর ফকীরদের দ্বারা ইসলামের মূল শিক্ষা আদর্শ মুছে যাবার উপক্রম হলে মুফতী এ.আযম এ সংস্কার আন্দোলন শুরম্ন করে ছিলেন।

খতীবে আযম (রহঃ) উদ্দেশ্য ছিল পুরা পবিত্র কুরআনের হক আদায় করার, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আলস্নাহর প্রদত্ত জীবন বিধান নির্বিবাদে চালু করার, তাই তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করার আন্দোলনে এবং ভারত বিভাগের পর অবিভক্ত পাকিস্থান ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করেন। ১৯৫৪ সালে খতীবে আযম যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়যুক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান এসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইসলামী শাসন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি এসেম্বলির ভিতর এবং বাইরে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। আইয়ুব খানের দীর্ঘ দশ বছরের শাসনামলে হৃত মৌলিক অধিকার, বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন এবং ডক্টর ফজলুর রহমান কর্তৃক তৈরী করা অনৈসলামিক পারিবারিক আইনের বিরম্নদ্ধে পরিচালিত সকল আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। পাকিস্তান আমলে মাওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বে যে সময় জমিয়তে ওলামা এ ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি সারা দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন জোরদার করে তোলে, সে সময় তাঁর দক্ষিণ হস্থ বরং অন্যতম নেতা হিসাবে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা আতহার বার্ধক্যজনিত কারণে জমিয়ত ও নেজামে ইসলামের নেতৃত্ব ত্যাগ করার পর খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ তাঁর অপর সহকর্মী মাওলানা সাইয়্যেদ মোছলেহুদ্দীনকে নিয়ে এ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন।

খতীবে আযম বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। ২২মাস পর তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে দেশে সামরিক বিপস্নবের পর নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, খেলফতে রব্বানী প্রভৃতি ৫টি সংগঠনের লোকদের উদ্যেগে ইসলামী ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে খতীবে আযমকে নেতা করে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডি এল) গঠিত হয়। খতীবে

আযমের নেতৃত্বে আইডিএল-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়। অবশ্য তার পূর্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সীরাতুন্নবী সম্মেলন সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর পটভূমি রচিত হয়ে আসে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে আইডিএল-এর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ১৯৮৭ সালে একটি সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তখন এ সংগঠন থেকে ৬জন প্রার্থী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁরা ছিলেন ঃ (১) মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম। (২) মাষ্টার শফিকুলস্না। (৩) মুহাম্মদ সিরাজুল হক। (৪) মাওলানা আবদুস সোবহান। (৫) মাওলানা গোলাম সামদানী। (৬) মাওলানা ফকীর আবদুর রহমান।

নানা কারণে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) এর আঙ্গদলসমূহ পরে নিজ নিজ সংগঠন পূর্নবহালে মনোযোগী হলে নেজামে ইসলাম পার্টি পুনর্জীবিত হয় এবং তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান মুরব্বী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইসলাম ও মুসলিম জাতির এ মহান খাদেম ইলমে দ্বীনের প্রসার দানে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে এবং বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভ্রান্ত মতাদর্শের যুক্তি খণ্ডনের মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাতে যে অবদান রেখে গেছেন, এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে ভবিষ্যত কর্মীদের জন্যে তা চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্রদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগের চাহিদার প্রতি সঙ্গতি রেখে তিনি একটি সিলেবাস প্রণয়ন করেছিলেন, যা পুস্তিকা আকারে বেরিয়েছে। বাংলা ভাষার চর্চা, কথা ও লিখিত আধুনিক আরবী সাহিত্যের শিক্ষাদান সংক্রান্ত তাঁর চিন্তাধারা ইদানিং বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এ চিন্তাধারার ভিত্তিতে নতুন মাদ্রাসাও গড়ে উঠছে। আইয়ুব আমলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন, গঠন-প্রণালী, পাঠ্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে ৪০টি প্রশ্ন রেখেছিলেন মাওলানার কাছে। হযরত খতীবে আযম লিখিত আকারে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যলয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরেছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আরও অনেকের মতো মাওলানাও চিন্তাধারার ফসল ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) তাঁর ইলম, যুক্তি, বিতর্ক, অধ্যাপনা, রচনা, বক্তৃতা, রূহানিয়াত ও রাজনীতির মাধ্যমে চেয়েছিলেন এদেশে তন্দ্রাবিভোর মুসলমান, বিশেষত ওলামাদের হৃদয়ে ইসলামী বিপস্নবের অগ্নিশিখা জাগাতে। চেয়েছিলেন কালেমাপন্থী সব মুসলমানদের এক পতাকাতলে সমবেত করতে। অকাট্য যুক্তি দিয়ে তেজোদৃপ্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি এদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো দ্বীনে মুহাম্মদীর (সাঃ) আলোকে চেয়েছিলেন নতুন করে বির্নিমাণ করতে।

হায়াতের অভাবে মাওলানা এদেশে দ্বীন-এ-হককে বিজয়ী বেশে সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখে যেতে পারেননি, তবে তিনি আন্দোলনের যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে গেছেন, হয়তো তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন, এদেশের মসজিদের মিনার হতে আবার ধ্বনিত হবে নওবেলালের আযানের সুর।

ক্ষণর্জন্মা মনিষীদের এ মহান উত্তরাধিকার সার্থক ভাবে লালন পালন করতে পারলেই তাঁর বিদেহী আত্মা উত্তরোত্তর কৃতিত্বের অংশীদার হবে এবং এ মহাত্মার 'ফরয' বরকতে মুসলিম উম্মাহ আহরহ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতঃ সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে মহা স্রষ্টার অনুগ্রহের অধিকারী হবার উপলক্ষ্যে হবে বলে একান্ত আশা রাখি।

আর এ মহান টার্গেটকে সামনে রেখেই আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনা।

আল্লাহ্ আমাকে তাওফিক দিন।

খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ও তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা ঃ

প্রথম অধ্যায়

(১) খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) এর জীবন কথা ঃ

১. প্রাককথাঃ পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু ক্ষণ জন্মা মনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভা ও কর্মের মাধ্যমে সুধী সমাজ ও গন মানুষের হৃদয়াকাশের আদর্শ ও পাত্র হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল। খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম পুরোধী ব্যক্তিত্ব।

তাঁর বিকাশ সন্ধিক্ষণে (১৯০৫-১৯৮৭) বিশ্বের ইতিহাস সন্ধানে দেখা যায় সে সময় চীনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাওসেতুঙ্গ, পাক ভারতে জন্ম নিয়েছিলেন আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, সাউদী আরবে শেখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ, পাঞ্জাবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, পাকিস্তানে গোলাম আহমদ পারভেজ, বাংলায় জন্ম নিয়েছিলেন মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মদ ফায়জুল্লাহ, মাওলানা সামছুল হক ফরীদ পুরী, মাওলানা মোহাম্মদ উলস্নাহ হাফেজ্জী হুজুর ও খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ। আলোচ্য অধ্যায়ে মুসলিম মিল্লাতের মহান সেবক খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ এর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব

পারিবারিক জীবন

২. জন্ম বংশগত পরিচয় ঃ

বিংশ শতকের প্রথম দশকে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন বরইতলী নামে এক নিভৃত পল্লীর মধ্যবিত্ত এক সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে খতীবে আজম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ জন্মগ্রহন করেন।

যুগ সন্ধিক্ষণ ঃ

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং বিগত শতাব্দীর শেষ দশক ব্যাপী চীনে জন্মগ্রহণ করে মাওসেতুঙ্গ, মরহুম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, আল্লামা হাসান আলী নদভী, সউদী আরবে শেখ আবদুলস্নাহ বিন বাম, পাঞ্জাবে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানী, পাকিস্থানে

গোলাম আহমদ পারভেজ, বাংলায় জন্ম নিয়েছেন মুফতীয়ে আজম মাওলানা মোহাম্মদ ফয়জুলল্লাহ (রহঃ), মাওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) ও খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ)।

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যেখানে ফিরআউন আছে সেখানে মূসা (আঃ) থাকবেন। যেখানে আবু জেহেল, উৎবা, শায়বা সেখানে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), ওমর হামজা থাকাটা স্বাভাবিক। আকবরের মতো প্রতাপশালী সম্রাট যেখানে দ্বীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করার জন্য ক্ষমতার দাপটে উন্মত্ত, সেখানে আল্লাহ তার মোকাবেলায় তৈরী করেছেন মুজাদ্দিদে আলফেছানীর মত প্রতিবাদী পুরুষ। Check and Balance এ বিধান ঐশ্বরিক।

তাঁর পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ ওজিহুল্লাহ মিঞাজী, স্নেহময়ী মাতার নাম মোহতারেমা জুবায়দা খাতুন, নানার নাম আলাউদ্দীন মিঞাজী এবং দাদার নাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মিঞাজী।

সমাজে যাঁরা জনসাধারণকে ধর্মীয় শিক্ষা দান করেন তাঁরা মিঞাজী নামে পরিচিত।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রাপ্ত দাদা ও নানা উভয়ের রক্ত-ধারায় মাওলানার সত্তায় সঞ্জিবীত ছিল বলে সম্ভবতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনবদ্য কীর্তি রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল।

মরহুম মাওলানার প্রথমা ও দ্বিতীয়া সহধর্মীনির নাম যথাক্রমে মুহতারেমা চেমনআরা বেগম ও মুহতারেমা আরেফা বেগম তাঁর পুত্র সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন- হাফেজ মোহাম্মদ জুনাইদ, মোহাম্মদ হাবিবুল্লা, হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আহমদ, মোহাম্মদ কাউসার নোমানী, হাফেজ মোহাম্মদ রেজউল করিম ছিদ্দীকী ও মোহাম্মদ জিয়উল করিম ছিদ্দীকী। তাঁর কন্যা সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন সাইয়্যেদা সাঈদা, সাইয়্যেদা মুশতারী, সাইয়্যেদা কামরুন্নেছা হাসিনা, সাইয়্যেদা জোবাইদা বেগম তাবাচ্ছুম ও সাইয়্যেদা সুরাইয়া খানম সিমা।

৩. খতীবে আযম এর শিক্ষা জীবন ঃ

ক. প্রাথমিক শিক্ষাঃ

হযরত খতিবে আযম সর্বপ্রথম তাঁর পারিবারিক শিক্ষক মাওলানা নাদেরুজ্জামানের নিকট পবিত্র কোরআন ও প্রাথমিক বাংলা শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর স্থানীয় বরইতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করেন। গৃহ শিক্ষকের কাছে তিনি পঞ্চম ও চকরিয়া হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়া সমাপ্ত করেন। অতঃপর সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

খ. মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

যার হৃদয় অভ্যন্তরে বিপ্লবাগ্নি সুপ্ত রয়েছে তিনি তো দেশ ও জাতির দুঃখ দুর্দশায় নিরব থাকতে পারেননা তাই যখনই মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও করম চাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ করে আন্দোলনের স্বেচ্ছা সেবকের খাতায় নাম লেখান। খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে এর পর তিনি চকরিয়া শাহার বিল সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং এক বছরে আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক বইগুলো পড়া শেষ করেন।

অতঃপর তিনি বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় বিদ্যাপিঠ, উম্মুল মাদারিস চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল্ল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসার যে জামাতে মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা অধিক সে জামাতে ভর্তি হন। খুব সম্ভবত সে জামাত ছিল হাফতুম। এর জামাতে মিশকাত পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায় মুফতীয়ে আজম এর উপর খতীবে আযমের মন বসে যায়। তাই মাওলানার বড় ইচ্ছে হল মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ (রহঃ) এর নিকট তিনি 'মাইবুজী' নামক গ্রন্থটি পড়বেন, কিন্তু সময়াভাবে মুফতী সাহেব মাদ্রাসায় তাঁকে এ কিতাব পড়াতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অবশ্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, "আসরের নামাজের পর যখন আমি বাড়ী (মেখল) প্রত্যাবর্তন করবো তখন তুমি যদি বাইনজনী পর্যন্ত আমার সাথী হও তাহলে পথে পথে আমি তোমাকে এ কিতাব পড়াতে পারি।" মাওলানা রাজী হয়ে গেলেন। তিন মাসের মধ্যে তিনি এ কিতাব পাঠ সমাপ্ত করেন। কিতাব সামনে না রেখে মুফতী সাহেব যে সবক পড়াতেন মাদ্রাসায় ফিরে এসে মাওলানা সাহেব কিতাব খুলে আশ্চর্য হয়ে যেতেন যে কি হুবহু মিল।

রতনে রতন চিনে তাই হযরত মুফতিয়ে আযম (রহঃ) মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেবকে প্রাণ দিয়ে স্নেহ করতেন এবং নিজের সান্নিধ্যে রেখে তাঁকে ইলমে-আমলে-চরিত্রে বর্ধিত করেন। মাওলানার পাঠ্যবস্থায় হযরত মুফতীয়ে আযম (রহঃ) তিনবার তার বরই তলীস্থ বাড়ীতে আসেন। যোগাযোগ তখন আজকের মত উন্নত ছিলনা। কিছু পথ পদব্রজে, কিছু গাড়ীতে, কিছু নৌকায় এ ভাবে যেতে হতো। দাওরায়ে হাদীস পাশ করার তখনো দু' বছর বাকী; বরইতলীর দক্ষিণে লইড়্যার চরে তাঁর উদ্যোগে শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ শেষে হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) উপস্থিত শ্রোতমন্ডলীকে জানালেন "আমি তো আগামীকাল হাটহাজারী চলে যাবো, দ্বীন সম্পর্কে যে কোন প্রশ্ন আপনারা ছিদ্দীক

আহমদের নিকট করলে সন্তোষজনক উত্তর পাবেন।" মাওলানা এ ঘোষণায় অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, হুজুর আমি তো এখনো ফারেগ হইনি কি করে এত বড় দায়িত্বপালন করবো ? মুফতী সাহেব (রহঃ) অভয় দিলেন, "পারবে ইনশাআল্লাহ! আমি দোয়া করছি।" বড় মুফতী সাহেবের এ দোয়া ব্যর্থ যায়নি, অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে।

গ. উচ্চতর শিক্ষা ও ভারত গমন ঃ-

১৯২৬ সালে তিনি ভারতের সাহারানপুর মোজাহেরুল উলুম মাদ্রাসায় হাদীস, তাফসীর, ও ইসলামী আইনে উচ্চতর বিভাগে অধ্যয়ন করেন এবং "দাওরায়ে হাদীস" ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ভারতের প্রখ্যাত দ্বীনি শিক্ষায়তন দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত, অংক, জ্যামিতি, প্রাচীন জোতির্বিদ্যা, দর্শন, আইন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।

ঘ. যে সকল বিশিষ্ট আসাতেজাদের শিষ্যত্বের সুবাদে তিনি খতীব আযম হয়েছিলেনঃ

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমের মতে খতিবে আযম মাধ্যমিক শিক্ষা হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ (রহঃ), হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল (রহঃ), হযরত মুফতী মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহঃ) ও হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট লাভ করেন। ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে হযরত মাওলানা এজাজ আলী (রহঃ), হযরত মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) ও কারী মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণের নিকট হাসিল করেন। হাদীস তিনি সাহারানপুরের মাজাহের উলুম মাদ্রাসায় হযরত মাওলানা আবদুল লতীফ (রহঃ), হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান কামিলপুরী ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ) প্রমুখ মোহাদ্দিসগণের নিকট অধ্যয়ন করেন।

এছাড়া খতিবে আজমের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মাওলানা জাকের (রহঃ), হযরত মাওলানা আসায়দুল্লাহ (রহঃ), হযরত মুফতী জামিল আহমদ থানভী, হযরত মাওলানা আবদুশ শুকুর (রহঃ), হযরত মাওলানা মনজুর আহমদ (রহঃ) ও হযরত মাওলানা রাসুল খাঁ (রহঃ)।

ছাত্র জীবনে আন্দোলনের চেতনা ঃ

ছাত্র জীবনে তিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের (রহঃ) সংগ্রামী জীবনের সাথে এমন ভাবে পরিচিত হন যে, পরবর্তী সময়ে সেই সংগ্রামের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন। ঘরকুনো হয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতে সৈয়দ আহমদ শহীদ পরিচালিত জিহাদী আন্দোলন ও শায়খুল হিন্দের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং মিশরে হাসানুল বান্নার নেতৃত্বাধীন ইখওয়নুল মুসলেমীনের বিপ্লবী তৎপরতা ছাত্র জীবনে মাওলানার কচিমনকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে।

ঙ. শিক্ষা জীবনে খতীবে আযমের কৃতিত্ব ঃ

আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও ধী শক্তির অধিকারী মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ শিক্ষা জীবনের কোনস্তরে মেধা তালিকায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি, শুধু মাত্র দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন কালে সাহারানপুর মাদ্রাসায় জ্বর থাকার কারণে দুনম্বরের ব্যবধানে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

চ. মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ও তাঁর গুরু ভক্তি ঃ

উস্তাদের সাথে খতিবে আজম মরহুমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকতো সব সময়। তিনি উস্মাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন বিনীতভাবে। পরিণত বয়সে তাঁর খ্যাতি যখন দিকচক্রবালে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক সে সময়ে তাঁর বাল্য কালের এক হিন্দু শিক্ষকের সাথে দেখা হয় সাতকানিয়ায়। তিনি যে সম্ভ্রমের সাথে উক্ত শিক্ষকের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হলেন, উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলেন বিস্ময়ে। মনে হল মাওলানা যেন পাঠশালায় শিক্ষকের সামনে দাঁড়িয়েছেন ভয় মিশ্রিত উৎকণ্ঠায়।

মুফতীয়ে আজম হযরত ফয়জুলল্লাহ সাহেব (রহঃ) খতিবে আজমকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন এবং তিনিও পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন মুফতী সাহেবকে। ব্যক্তিগতভাবে মুফতী সাহেব কয়েকবার তাঁর বরইতলীস্থ বাসভবনে মেহমান হয়েছেন। খতিবে আযমের ইলমের প্রতি মুফতী সাহেবের ছিল অগাধ আস্থা। অনেক সময় দেখা গেছে মেখলে অথবা হাটহাজারী মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় খতিবে আযমকে ওয়াজের জন্য দাঁড় করে দিয়ে বড় মুফতী সাহেব মুগ্ধ শ্রোতার ন্যায় তাঁর হাতে গড়া ছাত্রের তত্ত্ব, তথ্য ও বিশেল্লষণাত্মক বক্তৃতা শুনতেন এবং তন্ময় হয়ে যেতেন আবেগে।

নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি সব সময় তাঁর শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ বড় মুফতী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়া নিতেন এবং দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিফহাল করতেন। পরিণত বয়সেও খতিবে আযম সাহেব বড় মুফতী সাহেবের সামনে দু'জানু হয়ে বসতেন এবং ছোট্ট ছাত্রের মত আচরণ করতেন।

শিক্ষান মাঝারি মেধার শিক্ষক যেমন ছিল তাঁর: তেমনি ছিল সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী অনেক যোগ্যতম শিক্ষক ও। কিন্তু মাওলানা ছিদ্দীক আহম্মদ কোন দিন জটিল প্রশ্ন করে মাঝারি মেধার উস্তাদদের বে-কায়দায় ফেলতেন বা এমন কোন আচরণ করতেন না যাতে করে কম মেধার উস্তাদগণের সম্ভ্রামে আঘাত হানে। মাওলানার সহপাঠি মরহুম মাওলানা আজিজুল হক সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যিনি চট্টগ্রামে শেরে বাংলা নামে অধিক পরিচিত। শেরে বাংলা সাহেব অনেক সময় মাঝারি মেধার উস্তাদদের জটিলতার প্রশ্ন করে বসতেন। খতিবে আযম সাহেব অবস্থা বুঝতে পেরে উস্তাদের পড়া হয়ে নিজেই তার উত্তর দিতেন। এতে করে শেরে বাংলা সাহেবের সাথে তাঁর ঝগড়া লেগে যেতো। শেরে বাংলা সাহেবের যুক্তি হচ্ছে আমি প্রশ্ন করছি আমার উস্তাদের কাছে তুমি উত্তর দাও কেন ? খতীবে আযমের যুক্তি হচ্ছে তুমি এমন সাধারণ প্রশ্ন করছো যার উত্তর আমার উস্তাদের দেয়া প্রয়োজন নেই আমরা ছাত্ররাও তার উত্তর দিতে সক্ষম। অতএব অযথা সময় নষ্ট করে কি লাভ। এভাবে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে খতীবে আযম সাহেব সম্ভাব্য নাজুক পরিস্থিতি থেকে মাঝারি মেধার উস্তাদদের মুক্তি দিয়ে মান ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করতেন। এসব উস্তাদগণের অন্তর থেকে খতীবে আজমের জীবন ক্রমোন্নতির জন্য অবলীলাক্রমেই অকৃত্রিম দোয়া বেরিয়ে পড়েছে।

"উস্তাদের সুদৃষ্টি ও দোয়াই আমার সাফল্যের চাবিকাঠি" একথা মাওলানা সব সময় বলতেন। ভারতের সাহারানপুর মাদ্রাসায় মুসলিম শরীফের অধ্যাপক ছিলেন মাওলানা আবদুর রহমান কামিলপুরী (রহঃ)। ফাইনাল পরীক্ষা তখন শুরু হয়েছে মুসলিম শরীফের পরীক্ষার আগের দিন বিকেলে মরহুম কামিলপুরী সাহেব মাওলানা ছিদ্দীক আহামদকে তাঁর কক্ষে ডেকে নিয়ে সিলেবাস বহির্ভূত অনেক বিষয়ে আলাপ করেন। এদিকে মাগরিবের সময় ঘনিয়ে এসেছে তিনি কামিলপুরী সাহেবকে আগামীকালের পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেন কিন্তু কামিলপুরী সাহেব ছাড়বার পাত্র নন, এভাবে এশা পার হয়ে গেছে। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব আগামীকালের মুসলিম শরীফের পরীক্ষা সম্পর্কে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন কারণ সে সময়টি ছিল পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্ত সব ছাত্রের জন্য মূল্যবান। অবশেষে তিনি কামিলপুরী

সাহেবকে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে আগামী কালের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সময়ের আবেদন করলেই উত্তরে কামিলপুরী সাহেব (রহঃ) যা বললেন তা অত্যন্ত তাৎপর্য বহ। "ছিদ্দীক আহম্মদ তোমাকে পাশে রেখে আলাপ করলে আমার হারানো পিতার স্মৃতি চারণ হয়। যাও আমি দোয়া করছি তুমি মুসলিম শরীফের উস্তাদ হতে পারবে।" আল্লামা কামিলপুরীর এ ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে যখন তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার অধ্যাপনা করতে এসে মুসলিম শরীফ পড়াবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হন।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে সাহারানপুর মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছে তখন। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব সব উস্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) দরবারে এসেছেন-ক'দিন পর আলস্নামা কামিলপুরী (রহঃ) ও দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে থানভীর পবিত্র খানকায় আসেন। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদের সাথে দেখা হতেই কামিলপুরী (রহঃ) বললেন, "থানাভূনে আসার দু'টি উদ্দেশ্য প্রথমত থানভী (রহঃ) এর দোয়া নেয়া এবং দ্বিতীয় তেমাকে শেষ বারের মত দেখা। আমার জন্য তুমি দোয়া করবে। আমিও তোমার জন্য দোয়া করবো। পত্রালাপ জারী রাখবে, স্বল্পকালীন এ দুনিয়ায় পূর্ণবার মিলিত হবার সম্ভাবনা নেই। আখেরাতে আমাদের দেখা হবে।" চার অশ্রুন্ন তখন জলে পরিপূর্ণ। শিক্ষক ছাত্রের সে উষ্ণ মধুর সম্পর্ক আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরল।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ) একদা ঘোষণা করেন যে, সাহারানপুর মাদ্রাসার বার্ষিক পরীক্ষার হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফের পরীক্ষার যে সর্বোচ্চ নাম্বার অর্জন করবে তাঁকে আমি এক সেট আবু দাউদের টিকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত "বজলুল মাজহুদ" পুরস্কার দেব। হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহম্মদ সাহেব (রহঃ) ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইরানী ও আফগানী ছাত্রদের পরাভূত করে রেকর্ড পরিমাণ নাম্বার পেয়ে এ পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৮১ সালে হযরত খতিবে আজম জ্ঞানের সমুদ্র এ মুহাদ্দিসকে মদীনা মনোওয়ারায় দেখতে যান। হযরত শায়খুল হাদীস তাঁর যোগ্যতম প্রাক্তন ছাত্রকে দেখে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর লিখিত বোখারী শরীফের শরাহ মাওলানাকে উপহার দেন।

তথ্য সূত্র ঃ ১) খতিবে আজম, আ ফ ম খালেদ হোসেন,

২) হাদিসে তথ্য ও ইতিহাস মওলনা নূর মহাম্মদ আজমী (রাঃ) পৃষ্ঠা নং-৩৩।

৩) প্রগুপ্ত

৪) প্রগুপ্ত

৫) সাময়ীকি "আফকার" সম্পাদক মাওলানা নূরুল করিম আনসারী, ৭ মে ১৯৮৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) এর কর্ম জীবন ও অবদান ঃ

ক. খতীবে আযমের অধ্যাপনা জীবন ঃ

খতিবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর প্রায় এক নাগাড়ে ৪৪বছর অধ্যাপনার মত মহৎ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পেশা নিয়েই তিনি তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা করেন।

(এক) ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সর্ব প্রথম (১৯৩১-৩২) ১বছরের জন্য কক্সবাজার জেলাধীন চকরিয়া শাহার বিল আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসায় যোগ দেন।

(দুই) তারপর হাটহাজারী মাদ্রাসার আসাতিযায়ে কেরামের আহ্বানে ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯৩২ সালে হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর এক নাগাড়ে শিক্ষকতা করে হাদিসের বিশেষজ্ঞ রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। নতুন কোন ওস্তাদকে প্রথমাবস্থায় হাদিসের কিতাব পড়াতে দেয়ার কোন নজীর হাটহাজারী মাদ্রাসায় নেই। তা সত্ত্বেও খতিবে আজমই এক মাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি যোগ দেয়ার সাথে সাথে মুসলিম শরীফের অধ্যাপনার সুযোগ লাভ করেন। কিছু দিনের জন্য "ফতোয়া বিভাগের" দায়িত্বও পালন করেন।

(তিন) ১৯৪৫ সালে তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার তৎকালীন প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহর (রহঃ) ইন্তেকালের পর অনিবার্য কারণে হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে অব্যহতি নিয়ে পুনরায় চকরিয়ার শাহারবিল আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৩ বছর তথায় শিক্ষকতা করেন।

(চার) এরপর ১৯৪৮ সালে তিনি কক্সবাজার জেলাধীন চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইসলামিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন এবং ৪ বৎসর তথায় উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষকতা করেন।

বরইতলীতে ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা স্থাপন ঃ

(পাঁচ) পরবর্তীতে তিনি নিজ গ্রাম বরইতলীতে 'ফয়জুল উলুম' নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

(ছয়) ১৯৬৬ সালে পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক মরহুম মাওলানা মুফতী আজিজুল হক সাহেবের আহবানে হযরত খতীবে আযম পটিয়া মাদ্রাসার "অনুবাদ ও রচনা" বিভাগে প্রধান পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে এ মাদ্রাসায় তিনি বোখারী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, এবং প্রচীন দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের উচ্চতর গ্রন্থের কৃতিত্বের সাথে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ মূহুর্ত অবধি তিনি "শায়খুল হাদীস" (প্রধান মুহাদ্দিস) এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পটিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার সাথে সাথে তিনি প্রায় ৪ বছর পর্যন্ত্ম আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারেস (মাদ্রাসা ঐক্য পরিষদ) এর সাধারণ সম্পাদক এবং ১৩৯৫ হিজরী হতে ১৪০১ হিজরী পর্যন্ত্ম পটিয়া আল জামেয়ার প্রধান শিক্ষা পরিচালকের (নাজেমে তালিমাত) দায়িত্ব পালন করেন।

খ. খতীবে আযমের অধ্যাপনার ফসল ঃ

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ছিলেন উপমহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় প্রথিতযশা আলেম এবং হাদীস শাস্ত্রের খ্যাতনামা সু-পন্ডিত। তাঁর সুদীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে বহুজ্ঞান পিপাসু তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত জ্ঞানের সুপেয়ধারা পানে তৃপ্ত হন। অনেক ছাত্র খতীবে আযমের কাছে বুখারী শরীফ পড়তে পারাটাকে গর্ব ও সৌভাগ্য বলেই মনে করতো। দারুল উলুম হাটহাজারী মাদরাসায় ১৪ বৎসর এবং পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদরাসায় এক নাগাড়ে ২২ বৎসর অধ্যাপনা কালে বহু মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ তাঁর তত্ত্বাবধানেই তৈরী হয়েছিলো।

খতীবে আযমের ইলম এর গভীরতার খ্যাতি অনারব সীমানা পেরিয়ে আরব উপদ্বীপ পর্যন্ত পৌছেছিল।

বিগত ৫ই মার্চ ১৯৮৩ এর ঘটনা ঃ

সুদূর সৌদী আরব থেকে আগত হারামাইন প্রশাসনিক দফতরের সচিব জনাব শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ আস সুরাইল পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার ৪৭তম বার্ষিক সম্মেলনে বায়না ধরলেন যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শায়খুল হাদীস খতীবে আযম

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) এর নিকট তিনি বোখারী শরীফের একটি হাদীস পড়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে ধন্য হবেন। বার্ধক্য জনিত দূর্বলতা সত্ত্বেও হযরত খতীবে আযম আস-সুবাইলকে হাদীসটি ব্যাখ্যা সহকারে পড়ান এবং সৌদী অতিথী খতীবে আযমের পবিত্র হাত ধরে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেখ মুহাম্মদ আস-সুবাইল বলেন, আজ আমার শিক্ষকদের তালিকায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য নামের সংযোজন ঘটলো এবং আমি সত্যি কৃতার্থ। পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার তরফ হতে সৌদী মেহমানকে অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করা হয়।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ খতীবে আযম মরহুমের (দরসে ক্লাস) এ বসে জ্ঞান অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এসব ছাত্রগণ এখন অধ্যাপনা তথা জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত ভাবে নজীর বিহীন বলেই প্রমাণিত।

১। জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ সাহেব, মহা-পরিচালক, আল-জামেয়াতুল ইসলামীয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২। জনাব মাওলানা মুফতী আহমাদুলহক, হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৩। জনাব মাওলানা হামেদ (রহঃ), সাবেক প্রধান পরিচালক হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৪। জনাব মাওলানা আব্দুল আজিজ, শায়খুল হাদীস, হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৫। জনাব মাওলানা আব্দুল কাইউম (রহঃ), মুহাদ্দিস, হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৬। জনাব মাওলানা হফেজুর রহমান সাহেব, (পীর সাহেব) মুহাদ্দিস, হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৭। জনাব মাওলানা নুরুল ইসলাম জাদীদ, মুহাদ্দিস, পটিয়া মাদ্রাসা।

৮। জনাব মাওলানা আহমদুর রহমান (রহঃ), সাবেক অধ্যক্ষ আলীয়া মাদ্রাসা, সাতকানিয়া চট্টগ্রাম।

৯। জনাব মাওলানা আজহারুল ইসলাম, পরিচালক কৈগ্রাম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

১০। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, অধ্যক্ষ, সাতকানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা চট্টগ্রাম।

১১। জনাব মাওলানা লোকমান, বার্মা।

১২। জনাব মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী, মুহাদ্দিস পটিয় মাদ্রাসা।

১৩। জনাব মাওলানা হাফেজ আনোয়ার, সম্পাদক আত তাওহীদ, ঢাকা।

১৪। জনাব মাওলানা রফিক আহমদ, মুহাদ্দিস, পটিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

১৫। জনাব মাওলানা সামসুদ্দীন, সহকারী মুফতী, পটিয়া মাদ্রাসা।

১৬। জনাব মাওলানা ছুরওয়ার কামাল আজিমি, পরিচালক, পদুয়া হেমায়েতুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।

১৭। জনাব মাওলানা ফায়জুলল্লাহ, পরিচালক, চরস্বা ছিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

১৮। জনাব মাওলানা মোজাহের আহমদ, রেক্টর হাশেমীয়া আলীয়া মাদ্রাসা, কক্সবাজার।

১৯। মাওলানা নাজীর আহমদ (রহঃ)

২০। মাওলানা নাদের সাহেব (রহঃ)

২১। মাওলানা ইসহাক সাহেব (রহঃ)।

২২। মাওলানা আবুল হাসান সাহেব, (মিশকাত শরীফের অনুবাদক-ভাষ্যকার)

২৩। মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব (রহঃ) (মিশকাত ও শরহে আকায়েদের অনুবাদক-ভাষ্যকার)

২৪। মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (রহঃ), কাকারা।

২৫। মাওলানা মেহেরুজ্জামান, রাঙ্গুনিয়া।

তথ্য সূত্র ঃ ১) খতিবে আজম, আ ফ ম খালেদ হোসেন,

তৃতীয় অধ্যায়

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) এর আধ্যাত্মিক জীবন ঃ

(ক) মুফতীয়ে আযমের সাহচর্যে ঃ

মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেবের (রহঃ) সাহচর্যে এসে তিনি সর্বপ্রথম রূহানিয়াতের সবক লাভ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনে তিনি দীর্ঘদিন মুফতীয়ে আজমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করে খিলাফত লাভ করেন। মুফতীয়ে আযম সাহেবের তিনি হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয় খলিফা।

একথা সবার জানা যে, বড় মুফতী সাহেব ব্যক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুন্নতে রাসূল (সাঃ) ও শরীয়তে মোহাম্মদীর (সাঃ) প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাওহীদ ও রিসালতের প্রতিষ্ঠা এবং বিদআত ও কুসংস্কারের প্রতিরোধের ব্যাপারে মুফতীয়ে আযম সাহেবের (রহঃ) উপর সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সুন্নতের ক্ষেত্রে এমন দৃঢ়চেতা ও আপোষহীন ব্যক্তির কাছ থেকে খিলাফত লাভ করা সহজ কথা নয়। মরহুম খতীবে আযম সর্ব প্রথম সে সৌভাগ্য অর্জনে সমর্থ হন।

খিলাফত লাভের ঘটনা ঃ

এছাড়া খতীবে আযম (রহঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আসগর হোসেন মিঞা সাহেবের সুযোগ্য খলিফা, সাতকানিয়া উপজেলার চুড়ামনি গ্রামের প্রখ্যাত ওলী মরহুম মাওলানা শাহ আহমদের রহমান সাহেব হতেও খিলাফত লাভ করেন। খতীবে আযমের এ খিলাফত প্রাপ্তিতে একটি অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। খতীবে আযম মরহুম ওয়াজের উদ্দেশ্যে একদিন সাতকানিয়া হয়ে বাঁশখালী যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আছরের সময় হওয়ায় নামাজ পড়ার জন্য তিনি চুড়ামনির শাহ সাহেব মাওলানা আহমদর রহমান (রহঃ) এর বাসভবন সন্নিকটস্থ মসজিদে উপস্থিত হন। নামাজ শেষে শাহ সাহেব তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ঠিক এক সময়ে একজন মহিলা আধ্যাত্মিক দীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে আসেন। মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে শাহ সাহেব বললেন আজকে একজন বড় মাওলানা এসেছেন তুমি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর। হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব এ কথায় একটু বিস্ময় প্রকশ করে বললেন, "হুজুর আমি তো খিলাফত প্রাপ্ত নই-বাইয়াত করাই কি করে" ? শাহ সাহেব উত্তরে বললেন "আমি বলছি-আপনি

বাইয়াত করান"। আসলে এটাই ছিল শাহ সাহেব মরহুম কর্তৃক হযরত খতীবে আযমকে খিলাফত প্রদান। দু'তিন দিন পর বাঁশখালীর সফর শেষে তিনি বরইতলী গ্রামে ফিরে এসে মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা ফয়জুল্ল্যাহ সাহেবের একটি ব্যক্তিগত চিঠি পান। সে চিঠিতে মুফতী সাহেব তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন। যেদিন এবং যে সময় চুড়ামনির শাহ সাহেব উক্ত মহিলাকে বাইয়াত করার জন্য তাকে হুকুম করেন। এতে বুঝা যাচ্ছে চুড়ামনির শাহ সাহেবের এ ব্যাপারে কাশফ হয়েছিল। বড় মুফতী সাহেব খিলাফত প্রদানের চিঠিতে রূহানিয়তের বিভিন্ন সবক উপদেশাবলীর সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের উল্লেখ করেন। "আমি তোমাকে এ শর্তে ইজাযত তথা খিলাফত প্রদান করছি যে যখনই তুমি আমার মধ্যে কোরআন এবং হাদীস বিরোধী কোন কার্যকলাপ দেখবে আমাকে সংশোধন করে দেবে।" শিষ্যের প্রতি, গুরুর মুরিদের প্রতি পীরের কতটুকু আস্থা থাকলে এবং আল্লাহর আহকাম পালন এবং সুন্নতে নববীর অনুসরণের প্রতি কতটুকু দৃঢ়তা থাকলে এরূপ কথা বলা সম্ভব তা সহজে অনুমেয়।

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী দরবারে, অবস্থান ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা গ্রহণ

ভারতের সাহারানপুর মোজাহের উলুম মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা সাধক পুরুষ হাকিমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) সান্নিধ্যে আসেন এবং ফারেগ হবার পর একাধারে ৪০ দিন তাঁর দরবারে অবস্থান করে তরিকতের সবক হাসিল করেন। পরবর্তীতে তিনি থানভী (রহঃ)এর বাইয়াত গ্রহণ করেন। দেশে ফিরার পর উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পত্র বিনিময়ও ছিল।

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ছিলেন আশৈশব মেধাবী ছাত্র। পুরো শিক্ষা জীবনে প্রায়ই ধীমান ছাত্রদের প্রথম কাতারে থাকতেন তিনি। সাহারানপুর মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তাঁর অবচেতন মনে একটু গৌবরবোধ ও অহংকারের সৃষ্টি হয়। গর্ব ও অহংবোধ ইলম ও জ্ঞানকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করে দেয়। "এ শ্বাশত সত্য উপলব্ধি করতে পেরে তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁর পীর হযরত থানভীর (রহঃ) দরবারে উপস্থিত হন এবং মনের এ অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। আত্মার রোগ নিরাময়ের জন্য থানভী (রহঃ) নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন যা শুধু তখনকার সময়ের জন্য নয় বরং সব সময়ের জন্য আত্মার রুগীদের এক মহৌষধ। আল্লামা থানভী (রহঃ) বলেন- "তুমি এখন থেকে প্রত্যেক দিন ফরজ নামাজের পর সর্বাগ্রে মসজিদ থেকে বের হয়ে মুসলল্লীদের এলোমেলোভাবে রেখে যাওয়া জুতাগুলো সোজা করে দেবে।"

হযরত খতীবে আযম (রহঃ) পীরের এ ব্যবস্থাপত্র নিয়ে সাহারানপুর ফিরে আসেন এবং আমল শুরু করে দেন। দশ দিনের মধ্যে তাঁর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়। মনে হতে লাগলো তিনি যেন সবার চাইতে নিকৃষ্ট। এ মসজিদের সব নামাজী তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ। অন্তরের এ পরিবর্তিত অবস্থা বর্ণনা করে তিনি পুনরায় হযরত থানভীর (রহঃ) কাছে চিঠি লিখেন। উত্তরে থানভী (রহঃ) লিখেছেন- "এটাই ছিল উদ্দেশ্য।"

হাকিমুল উম্মতের এ শিক্ষা আমৃত্যু খতীবে আযম সাহেব এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি। প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হয়েছেন, যুগ শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছেন, নেজামে ইসলাম ও আই.ডি.এল এর প্রধান হয়েছেন এবং জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে দেশ বিদেশে খ্যাতিমানও হয়েছেন কিন্তু 'গর্ব' ও 'অহংকার' মাওলানার জীবনে কোনদিন ছায়াপাত করেনি। এ দু'টি শব্দ তাঁর অভিধানে যেন ছিলনা।

পীর মুরিদী সিলসিলা ঃ

মরহুম মাওলানা পীর-মুরিদী সিলসিলায় খুব বেশী সময় দিতে পারেননি। অবশ্য যে কেউ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করতেন তিনি তাঁকে বিমুখ করতেন না। চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো তাঁর অনেক মুরীদ রয়েছেন। মাওলানার কোন "খলিফা" ছিল কিনা তাঁর কোন লিখিত বিবরণ ও পাওয়া যায়নি। তবে মরহুম মাওলানার পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ ছোহাইব নোমানী নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে খতিবে আযম (রহঃ) খিলাফত দিয়েছিলেন বলে আমাকে জানিয়েছেন।

১। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব, মোহতামিম ঘাট ঘর মাদ্রাসা, ফেনী।

২। মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব, নাজেমে ইসলাম, তালিয়াত মাদ্রাসা, ফেনী।

৩। মরহুম মাওলানা মুফতী নুরুল হক সাহেব, জি বি মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি জীবন ঃ

খতীবে আযম আলস্নামা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ব্যক্তি জীবনে ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক অনাড়ম্বর, চরিত্রবান, নিরহংকার, বন্ধু বৎসল অথিতি পরায়ন ও বিনয়ী। চারিত্রিক কোন ধরনের কলুষতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি জীবনে। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তিনি কারো

কাছ থেকে খিদমত নিতে অপছন্দ করতেন তবে অনেক মাওলানার খিদমত করে সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করতেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

অনেক রাজনীতিবিদের রাজনৈতিক জীবন আর ব্যাক্তি জীবনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ-ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন কিন্তু হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদের (রহঃ) রাজনৈতিক জীবন ব্যক্তি জীবনের মতই পূতঃ ও পবিত্র। সম্পদ ও প্রাচুর্যের লোভ মাওলানার জীবনে কোন অশুভ প্রভাব ফেলতে পারেনি। মৃত্যুর মুহূর্তে একটাকাও তাঁর Bonk Balana ছিলনা। উচ্চাভিলাষ বিবর্জিত এ মনীষী অর্থের পাহাড় গড়ার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করেনি কোনদিন।

পারিবারিক পরিসরে ঃ

সাংসারিক পরিসরে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল স্বামী ও স্নেহপরায়ন পিতা। পরিবারের সদস্যদের কার কি প্রয়োজন সে সব খুঁটি নাটি বিষয়েও তিনি তদারক করতেন নিয়মিত।

পুকুর পাড়ে ফলের গাছ লাগানো, ভিটার খেরা বেড়া, বাড়ীর পুকুরে মৎস্যচাষ কোন কিছু মাওলানার দৃষ্টি এড়াতোনা। এমনকি সিম গাছের গোড়ায়ও মাটি দিতেন নিজ হাতে। ভদ্রতা ও সৌজন্যতাবোধে এত প্রাবল্য ছিল তাঁর জীবন, যার জন্য তিনি কোন দিন সুপারিশের অথবা দাওয়াত দেয়ার জন্য আগত ব্যক্তিকে 'না' বলতে পারেননি।

মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও অভাববোধ যে একেবারে ছিলনা এমন নয়, কোন দিন অভারের কথা কাউকে বলেননি মুখ ফুটে যত বড় দুর্যোগের শিকার হননা কেন।

পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার শিক্ষা বিষয়ক পরিচালক থাকাকালীন সময়ে কোন ছাত্র যে কোন অভাব-অভিযোগ নিরসন ও সুপারিশের জন্য আসলে তিনি তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য লিখিত নিদের্শ দিতেন।

বৃদ্ধ শিশুঃ

অনেক সময় দেখা গেছে বাড়ীর আঙ্গিনায় ক্রীড়ারত ছোট বাচ্চাদের সাথে তিনিও যোগ দিয়েছেন। মাটির পেয়ালা তৈরী করে দিচ্ছেন। গাছের পাতা ছিড়ে তরিতরকারী রান্না

করায় ছোট শিশুদের সহায়তা করছেন। শিশুদের মাঝে নিজকে একাকার করতে পেরে তিনি প্রচুর অনন্দ পেতেন হয়তো।

আশ্চর্য গুণাবলী ঃ

মাওলানার মধ্যে ক্রোধ ছিল কিন্তু সংযত কারার মত আশ্চর্য গুণ ছিল তাঁর আয়ত্বে। হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা মাওলানার অভিধানে বিরল শব্দ। প্রতিভাধর ব্যক্তিকে তিনি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হতেন না কোন দিন।

এ কথা সত্য যে, যাঁরা ভাল বক্তা তাঁরা সাধারণত ভাল শ্রোতা হননা কিন্তু মাওলানা সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ঘরোয়া আলাপে, আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ খবর গ্রহণে, জনসভায়, ওয়াজমাহফিলে, সেমিনারে তিনি হৃদয় মন দিয়ে বক্তার বক্তব্য শুনতেন মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায়।

মুক্ত বিহঙ্গ ঃ

ডায়েরী লিখার অভ্যাস ছিলনা তাঁর। নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোর নিগড়ে নিজকে আবদ্ধ না রেখে মুক্ত বিহঙ্গের মতো তিনি বিচরণ করেছেন সারা জীবন। প্রাত্যহিক রূটিন মাফিক তিনি নিজকে পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের জোয়ারের মতো উত্তল ও সর্ব পল্লাবনী, আর ঘূর্ণিঝড়ের মতো উদ্দাম ও বাধা বন্ধনহীন। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অবিচল প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়ার চাইতে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি ছিলেন অধিক পক্ষপাতি।

কবিতা প্রীতি ঃ

আল্লামা ইকবালের কাব্যাবলী, মাওলানা রূমীর মসনবী ও হাফিজ সিরাজীর দিওয়ান তাঁর হৃদয় মনকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করেছিল। মাওলানার যে কোন বক্তৃতা ও ওয়াজ উপরোক্ত প্রতিভাধর কবিত্রয়ের কবিতার আবৃত্তি ব্যতিরেকে শেষ হতোনা। বাংলার আলেমদের মধ্যে তিনি ছিলেন ইকবাল কাব্যের স্বার্থক ব্যাখ্যাদাতা। পাকিস্তানের অধ্যাপক সলিম চিশতী যেমন ইকবাল কাব্যের মর্মার্থ, ইংগিত, উপমা স্বার্থক ভাবে বুঝেছেন তেমনি বাংলায় খতীবে আজমও হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন ইকবালিয়াতের ইংগিতময় নিগুঢ় তত্ব ও রহস্য।

আল্লামা ইকবালের ইসলামী বিপ্লবের চেতনাময় কবিতা যখন মাওলানার কণ্ঠে আবৃত্তি হতো বক্তৃতা ও ওয়াজে, পুরো মাহফিল পরিণত হতো এমন বিসুরিয়াসের আগ্নেয়গিরিতে। খতীবে আযমের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তি জীবন জাতীয় সম্পদ।

তথ্য সূত্র ঃ ১) খতিবে আজম, আ ফ ম খালেদ হোসেন,

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক দর্পনে খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ)

(এক) খতীবে আযমের এর রাজনৈতিক জীবন ঃ

খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ছিলেন একজন সংগ্রামী ও আপোষহীন রাজনীতিক। সাতকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সে সময়ে উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও করম চাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বাধীন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ করে আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখান

(দুই) জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দে যোগদান ঃ

১৯৪০ সালের দিকে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বাধীন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কর্মী ছিলেন তিনি। বলতে গেলে এ সংগঠনের মাধ্যমেই খতিবে আযমের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।

মাওলানা মাদানী স্বাধীন স্বাধীন ভারতে ইসলামের বাস্তবায়ন চেয়েছিলেন কিন্তু, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে খতীবে আযমের মত এতদঞ্চলের অনেক রাজনীতি সচেতন আলেম পরিবর্তিত পরিস্থিতে সংগঠন পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করেন। ১৯৪৮ সালের দিকে কোলকাতার ক্যানিং স্ট্রীটের মসজিদে তিনি মাওলানা আশরাদ আলী ধরমণ্ডলী সমভিব্যাহারে মাওলানা মাদানীর (রহঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী, সংগঠন ও কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) তাঁদের পরামর্শ দিলেন- "আমরা চেষ্টা করেছিলাম অখণ্ড ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কিন্তু পাকিস্তান যখন সৃষ্টি হয়ে গেল তখন পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাও। নয়তো আল্লাহর গজব নেমে আসবে।"

(তিন) জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামে যোগদান ঃ

১৯৪৯ সালে খতীবে আযম ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মাছিহাতা শিবিবর ময়দানে অনুষ্ঠিত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের ও (ওসমানী) সম্মেলনে তিনি পর্যবেক্ষণ হিসেবে যোগ দেন। শর্ষীনার পীর সাহেব হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন (রহঃ) এতে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৫২ সালে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামে যোগ দেন। ১৯৫২ সালের ১১, ১২, ১৩ই মার্চ কিশোরগঞ্জের হযরত নগরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের তিন দিন ব্যাপী সম্মেলনে তিনি কাউন্সিলার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জমিয়তে ওলামা স্বাধীন স্বত্তা নিয়ে অবির্ভূত হয়। হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহঃ) সভাপতি ও হযরত মাওলানা সৈয়দ মোসলেহুদ্দীন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

(চার) এম, পি, এ, নির্বাচিত ঃ

১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্টের মনোয়নে কক্সবাজার–মহেশখালী–কুতুবদিয়া নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটে পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

(পাঁচ) নেজামে ইসলামের প্রাদেশিক সেক্রেটারী নির্বাচিত ঃ

১৯৫৫ সালে নেজামে ইসলামের নতুন পূনাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয় ১১জয়নাগ রোড ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে। হযরত মাওলানা আতহার আলী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) যথাক্রমে পার্টির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

আলহ্লাহর এ জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে নেজামে ইসলাম পার্টির নিরলস প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে পাকিস্থানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (রহঃ) তাঁর দল "তাহারিকে ইস্তেকামে পাকিস্থান" নিয়ে নেজামে ইসলামে যোগ দেন।

লাহোর গমন ঃ

১৯৫৮ সালের ২৮, ২৯, ৩০শে এপ্রিল লাহোরে নেজামে ইসলাম পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন বসে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান থেকে ২৫জন ডেলিগেট অংশ নেন। হযরত

খতীবে আযম এ প্রতিনিধি দলের শীর্ষস্থানীয় সদস্য। লাহোরের গুলবর্গস্থ এডভোকেট নছীম আহসানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (রহঃ) নিখিল পাকি~স্থান নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন।

৩০শে এপ্রিল লাহোরের মুছী দরওয়াজায় পার্টির যে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব ছিলেন এ জনসভার অন্যতম বক্তা। জনসভায় উপস্থিত ৫০ হাজার শ্রোতাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করেছিলেন দু'জন বক্তার চমৎকারী বক্তৃতায়, একজন মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব অন্যজন অধ্যাপক সোলতানুল আলম সাবেক এম,পি।

(ছয়) আণ্ডার গ্রাউণ্ড রাজনীতি ঃ

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারী হলে হযরত খতীবে আযম আণ্ডার গ্রাউণ্ডে দলীয় কর্মীদের সংগঠিত করার প্রয়াস পান।

(সাত) নেজামে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নির্বাচিত ঃ

১৯৬২ সালে পাকিস্~স্থান সরকার সীমিত ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ দিলে ৮ই নভেম্বর ঢাকার কার্জন হলে পাকিস্~স্থান নেজামে ইসলাম পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এতে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (রহঃ) কেন্দ্রীয় সভাপতি, মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) সহ-সভাপতি ও শহীদ মৌলভী ফরিদ আহমদ (রহঃ) সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। অসুস্থতার কারণে হযরত মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ) প্রাদেশিক সভাপতির পদ হতে ই~স্তফা দিলে সৈয়দ মাওলানা মোসলেহুদ্দীন সাহেবকে অস্থায়ী সভাপতি করা হয়।

(আট) নেজামে ইসলামের প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচিত ঃ

১৯৬৫ সালে ঢাকায় জেলা বোর্ড হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) প্রাদেশিক সভাপতি ও জনাব মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

(নয়) নেজামে ইসলাম পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করণ ঃ

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক লাহোরে আহুত গোল টেবিল বৈঠকে নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (রহঃ) ও শহীদ মৌলভী ফরিদ

আহমদ (রহঃ) যোগ দেন। মতদ্বৈততার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান গোল টেবিল বৈঠক থেকে বেরিয়ে এলে ডান পন্থীরা সিদ্ধান্ত নিলেন এক পার্টি করবেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (রহঃ) শহীদ মৌলভী ফরিদ আহমদ (রহঃ) ও সৈয়দ মাওলানা মোসলেহুদ্দীন সাহেব দলীয় কাউন্সিলারদের মতামত ছাড়াই অন্যান্য আরো ক'টি গণতান্ত্রিক দল নিয়ে পি. ডি. পি. গঠন করেন এবং নেজামে ইসলামের বিলুপ্তির ঘোষণা দেন।

খতীবে আযম সহ নেজামে ইসলাম পার্টির অনেক নিবেদিত প্রাণ কর্মী এ বিলুপ্তিকে মেনে নিতে পারেননি। ১৯৬৯ সালের ১৯ ও ২০শে অক্টোবর ঢাকার জহুরা ম্যানশনের দু'তলায় অনুষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নেজামে ইসলাম পার্টিকে বিলুপ্ত করা যাবেনা এবং এখন থেকে এ সংগঠনের নাম হবে "জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি।"

হযরত মাওলানা সামসুল হক থানভী (রহঃ) ও খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) যথাক্রমে নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ সালে পি, ডি, পি গঠিত হওয়ার অব্যাবহিত পর মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) নেজামে ইসলামকে পূর্ণগঠিত করার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি এগিয়ে না এলে হয়তো নেজামে ইসলামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতো না।

১৯৫৬ সালে যুক্ত নির্বাচন বনাম পৃথক নির্বাচনের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) পৃথক নির্বাচনের পক্ষে জোরালো সংগ্রাম করেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (রহঃ) প্রধান মন্ত্রী থাকা কালীন সময়ে নির্বাচনের ব্যাপারটি শাসনতন্ত্রে অমীমাংসিত রেখে দেন।

(দশ) উচ্চতর বিশেষ কমিটি ঃ

১৯৬৯ সালের ২১ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলাম কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশনে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষা, ইসলামের হিফাজত, ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের মৌল কাঠামো রচনা এবং বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দল সমূহ নিয়ে জোট গঠন কল্পে একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ

কমিটি গঠন করা হয়। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ এ কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্য নির্বাচিত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন, মুফতী মুহিউদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ থানভী, মাওলানা মতিন খতিব এবং ইকবাল আহমদ এডভোকেট।

(এগার) নেজামের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী ও প্রাদেশিক সভাপতি ঃ

খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ছিলেন এ দেশের একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও প্রাদেশিক সভাপতির দায়িত্ব এক যোগে পালন করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

স্থানীয় রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি ঃ

উলেস্নখ করা যেতে পারে যে, খতীবে আযম নিজ ইউনিয়ন বরইতলীর মেম্বারও ছিলেন বেশ কিছু দিন। স্থানীয় রাজনীতি থেকে শুরম্ন করে জাতীয় রাজনীতির বিশাল অঙ্গন পর্যন্ত্ম মাওলানার ছিল দৃপ্ত পদচারণা। ১৯৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম ১৪ নির্বাচনী এলাকা (সাতকানিয়া-চকরিয়া) হতে পাকিস্ত্মান জাতীয় পরিষদের সদস্য পদের জন্য নেজামে ইসলাম পার্টি হতে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। ইসলাম পন্থীদের অনৈক্য ও অদুরদর্শীতার কারণে তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি।

(বার) আই, ডি, এল এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত ঃ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন সরকার ইসলামী রাজনীতির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করলে মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) ওয়াজ, তাফসীর মাহফিল ও সীরাতুন্নবী (সাঃ) সম্মেলনের মাধ্যমে দাওয়াতী তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে ইসলামী রাজনীতির উপর আরোপিত বিধি নিষেধ প্রত্যাহিত হলে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, পি, ডি, পি, খেলাফতে রব্বানী সহ ছোট বড় ৮টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠন করেন "ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ"। তিনি আই, ডি, এল এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করে বক্তৃতা দিয়ে তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী সময়ে আই, ডি, এল ভেঙ্গে গেলে ১৯৮১ সালে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টিকে পুনরম্নজ্জীবিত করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত্ম তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

খ. খতীবে আযমের রাজনৈতিক কর্ম ঃ

(এক) প্রাদেশিক সম্মেলনে খতীবে আযমের ভূমিকা ঃ

১৯৬৩ সালের ২৮ ও ১৯শে মার্চ চট্টগ্রামের জে, এম, সেন হলে নেজামে ইসলাম পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক ওলামা সম্মেলনে মরহুম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মোট তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত প্রাদেশিক ওলামা সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্থানের প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা হতে আগত প্রায় দু'হাজার প্রতিনিধি এবং নেজামে ইসলাম পার্টির প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্থান হতে নিখিল পাকিস্থান নেজামে ইসলাম পার্টির আহ্বায়ক ও সাবেক প্রধান মন্ত্রী জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, মাওলানা ইউসুফ মাদানী, মাওলানা হাকীম মাহমুদ আহমদ জাফর শিয়ালকোটি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য নেজামে ইসলাম নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রাদেশিক পার্টির অস্থায়ী সভাপতি জনাব মাওলানা সৈয়দ মুছলেউদ্দীন, জেনারেল সেক্রেটারী খতীবে আযম জনাব মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাওলানা আশরাফ আলী, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব ফরিদ আহমদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুয়ায়ী এ সন্মেলন লাল দীঘি ময়দানে অনুষ্ঠানের কথা ছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ আকস্মিক ভাবে সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে ১৪৪ ধারা জারী করায় এবং লাল দীঘি ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেয়ায় শেষ পর্যন্ত জে, এম, হল প্রাঙ্গণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাক জমিয়তুল মোদাররেসীনের সেক্রেটারী ও ফেনী আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক (রহঃ)।

মাওলানার ভাষণ ঃ

প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে আগত প্রায় দু'হাজার প্রতিনিধির এ অভূতপূর্ব সমাবেশে পূর্ব-পাক জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ এক মর্মস্পর্শী ভাষন প্রদান কালে বলেন যে, "পাকিস্থান আন্দোলনের সময় নেতৃবৃন্দ ইসলামেরই দোহাই দিয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ইসলামী হুকুমত আজ পর্যন্ত কায়েম করা হয় নাই। পাকিস্থান সংগ্রামে এমন এলাকার মুসলমানরাও অকাতরে নিজেদের জানমাল কোরবান করেছে, যার ভাল করেই জানত যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা পাকিস্থানের ভাগে পড়বে না। এই ধরনের লোকরাই বেশী দুঃখ-কষ্ট

সহ্য করেছে। কেন ? এই জন্য যে, এটা নিছক কোন ভৌগোলিক বা দেশি ভিত্তিক আন্দোলন ছিল না, বরং একটি ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন ছিল। আর ইসলাম ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে। মাওলানা ছাহেব ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থান সংগ্রামের এই বীর শহীদানের মূল উদ্দেশ্য ইসলামী হুকুমতের উপরই আমরা ঈমান রাখি এবং আমরা এই উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাব- এজন্য যদি আমাদিগকে শহীদ হতে হয়, তবুও আমরা ক্ষান্ত হব না।

বর্তমান শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা ইসলামী ও নয় সেকুলারও নয়। তিনি বলেন যে, প্রকৃত সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র খোদার। পাকিস্থান কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। পাকিস্থান জনসাধারণের ভোটের জোরেই অর্জিত হয়েছে, কোন নেতার পৈত্রিক উত্তরাধিকার হিসেবে নহে। পাকিস্থান খোদার দান-যা ইসলামের দোহাই দিয়ে অর্জন করা হয়েছে। কাজেই এখানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তিনি বলেন যে, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী প্রণীত শাসনতন্ত্রে দেশের নাম করা হয়েছিল 'ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্থান'। আজ না আছে ইসলাম না আছে জমহুরিয়াত বা গণতন্ত্র বরং নানারূপ ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ শুরু করে দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মুসলিম পারিবারিক আইনের উল্লেখ করে বলেন যে, কোরআন ও সুন্নাহ এবং এজমায়ে উম্মতের বিরোধী এই আইনটি জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। মাওলানা সাহেব অভিযোগ করেন যে, কোরআনে বিবাহের জন্য বয়সের কোন পাবন্দী না থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য আইনে মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ১৬ বৎসর করে দেয়া হয়েছে। তিনি আফসোস করে বলেন, ইসলামের নামে অর্জিত দেশ পাকিস্থান প্রচলিত আইনে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত ব্যাভিচারের জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই, অথচ শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধ বিবাহের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে। একদিকে দ্বিতীয় বিবাহের বিরোধিতা করা হয়, অন্যদিকে নারী-পুরুষের নৈতিকতা-বিরোধী অবৈধ মেলামেশার পথে কোন বাধা নেই।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সমালোচনা করে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের পূর্বে মৃত্যুনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন যে, চার সন্তানের জননী এক মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ করার পরবর্তীকালে একে একে তার চারিটি সন্তানই মৃত্যুর কবলে পতিত হলে কর্তৃপক্ষের কাছে এর কোন প্রতিকার আছে কি ?

জাতীয় পরিষদে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত মৌলিক অধিকার বিল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, "এর পশ্চাতেও যাবতীয় আমলাতান্ত্রিক বিধান বহাল রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দোশের ইসলামী নামকরণের বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, মুসলমানদের ঘরে শিশুর জন্ম হলেই তার ইসলামী নাম রাখা হয়। এর ফলেই ভবিষ্যতে তার প্রকৃত মুসলমানরূপে গড়ে উঠার সুযোগ থাকে।"

প্রস্তাব উত্থাপন ঃ

সম্মেলনে গৃহীত দশটি প্রস্থাববের মধ্যে খতীবে আযম ছিলেন একটি প্রস্থাবক এরং তিনটি প্রস্থাবের সমর্থক।

প্রস্তাবগুলো হচ্ছে ঃ

দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জমিয়তে উলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টির তৎপরতা জোরদার করণ, জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ সম্পার্কিত অধ্যাদেশের সংশোধনী প্রস্থারের নিন্দা জ্ঞাপন, তৎকালিন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে দু'টি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিল করণ, পাপাচার ও অশ্লিল কার্যকলাপ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বন্ধ করার জন্য পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের সদস্যদের প্রতি আহবান জ্ঞাপন। ১৯৫৬ সালে রচিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বর্তমান প্রচলিত আইন সমূহকে পাঁচ বছরের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ঢেলে সাজানোর আবেদন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে দুঃখজনক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সম পর্যায়ে আনয়নের জোর দাবী জ্ঞাপন, খ্রিষ্টান মিশনারীর তৎপরতা বন্দ করণের দাবী, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট হতে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্থ তাঁদের কাজের প্রারম্ভে বিষয়াদীর সঠিক হিসাব জাতীয় পরিষদে পেশ করার আবেদন এবং কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়সঙ্গত ও শান্থিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কাশ্মীরী জনগণের গণভোটের ব্যবস্থাকরণ।

গৃহীত প্রস্তাবাবলী ঃ

(এক) পূর্ব পাকিস্থানের ওলামা সম্মেলনের সূচিন্থিত অভিমত এই যে, পাকিস্থান অর্জনের মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নেজামে ইসলাম (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা) কায়েম করা। আর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের অপূর্ব ত্যাগ ও

সাধনার মাধ্যমে পাকিস্তান হাসেল করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পাকিস্তান লাভ করার পর উহার শাসকবর্গ কর্তৃক ইসলামী নেজাম কায়েম করার পরিবর্তে ধর্ম বিবর্জিত জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়ে আসতেছে এবং তজ্জন্য অনৈসলামিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে ক্রমশঃ অন্ধকারের ঘোর তমশার দিকে ঠেলে দিয়ে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর প্রতীক্ষার পর নিরূপায় হয়ে পুনরায় ওলামা সমাজ নেজামে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য পূর্ব পাসিস্তানে পূর্ব পাক জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টি যেভাবে অতীতে ও বর্তমানে কাজে করেছে ও করতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে কার্য্য পরিচালনার সংকল্প ঘোষণা করতেছে, ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানেও ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টি গঠন করা হউক। তৎপর ওলামায়ে কেরামদের নেতৃত্বে নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টি অনতিবিলম্বে গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক ঃ জনাব মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ছাহেব।
সমর্থক ঃ মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব।
মাওলানা সৈয়দ আমহদ ছাহেব।

(দুই) বন্যাদূর্গতদের পাশে খতীবে আযম ঃ

১৯৬৩ সালের ৬ ও ৭ই অক্টোবর এক প্রচণ্ড ঘূর্নিবার্তা ও পস্নাবনে ভোলা ও বরিশালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং বাত্যাহত জনসাধারণকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬ দিনের এক সফরে ভোলা ও বরিশাল রওনা হন।

১১ অক্টোবর দুপুরে তিনি বরিশাল পৌছেন। পর দিন তিনি বরিশাল মিউনিসিপাল এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ স্থানসমূহ, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং জনসাধারণের বসতি এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষয় ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং জনগণকে শান্ত্বনা প্রদান করেন।

বরিশালে জনসভায় ভাষণ ঃ

১২ই অক্টোবর বাদ মাগরিব বরিশাল শহরের জামে কসাই মজজিদে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দান কালে তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক ক্রমাগত ঝড়-তুফান, বন্যা প্লাবন ও অন্যান্য বিপদাপদ আমাদের ক্রমবর্ধমান অনৈসলামিক ও খোদাদ্রোহী কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ প্রতিফল এবং আমাদের প্রতি আলস্নাহ তা'লার হুঁশিয়ারী স্বরূপ। কাজেই আমরা যারারা বেয়া আছি সকলের অবশ্যই কর্তব্য হবে খাছ ভাবে তওবা করে দেশ ও সমাজের অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করে একমাত্র আলস্নাহ তায়ালার নির্দেশ মত জীবন যাপন করা। বরিশাল জেলা নেজামে ইসলাম পার্টির অর্গানাইজিং সভাপতি জনাব মাওলানা বশীরম্নলস্নাহ আতহারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-বন্যা ও পস্নাবনের কারণ বিশেস্নষণ করেন। তিনি ঝড়-বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি তাদের প্রতি ইসলামের মহান আদর্শ মোতাবেক সাধ্যানুযায়ী দুর্গত ও ক্ষতি গ্রস্থদের সর্বপ্রকার সাহয্যে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। বিপদ গ্রস্থ জনসাধারণকে আল্লাহর হুকুম মত উপদেশ দান করেন।

১২ই অক্টোবর বাদ এশা জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শর্ষিনার মেজো পীর জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ছিদ্দীক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বরিশাল শহর নেজামে ইসলাম পার্টির এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন- "এই সংকটময় মুহূর্তে ওলামায়ে কেরাম ও দেশের দ্বীনদার লোকদের বসিয়া থাকার সময় নেই অনৈসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও বাতিল আদর্শে অনুপ্রাণিত লোকদের হাতে দেশ পরিচালনার চাবিকাটি দিয়ে বসে থাকে এদেশে কখনো ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবেনা।"

ভোলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন ঃ

১৩ ই অক্টোবর তারিখে ভোলা তাশরীফ নেন। ১৪ই অক্টোবর সকাল ৮টায় থেকে সদর থানার কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম- বিশেষতঃ ধনিয়া ইউনিয়নের নাছির মাঝি গ্রাম এবং তথাকার আলিয়া মাদ্রাসাটি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। ১৪ই অক্টোবর সোমবার অপরাহ্নে চরখলিফা কাওমী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় কোরআন ও হাদীসের আলোকে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণকে সান্ত্বনা দান করেন ও ধৈর্য ধারণের আহবান জানিয়ে বলেন ঃ "ঝড় বন্যা, পস্নাবন ইত্যাদি মুছীবত গোনাহগারদের জন্য শাস্তি এবং নেককারদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। ধৈর্য ধারণ করলে ঈমানদারদের ঈমানের তরক্কী হবে এবং গোনাহগারদের গোনাহের মাগফিরাত হবে। সুতরাং মুছীবতগ্রস্থ অবস্থায়ও তাওবা-এস্তেগফার করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক গায়েবী রহমত ও সাহায্য দ্বারা আপনাদের দুঃখ মোচন কববেন। আপনাদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তাহা পূরণ করার ক্ষমতা কারও নেই। তবুও সরকারের সথাসাধ্য সাহায্য রিলিফ লয়ে অতিদ্রন্নত এগিয়ে আসা অপরিহার্য কর্তব্য। আমরা বেসরকারী ভাবে ইন-শআল্লাহ যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব। দেশের যারা ঝড়-পস্নাবনে ক্ষতিগ্রস্থ হন নাই, তাঁদেরও দুঃস্থ-গরীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাহায্য লয়ে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

১৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার অপরাহ্নে তোলা শহরস্থ খলিফাপট্টি জামে মসজিদে পার্টির সাবেক এম.পি-এ জনাব এডভোকেট শাহ মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন ঃ "মু'মিনদের উপর মুছীবত আসে ঈমান ও আমলের পরীক্ষার জন্য। ছবর করলে ঈমানদারের ঈমানের তরক্কী এবং গোনাহগারদের গোনাহ মাফ হয়। যার মুছীবত গ্রস্থ হয় নাই, এটা তাদের জন্যও পরীক্ষস্বরূপ-তারা বিপন্ন দুঃস্থদিগকে সাহায্য করে কি না

বাদ মাগরিব সভা পুনরারম্ভ হলে মাওলানা ছাহেব বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, "অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য আলেমগণকে বারবার ইসলামের নামে ধোকা দিয়েছে। অতএব ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের এসব রাজনৈতিক দলের তল্পীবাহক হয়ে থাকা আদৌ উচিত হবে না। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন কৃত কালামে পাকের ব্যাখ্যা অনুসারে পাকিস্থানে ইসলামী শাসনব্যাবস্থা কায়েম করতে চায়।"

মুসলিম পারিবারিক আইনের বিভিন্ন ধারার উলেস্নখ .করে তিনি বলেন ঃ "এই আইনটি সম্পূর্ণরূপে কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী এবং যেনা ও ব্যাভিচারের সহায়ক। প্রাইমারী, মাধ্যমিক, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রম্নটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ বর্তমান ত্রম্নটিপূর্ণ শিক্ষানীতির মাধ্যমেই এদেশ হতে ইসলামকে বিদায় দেওয়ার সুচিমিত্মত পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করা হচ্ছে "

বাদ মাগরিব বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঝড়-পস্নাবনে ক্ষতিগ্রসত্ম জনসাধারণকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। তিনি বলেন ঃ "মুছীবত দ্বারাই মানুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধিত হয়। দেশব্যাপী ব্যাপক দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার জন্য জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালাতে হবে। কারণ যারা দুর্নীতি করে বা এতে উৎসাহ দেয় এবং যারা এর প্রতিরোধের চেষ্টা না করে চুপ করিয়া বসে থাকে, তার সকলেই অপরাধী। আর আলস্নাহ তাআলা এসব অন্যায়ের জন্য কোন আযাব বা মুছীবত দিলে ইহা অবশ্যই ব্যাপক হবে।"

(তিন) পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্যদাবী আদায়ে খতীবে আযমের ভূমিকা ঃ

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও পূর্ণ-পাকিস্তানের প্রাদেশিক সভাপতি হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাসিস্তানের মধ্যে বিরাজিত বৈষম্য নিরসন ও পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী আদায়ে ব্যাপক রাজনৈতিক ভূমিকা রাখেন। বক্তৃতা, বিবৃতি, আলোচনা, পুস্তিকা প্রকাশ, দলীয় কার্যকরী কমিটি ও কাউন্সিল অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে তিনি বৈষম্যের স্বরূপ তুলে ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য হক আদায়ের জন্য জনমত সৃষ্টির প্রয়াস পান।

এমনি ভাবে ১৯৬৯ সালের ২৮শে অক্টোবর মাওলানা ছিদ্দীক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলামের প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশন ও কার্যকরী কমিটির বৈঠকে গৃহীত গুরম্নত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাব করাচীর দৈনিক জং এর সৌজন্যে নিচে বিবৃত করা গেল।

অর্থাৎ- জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলামের প্রাদেশিক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ এ উপলক্ষে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন এ পরিস্থিতিতে সামজতন্ত্রীদের কঠোরতার জবাব কঠোরতার সাথে দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা সমাজতন্ত্রীগণ যে চরম ও কঠোর তৎপরতা চালাচ্ছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে

নির্বাচন হতে না দেয়া। তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে, দেশের ৯৯ শতাংশ জনগোষ্ঠী ইসলামী জীবন বিধান বিশেষতঃ ইসলামী সামাজিক ইনসাফ ও গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির অনুসারী

উলেস্নখ্য যে এ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রাদেশিক সেক্রেটারী জনাব মাওলানা আশারাফ আলী, প্রাদেশিক সহ সভাপতি মাওলানা সাইয়্যেদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী (রহঃ), ঢাকা সিটি সভাপতি মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ (রহঃ), এডভোকেট মনজুরম্নল আহসান (রহঃ), জনাব মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ হারম্নন, মিঃ মোহাম্মদ হারম্নন ও খুলনার কে, এইচ, করিম।

প্রস্তাবাবলী ঃ

১। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হোক।

২। প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষো ১৯৫৬ সালে রচিত সংবিধান চালু করা হোক।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ফারাক্কা সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা হোক।

৪। শিক্ষানীতি ও শ্রমিক নীতি নূতন ভাবে ঢেলে সাজানো হোক।

৫। ইসলামী ছাত্র সংঘ নেতা শহীদ আবদুল মালেক হত্যার বিচার বিভাগীয় তদমত্ম করা হোক।

৬। অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হোক।

৭। নৌ বাহিনীর সদর দপতর পূর্ব-পাকিস্মানে স্থানামত্মরিত করা হোক।

৮। এক ইউনিট বহাল বা বাতিলের আইনানুগ সিদ্ধামত্ম নেয়ার ভার পশ্চিম পাকিস্মানের উপর ছেড়ে দেয়া হোক।

৯। জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দেয়া হোক।

১০। মদ্যপান, মহাজনী ব্যবস্থা ও পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হোক।

১১। পাকিস্তানে খ্রীষ্টানদের ফ্রি মিশন আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক।

১২। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হোক।

১৩। পূর্ব-পাকিস্তানের খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ নিয়ে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করার গণ দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হোক।

১৪। সরকারী দফতরে ঘুষের লেনদেন বন্ধ করা হোক।

১৫। পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে বিরাজমান অব্যবস্থা নিরসন করা হোক।

১৬। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য পর্যায়ক্রমে ১০ বছরের মধ্যে দূর করা হোক।

১৭। খাস ও অনাবাদী জমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বণ্টন করা হোক।

১৮। কমিশন ও নন কমিশন ব্যাংকে ভর্তির ব্যাপারে আলিম ও ফাজিল পাশ ছাত্রদের এস. এস. সি ও এইচ.এস. সির সমমান দেয়া হোক।

১৯। সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিষ্টদের থেকে অশ্লীল পুস্তক, ফিল্ম, লিটারেচর আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক।

২০। সাংবাদিকদের ন্যায্য দাবী পূরণ করা হোক।

২১। পূর্ব-পাকিস্তানের লবণ চাষীদের উপর ধার্যকৃত লবণ কর প্রত্যাহার করা হোক।

২২। কটন মিলসমূহ অস্বাভাবিক বন্ধের কারণ নিরূপন করে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হোক।

২৩। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের স্কেল ও মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২৪। মেহনতী জনতাকে বিনাসুদে কর্জ দেয়া হোক যাতে তারা নিজেদের পেশায় এ সব অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে।

২৫। বৃহত্তর শিল্প কারখানার অর্ধেকাংশ বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে শ্রমিকদের সাথে বণ্টন করার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

২৬। পারিবারিক আইন বাতিল ঘোষণা করা হোক।

২৭। পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা কবলিত এলাকা সমূহকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করা হোক এবং অবিলম্বে এতদঞ্চলে সাহায্য প্রেরণা করা হোক।

২৮। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং দু'প্রদেশের যোগাযোগ ও ডাক ব্যবস্থা ছাড়া সমস্ত অধিকার প্রদেশের উপর ছেড়ে দেয়া হোক।

২৯। মসজিদুল আকসায় ইহুদী কর্তৃক অগ্নিসংযোগের নিন্দে করে মসজিদুল আকসাকে উদ্ধার কল্পে জিহাদ করার জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহবান জানানো হয়।

৩০। আহমদাবাদ, গুজরাট এবং তথাকথিত ধর্মনিরেপেক্ষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের যে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে কঠোর ভাষায় তার নিন্দে করা হয়।

(চার) ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে বরণ ও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে খতীবে আযমের ভূমিকা ঃ

রাজনীতির ময়দানে হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) সব সময় উদারতা ও গণতান্ত্রিক সহমর্মিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ১জন ছাড়া তাঁর দলের সব সদস্য আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমনকি তাঁর নিকট নির্বাচনী এলাকা ১৪ (সাতকানিয়া-চকরিয়া) আসনে তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব আবু ছালেহ জয়লাভ করায় তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। শুধু তাই নয় পাকিস্থানের সামরিক জান্তা সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করলে তিনি তার বিরোধীতা করে প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। ক্ষমতার মদমত্তে বিভোর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মাওলানার এ যুক্তি মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে হয়তো পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষা পেতো এবং ব্যাপক গণহত্যা ও রক্তপান এড়ানো যেতো। রচিত হতো ভিন্নতর ইতিহাস।

(পাঁচ) জনগণের অধিকার প্রদানের ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি খতীবে আজমের অভিনন্দন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহবান ঃ

নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব এক বিবৃতিতে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, এই ইউনিট বিলুপ্তি, এক ব্যক্তি এক ভোট, আগামী ১লা জানুয়ারী হতে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দান এবং নির্বাচনের তারিখসহ জনগণের ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় মাননীয় প্রেসিডেন্টকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করতেছি। তবে শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে তাঁহার ঘোষণা খুব আশাব্যঞ্জক নহে। কারণ ৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে বাদ দিয়ে একটি নূতন সাসনতন্ত্র রচনার ঝুকি নেওয়া কতখানি বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ তাহা খুবই চিন্তনিয় বিষয়। যেখানে নয় বৎসরেও শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব হয় নেই, সেক্ষেত্রে মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনার কোন নিশ্চয়তা নেই।

আমাদের মতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের শর্তসাপেক্ষে ৫৬ সনের শাসনতন্ত্রকে পূনর্বহাল করাটাই অধিক নিরাপদ ও দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের সহায়ক হত।

(ছয়) বর্মী শরনার্থী সমস্যার সমাধানে খতীবে আযমের ভূমিকা ঃ

সমাজতান্ত্রিক বার্মা সরকারের নিপীড়নের কারণে হাজার হাজার বর্মী মুসলমান বাস্তু ভিটা ও সহায় সম্বল হারিয়ে ১৯৭৭ সালে নাফ নদী অতিক্রম করে টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলে এক আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(১) মানবিক এ সমস্যার প্রতি বিশ্বের ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশের জনগণ ও সরকার প্রদানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, সউদী আরবের বাদশাহ, জাতি সংঘের মহাসচিব এবং রাবেতা আল-আলম-আল-ইসলামী মহাসচিবের নিকট জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করে বর্মী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির আহবান জানান।

(২) ঢাকার বায়তুল মোকাররম চত্বরে এতদউপলক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় তিনি উদ্বাস্তু সমস্যাটি আন্তর্জাতিক ফোরামে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানান। তিনি বলেন 'বর্মী' মুসলমানদের বাঁচার জন্য, নাজাত দেয়ার জন্য 'জিহাদ' ফরজ হয়ে গেছে কারণ জিহাদের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে :

প্রথমতঃ মুসলমানদের উপর যদি কেউ মুসলমান হওয়ার কারণে হামলা চালায়।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম রাষ্ট্রের উপর যদি কোন কাফির কব্জা করার জন্য হামলা করে।

তৃতীয়তঃ ইসলামের আহকামের (বিধিনিষেধ) উপর যদি কেউ প্রকাশ্য হামলা করে। বার্মাতে কোরআন মজীদকে পায়ের নিচে দেয়া হচ্ছে। মা-বোনদের সাথে ব্যাভিচার করা হচ্ছে। মুসলমানদের মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে কম্যুনিষ্ট মগরা নিজেদের বসতি স্থাপন করছে। সুতরাং 'জিহাদ' ফরজ হওয়ার কারণের মধ্যে কিছু আর বাকী নেই।

(৩) ১৯৭৭ সালের ২৪শে মে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আয়োজিত অপর এক গণ জমায়েতে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) বার্মা সরকার ও চরমপন্থী জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা যে গৌতম বুদ্ধকে নবী মনে কর তিনি তো পরধর্মমত সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। "জীবহত্যা মহাপাপ", "জীবে দয়া" এসব তাঁর আদর্শ বাণী। এখন তোমরা নিরীহ মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মত্ত হয়েছো তাতে বুঝা যায় গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়ে তাঁকে অপমানিত করেছো। তিনি বার্মা সরকারকে সতর্ক

করে দিয়ে বলেন "আগামী ১ মাসের মধ্যে নির্যাতিত মুসলমানদের স্বদেশ ভূমিতে সসম্মানে পূণর্বাসিত করার ব্যবস্থা কর অন্যথায় আমি উদ্বাস্তদের সাথে নিয়ে লং মার্চ করে টেকনাফ নদী অতিক্রম করবো" ।

(৪) বাংলাদেশ সরকার বর্মী উস্তাদদের সাথে চরম দূর্ব্যবহার করছে এবং গুলি চালিয়ে হত্যা করছে এমন একটি গুজব আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। নেজাম নেতা মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ১৯৭৮ সালে হজ্ব পালনোপলক্ষে পবিত্র মক্কা নগরীতে গেলে সেখানকার প্রবাসী বর্মীদের ক্যাম্পে গিয়ে বাংলাদেশের সত্যিকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত করেন। এভাবে বিদেশে তিনি বাংলাদেশের ইমেজ বৃদ্ধি করেন।

তথ্য সূত্র ঃ ১) খতিবে আজম, আ ফ ম খালেদ হোসেন,
২) সাপ্তাহিক নেজামে ইসরাম সপ্তম বর্ষ ৫ ও ৬ এপ্রিল ১৯৬৩।
৩) দৈনিক ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৯৬৯।
৪) East Pakistian Assembly proceeding third sessinon, 24th to 27th September, 1956 vol. XV- No. 2, P- 236-237.

(সাত) সংসাদ হিসেবে খতীবে আযম ঃ

(ক) খতীবে আযমের সংসদ মনোয়নের ইতিকথা ঃ

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ একজন আকুতো ভয় আদর্শ রাজনীতিবিদ। ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনে তিনি ফ্রন্টের মনোনয়ন লাভ করেন এবং যথারীতি তাঁর নামে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্ধ করা হয়। কিন্তু আকস্মিক ভাবে ফ্রন্ট মাওলানার অজ্ঞাতসারে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করে দেন। এ দিকে কক্সবাজার মহেশ খালী কুতুবদিয়া নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনী প্রচারাভিযান তখন তুঙ্গে। খতীবে আযম তাৎক্ষণিক ভাবে ঢাকা পৌছে Setering Committee এর চেয়ারম্যান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করে মনোয়ন বাতিলে বৈধতা চালেঞ্জ করেন। সোহরাওয়ার্দীর সাথে মাওলানার এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। Setering Committee এর বৈঠকে মাওলানা তাঁর বক্তব্য পেশ করে বলেন Setering Committee স্বজন প্রীতি করে আমার মনোনয়ন বাতিল করেছে। বাদী অথবা বিবাদীর অনুপুস্থিতিতে বিচার বৈধ নয়। আমার প্রতিদন্ধী বন্ধু জালাল আহমদ যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, কক্সবাজার মহেশখালী আমার নির্বাচনী এলাকা নয়। উত্তরে আমি বলবো ব্যক্তিত্ব নিয়ে এলাকায় পরিধি বিস্তৃত।

উদাহরণ স্বরূপ চাখারের হক সাহেব যদি বলি ভুল হবে কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব গোটা বাংলাকে তাঁর এলাকা বানিয়েছে। অনুরূপ ভাবে মেদেনী পুরের সোহরাওয়ার্দী সাহেব যদি বলা হয় তাও হবে ভ্রান্তিপূর্ণ। ব্যক্তিত্ব অনুসারে বলতে হবে পাকিস্থানের সোহরাওয়ার্দী সাহেব। পরীক্ষা করে দেখুন এ ঠিকানায় চিঠি দিলেও যাবে। নিজের কথা নিজে বলা শোভা পায়না তবুও তর্কের খাতিরে বলতে হচ্ছে কক্সবাজার মহকুমাটি অন্তত ঃ আমার এলাকা; চট্টগ্রাম জেলা যদি নাও বলি।

এদিকে কৃষক শ্রমিক পার্টির মোহন মিঞা ও নান্না মিঞা বেশ হৈ চৈ শুরন্ন করে দেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন "এ লোকটি যদিও মাওলানার বেশে কিন্তু দারন্নন Genious" ইতিমধ্যে জনাব জালাল আহমদ চৌধুরী কক্সবাজার মহকুমার একটি ম্যাপ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সামনে বাড়িয়ে দেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন যে এ বিন্দুটি চকরিয়া, এ বিন্দু থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৪০ মাইল। খতিবে আযম আত্মপক্ষ সমর্থন করেন বলেন, "জালাল সাহেব ম্যাপ বুঝেননি। ভূগোল সম্পর্কে আপনার জ্ঞান সীমিত। বিন্দুর নাম চকরিয়া বা কক্সবাজার নয়। রেখা যতদূর প্রলম্বিত হয়েছে চকরিয়া বা কক্সবাজার সীমা ততটুকু বিস্তৃত। অর্থাৎ যেখানে চকরিয়ার সীমা শেষ সেখানে কক্সবাজারের সীমার প্রারম্ভ দূরন্নত্ব বলতে কিছু নেই।

সোহরাওয়ার্দী ঃ আপনার বক্তব্যের পক্ষে কোন সমর্থনকারী এ Setering Committee তে আছে কি ?

খতীবে আযম ঃ আছে। মৌলভী ফরিদ আহমদ ও অধ্যাপক সোলতানুল আলম।

মৌলভী ফরিদ আহমদ ঃ যুক্তফ্রন্টের Setering Committee কে তাবিজ বানিয়ে জালাল সাহেবের গলায় দিলে ও নির্বাচনে তার ভরাডুবি হবে। পক্ষান্তরে রামু-উখিয়া টেকনাফে আমার নির্বাচনী এলাকায় দাঁড়ালে ও মাওলানা সাহেব নির্বাচিত হবেন।

অধ্যাপক সোলতানুল আলম ঃ মাওলানা সাহেব যুক্ত ফ্রন্টের মনোনয়ন না পেলে আমি হাটহাজারী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিনা সন্দেহ আছে

সোহরাওয়ার্দী সাহেব রায় দিলেন যে, মনোনয়ন মাওলানা সাহেবকে ফেরৎ দিতে হবে, এই বলে Setering Committee এর সভা মুলতবী ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে বাকী মাত্র ১৫ দিন। কক্সবাজার থেকে কর্মীগণ অসংখ্য টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মাওলানাকে নির্বাচনী এলাকায় ফিরে আসার তাগিদ দিতে থাকেন। মাওলানা ফিরে এসে নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করেন। এ দিকে চক্রান্তের ফলে মনোনয়ন আর ফেরৎ দেয়া হয়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হযরত খতীবে আযম চার জন প্রতিদ্বন্দ্বিকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের সদস্য (M P A) নির্বাচিত হন।

মাওলানার প্রতি সোহরাওয়ার্দীর অভিনন্দন ঃ

ঢাকা বার লাইব্রেরীতে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক আয়োজিত নব নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিতে গেলে মঞ্চ থেকে নেমে এসে সোহরাওয়ার্দী সাহেব মাওলানাকে উলস্নসিত কণ্ঠে মোবারকবাদ জানান।

যে সব প্রার্থী যুক্তফ্রন্ট থেকে মনোনয়ন নিয়েছিলেন তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে ২০০ টাকা পার্টি তহবিলে চাঁদা দিয়ে ছিলেন। যেহেতু মনোনয়ন দানের ব্যাপারে মাওলানার বিষয়টি বিতর্কিত ছিল সেহেতু পূর্বাহ্নে তাঁকে চাঁদা দিতে হয়নি। নির্বাচিত হবার পর ফ্রন্টের কার্যালয়ে সংসদ সদস্যদের অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগের মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সেহারাওয়ার্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেবের চাঁদা বাকী রয়েছে"। তৎক্ষনাৎ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ক্রোধান্বিত কণ্ঠে জবাব দেন-"তোমাদের লজ্জা হয়না চাঁদা চাইতে। তাঁকে মনোনয়ন দিতে তোমরা দ্বিধা করেছিলে। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে চার জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে তিনি পার্লামেন্টে এসেছেন, কোন চাঁদা দিতে হবেনা।"

১৯৫৪ সালের "পূর্ব-পাকিস্স্থান পরিষদ" অত্যন্ত গুরম্নত্বপূর্ণ। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাভূত করে হক-ভাসানী-আতাহার আলী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের টিকেটে বাংলায় অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব পার্লামেন্টে আসেন। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদের আগমন ছিল নিতান্ত বিস্ময় কর।

পার্লামেন্টে ভাষণ ঃ

যুক্ত ফ্রন্টের শরীক দল হিসেবে নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে ৩৩ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। দলীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসাবে মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ) ও মৌলভী ফরিদ আহমদ (রহঃ) পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। খুব সম্ভবত ঃ সে কারণে মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব পার্লামেন্টে খুব বেশী বক্তৃতা করেননি বা বক্তৃতা করার প্রয়োজন পড়েনি।

পার্লামেন্টের কার্য বিবরণী থেকে ১৯৫৬ ও ৫৭ সালে প্রদত্ত অনেকগুলো সংস্কারমুখী বক্তব্য পেশ করেছে তন্মধ্যে মডেল হিসেবে একটি বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

"কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকার ভেড়ি বাধ নির্মানের আহবান"

Maulana SIDDIQUE AHMAD জনাব স্পীকার সাহেব, Irrigation এবং Embankment খাতে যে ৪,৫৯,৪৩,০০০ টাকা ধরা হয়েছে তার থেকে সরকার কর্তৃক মহেশখালী থানার ও কক্সবাজার থানার দখলীকৃত জমিদারীর সাবেক কাটিগোধা এবং কুতুবদিয়া থানার খাশমহল বাঁধ যথা সময়ে বন্ধন ও সংরক্ষণ ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপনের জন্য ১০০ টাকার এই ছাঁটাই প্রস্তাব করছি।

"জনাব স্পীকার স্যার, কক্সবাজার মহকুমা বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত বিধায় লোনা পানি থেকে এই সমস্ত এলাকাকে বাঁচানোর জন্য বিরাট Embankment দরকার। সমস্ত মহেশখালী থানা এবং কক্সবাজারের চকোরিয়া এবং কক্সবাজার প্রভৃতি থানার Embankment আবশ্যক। আমাদের এখানকার সমুদ্রের লোনা জলের বন্যার সঙ্গে উত্তর বঙ্গের বন্যার তুলনা করলে চলবে না। এখানে যদি বন্যা হয়, লোনা জল একবার ঢুকে যায়, সে জল সরে গেলেও সে বছর সেখানে আর কোন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না এবং কোন ফসল ফলেনা। এজন্য এখানে Embankment করার জন্য কুতুবদিয়া ও মহেশখালীর ঐ বাঁধগুলি মেরামত করতে হবে। গত বছর যে মেরামত করা হয়েছিল সেটা করা হয়েছিল জৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে। ঐ সময়ের আগে বান ডাকায় শস্যের বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। মহেশখালী থানার অনেক ক্ষতি হয়েছে। কক্সবাজার চকোরিয়ার বিপুল ক্ষতি হয়েছে। মহেশখালী ও চকোরিয়ার জমিদারী Acquire করার পর হতে গভর্নমেন্ট সেদিকে কোন লক্ষ্য করেন নাই।

জনাব স্পীকার এজন্যে আমি বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এদিকে যে পৌষ, মাঘ মাসে পর্যাপ্ত পরিমান টাকা দিয়ে যদিও সমস্ত এলাকায় বাঁধ মেরামত না করা হয় তা হলে বিপুল ক্ষতি হবে। মেরামতের পর গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে পুলিশ পাহারা দেয়া উচিৎ। কারণ জোয়ার ভাটার পর প্রত্যেক এলাকায় যেয়ে দেখতে হয় যদি কোথাও

Embankment ভেঙ্গে যায় তাহলে সব জায়গা ডুবে যায়, আর ওখানে শস্য হয়না। আমি নিবেদন করছি বর্তমান সরকারের কাছে যেন তারা এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করেন। তা না হলে এ সমস্ত এলাকার লোক হিজরত করতে বাধ্য হবে।

(আট) আবদুল মালেকের শাহাদাত মাওলানার বিবৃতি ঃ

হযরত আলস্নামা মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) ছিলেন দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। তিনি কোন দিন তাঁর দল নেজামে ইসলাম পার্টিকে ইসলামী আন্দোলনে "একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী দল" মনে করতেন না। যখনই ইসলামের উপর আঘাত এসেছে তখনই তিনি তাঁর মোকাবেলায় মাঠে নেমেছেন, সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদে। ভাতৃতীম কোন ইসলামী সংগঠনের কর্মীরা যখন তাগুতী শক্তির নখরে আবার পর্যুদস্ত, মাওলানা তখন গর্জে উঠেছেন সিংহের মতো।

১৯৬৯ সালের ১২ই আগষ্টের ঘটনা। ইসলাম বিরোধী কতিপয় যুবকের হাতে তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি জনাব আবদুল মালেকের শাহাদাত বরণে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) অন্যান্য আরো ২৭ জন ওলামায়ে কেরাম, সুধী ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ সহ সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য যে যুক্ত বিবৃতি দেন নিম্নে তা হুবহু উদ্ধৃত করা গেল। বিবৃতিতে স্বাক্ষর কারী ১৭ জনের মধ্যে অন্ততঃ ১২জন নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা ও দায়িত্বশীল কর্মী। স্মর্তব্য যে, শহীদ আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে শাহাদাত বরণ করেন।

ঢাকা ১৯শে আগষ্ট' ৬৯

"আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সহিত লক্ষ্য করতেছি যে, পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার বিরুদ্ধে মুসলমান নামধারী একদল উঠে পড়ে লেগেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অবস্থা হঠাৎ সৃষ্টি হয় নাই। ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামী আদর্শকে সযত্নে এড়িয়ে দেশে সকল প্রকার মতাদর্শকেই গড়ার সুযোগ দিয়ে আসছেন।

বিগত বাইশ বছরের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার ও ক্ষমতা হরণ করিয়া একদিকে যেমন অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জাতির উপর চাপানো হয়েছে তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জঘন্য বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ প্রত্যেক সরকারই মুসলমান জনগণকে ধোকা দেওয়ার জন্য ইসলামের দোহাই দিয়েছেন। এই অজুহাতে ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক বিজাতীয় ও ইসলাম বিরোধী মতবাদের ভিত্তিতে দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি শক্তি গড়ে তুলেছে।

আমাদের মতে পাকিস্তানে কথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থাই মুসলিম জাতীয়তাবোধ এবং ইসলামী তমুদ্দুন ও মুসলামনকে সর্বপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই ধরনের

শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই আজ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এমন সব লোক পয়দা হচ্ছে যারা মন,মগজ ও চারিত্রিক দিক দিয়ে মুসলমানিত্ব হতে বহু দূরে সরে পড়তেছে।

দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদেরকে সর্বদিক দিয়ে উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধানত শিক্ষাব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। একথা অনুধাবন করেই পাকিস্তানের ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামা সমাজের নেতৃত্বে দেশের ইসলামপ্রিয় জনতা ইসলামী শিক্ষার জন্যে আন্দোলন করেছেন। বিশেষ করিয়া মাদ্রাসার ছাত্রগণ এবং ইসলামপন্থী সাধারণ ছাত্রসমাজ ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমান সামরিক সরকারের আমলে নতুন শিক্ষানীতি চালু করার উদ্দেশ্যে যেসব প্রস্তাব জাতির সামনে পেশ করা হয়েছে তাতে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ স্বীকৃতি দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে উহাতে অতি নগণ্য পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করিয়া সম্পূর্ণরূপে পনর্গঠনের দরকার ছিলো, সেখানে মাত্র দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াতকে একটি বাধ্যতা মূলক বিষয় হিসেবে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

সরকারের পক্ষ হতে প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে সকল মহলকে মতামত ব্যক্ত করবার যে আহবান জানানো হয়েছে তার সুযোগ লয়ে কতিপয় অধ্যাপক, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ছাত্র যে জঘন্য ইসলাম দুশমনির পরিচয় দিয়াছেন তা ছেলে মেয়েদের জন্যে শুধু দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো সম্বন্ধে সামান্য একটু শিক্ষা গ্রহণ করবার যে সুপারিশ করা হয়েছে তারা এতটুকু পর্যন্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত নন। মুসলমান জনগণের জন্যে তাই এই পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক। মুসলিম নামধারী লোক ইসলাম বিরোধী হলে কতটা হীন হতে পারে ইহা তারই একটি লজ্জাস্কর নজীর।

তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার দাবীদার কতক অধ্যাপক, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ইসলামের যে বিরোধিতা করেছেন তারই চুড়ান্ত রূপ গত ১২ই আগষ্ট বিশ্ববিদ্যায় অঙ্গনে ছাত্র হিসেবে পরিচিত একদল পথভ্রষ্ট হিংস্র যুবক দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত সাধারণ ছাত্রদের সভায় বিরোধী ও ইসলামপন্থী সবরকম ছাত্রই উপস্থিত ছিলো। উক্ত সভায় সমাজতন্ত্রী জৈনক ছাত্র-বক্তা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করায় ইসলামী-পন্থী ছাত্রগণ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদের ফলে তাদের মধ্যে যদি কিছুটা হাতাহাতি বা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েই ক্ষান্ত হত তা হলে আমাদের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হত। কিন্তু ইসলাম পন্থী ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পৃথকভাবে একা পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার

বহুদূরে বেসকোর্সে ধাওয়া করিয়া দল বেঁধে যেরূপ অমানুষিক ভাবে মারা হয়েছে তাহা ছাত্র সমাজের জন্যে অত্যন্ত কলঙ্কজনক।

এই ধরনের বর্বরোচিত পাশবতার পরিণামেই ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি তরুণ ছাত্রনেতা তৃতীয় বর্ষ বাইওকেমিষ্টী বিভাগের কৃতিছাত্র আজীবন স্কলার জনাব আবদুল মালেককে শাহাদাত বরণ করতে হইল। আমরা এই হিংস্র হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করতেছি এবং এক সম্ভাবনাময় কৃতি তরুনের জীবনাবসানে আন্তরিক ও গভীর শোক প্রকাশ করতেছি। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত ব্যক্তিদেরকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের আবেদন জানাচ্ছি। আমরা কর্তৃপকক্ষের দৃষ্টি দৈনিক পত্রিকাসমূহের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি যার মধ্যে আহত আবদুল মালেককে শায়িত অবস্থায় এবং তার চারিপর্শ্বে আক্রমণকারী গুণ্ডাদের কয়েকজনের চেহারা অত্যন্ত স্পষ্ট চিনা যায়।

আমরা এদেশের তৌহিদী জনতার পক্ষ হতে ঘোষণা করতেছি যে, শহীদ আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতে শাহাদাত বরণ করেছেন। আমরা তাহা অর্জন করবার জন্যে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করলাম। আমরা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার দাবীদার অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্রদের সাবধান করে দিচ্ছি যে, ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের জনগণ তাদের এই ষড়যন্ত্র কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। যদি তারা ইসলামী শিক্ষা সহ্য করতে না চান তবে মুসলমানদের দ্বারা অর্জিত এই দেশে তারা অমুসলিম হিসেবে থাকতে পারেন। কিন্তু মুসলমানদের পরিচয়ে এইরূপ ইসলাম দুশমনী এদেশের জনগণ কিছুতেই সহ্য করবেনা।

পূর্ব-পাকিস্তানের সংবাদপত্র সমূহের কর্তৃপক্ষ ও কার্যরত সাংবাদিকগণের নিকটও এ প্রসঙ্গে আমরা কিছু বলতে চাই। গত কিছুদিন হতে কোন কোন পত্রিকায় ধর্ম-নিরেপক্ষ শিক্ষার দাবীদারদের খবর যেরূপ ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে এবং ইসলামী শিক্ষার যে ব্যাপক আন্দোলন চলতেছে তাহার সংবাদ গোপন করা হয়েছে-এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২জন এবং প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন অধ্যাপকের ইসলামী শিক্ষার দাবীতে প্রদত্ত বিবৃতিকে অনুলেল্লখযোগ্য স্থানে যেভাবে লুকাইবার চেষ্টা চলিয়াছে তা কি সাংবাদিক সততার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে নাই ? গত ১৫ই আগষ্ট প্রদেশের সর্বত্র এবং ঢাকা শহরের মসজিদে মসজিদে ইসলামী শিক্ষার দাবীতে যে প্রস্তাবাদি গ্রহণ করা হয়েছে, তাহা দুই-একটি পত্রিকার উলেল্লখ করা হয়েছে। তা ছাড়া বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে শিক্ষাবিদদের বক্তৃতায় প্রদত্ত মতামতের বিপরীত সংবাদও কোন কোন পরিত্রকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ১২ই আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষের ব্যাপারটিকে যেভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় বিকৃতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যেভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ বাদী ছাত্রদের বিবৃতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে, তা প্রকৃত ঘটনাকে গোপন করা এক সুপরিকল্পিত

ষড়যন্ত্র বলে আমরা মনে করি। আমরা সাংবাদিকতার সাথে জড়িত সকলের নিকট অনুরোধ করতেছি যে, তারা যেন সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে ইসলামের বিরন্নদ্ধে পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করেন।

প্রস্ত্মাবিত নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে আমাদের সূচিন্ত্মিত অভিমত এই যে, জাতীয় আদর্শের দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত্ম অপ্রতুল। আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষাসহ শিক্ষার সর্বস্ত্মরে ইসলামিয়াত অবশ্য বাধ্যতামূলক, বিষয় হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। তা না হলে উচ্চশিক্ষিত হয়েও মুসলমানগণ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাবে। এই কারণে সি, এস, এস সহ সমস্ত্ম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায়ও ইসলামিয়াতকে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় বলে গণ্য করতে হবে।

আমরা এটা লক্ষ্য করে অত্যন্ত্ম বেদনা অনুভব করতেছি যে, বর্তমান সরকার ইসলাম বিরোধী আলোচনা আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করলেও কিছু সংখ্যক লোক ধর্ম-নিরেপক্ষতার দোহাই দিয়া প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরোধীতা করতেছে। এতে সরকার ও জনগণের কর্তব্য যে জাতীয় আদর্শকে যেন কিছুতেই বিতর্কের বিষয়ে পরিণত করা না হয়।

সর্বশেষে দেশবাসীর নিকট আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, নিয়মতান্ত্রিক ও আইন-শৃংখলার সীমার মধ্যে থেকে শান্ত্মিপূর্ণ উপায়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে ব্যাপক আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ুন এবং ইসলামী শিক্ষা সংগ্রামী কমিটির পক্ষ হতে ঘোষিত 'শহীদ আবদুল মালেক সপ্তাহ' পালন করার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার দাবীতে জোরদার করন্নন। আপনারা বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করন্নন, যে কোন অবস্থায়ই ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাকিস্ত্মানের পাক জমিনে কায়েম হতে দেয়া হবে না।

আল্লাহপাক মুসলমানদের দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলনে মুজাহিদ হিসেবে কাজ করার তৌফক দিন! আমীন!

স্বাক্ষর ঃ

১। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ।
২। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মোস্ত্মফা আল-মাদানী।
৩। মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ।
৪। মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী।
৫। মাওলানা আবদুল রহীম।
৬। মাওলানা মুফতী মহীউদ্দিন (বড়কাটরা)
৭। মাওলানা আজিজুল হক (লালবাগ)
৮। মাওলানা আমিনুল ইসলাম।

৯। মাওলানা আজিজুর রহমান (শর্ষিনা)
১০। মাওলানা আবদুর রহমান।
১১। অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস।
১২। এডভোকেট মোঃ আতাউল হক।
১৩। এডভোকেট এ. কিউ. এম. শফিকুল ইসলাম।
১৪। এডভোকেট এ. টি. সাদী।
১৫। এডভোকেট মাওলানা আবুল লতিফ।
১৬। এডভোকেট মাওলানা আবদুল আলী।
১৭। এডভোকেট বজলুর রহমান (ফরিদাবাদ)
১৮। মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মাসুম।
১৯। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকিল।
২০। গোলাম মোস্তফা (সাধারণ সম্পাদক, হকার মার্কেট এ্যাসোসিয়েশন)।
২১। মাওলানা আশরাফ আলী খান।
২২। হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ উল্ল্যাহ হাফেজ্জী হুজুর (লালবাগ)।
২৩। মাওলানা মিয়া মফিজুল হক।
২৪। সাইয়্যেদ মোহাম্মদ ইব্রাহীম (জিন্নাহ হল)।
২৫। আলহাজ্ব আবদুল মাজেদ সরদার।
২৬। সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আরেফ (পাকিস্থান মুসলিম ছাত্রলীগ)।
২৭। মাওলানা আবদুর রহমান বেখুদ।

(ঙ) খতীবে আযমের রাজনৈতিক রচনা ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ইসলামী রাজনীতির উপর বিধি নিষেধ প্রত্যাহার ঘোষণা হলে খতীবে আযম ছোট বড় ৮টি রাজনৈতিক দল নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রাটিক লীগ গঠন করেন, এবং তিনিই ছিলেন এ পার্টির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান, এ সময় তিনি উক্ত পার্টির মুখ পত্র একটি মেনিফেস্টে রচনা করেন। তাহলো এই-

বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রাটিক লীগ মেনিফেস্টো ঃ

আমরা বিশ্বাস করি ঃ ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত আমাদের জাতীয় সত্তার লালন-পোষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চিততম গ্যারান্টি। শ্রেণী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, স্বকীয় জীবনাদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের ভাগ্য নির্মান, আত্মবিশ্বাসী মর্যাদাবান জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে ভূমিকা পালন-একটি স্বাধীন, সার্বভৌম জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত মৌল বিশ্বাসের আলোকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলে শোষণ ও জুলুমমুক্ত একটি সুস্থ প্রগতিশীল সমাজ গঠন এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অজেয় দূর্গ তৈরীর উদ্দেশ্যে এই পার্টির জন্ম।

যে ভৌগলিক চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ যার আলো, পানি ও ফলে ফসলে আমরা লালিত, বর্ধিত-যে দেশের কোমল, পেলব মৃত্তিকার নীচে আমাদের আপনজন ও সংগ্রামী জীবনের সঙ্গীরা চিরনিদ্রায় শায়িত-সেই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ভেতরের এবং বাইরের দুশমনদের হামলা থেকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষারই আপোষহীন চিরন্তন সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় জনগণের অংশ গ্রহণকে সুনিশ্চিত করে দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করার বলিষ্ঠ অংগীকার নিয়ে রাজনৈতিক অংগনে আবিভূত এই দল বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খাথার প্রতীক।

মূল লক্ষ্য ঃ

এই সংগঠনের মূল লক্ষও হবে বাংলাদেশকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অজেয় করে তোলা। জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যতিরেকে কোন দেশের আজাদী সুনিশ্চিত হতে পারে না, তাই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন হবে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনই হবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

কর্ম পদ্ধতি ঃ

এই সংগঠন সর্বক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণে বিশ্বাসী। যে কোন প্রকার হিংসা, নাশকতা, ষড়যন্ত্র বা দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ, গোপন সংস্থা, সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন বা নৈতিকতা বা চরিত্র ধ্বংসী তৎপরতা এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মৌলিক অধিকার ঃ

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার ও মৌলিক মানবিক চাহিদার নিশ্চিতকরন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিক মৌলিক মানবাধিকার ভোগের অধিকারী হবে। এবং এসব অধিকারের উপর কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। দেশের শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের জীবন জীবিকা, সম্পত্তি, ধর্মানুগত জীবন যাপন, ধর্মীয় প্রচার, মতামত প্রকাশ, সংগঠন, সমাবেশ, কৃষক ও শ্রমিকের দাবীদাওয়া আদায়ের অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হবে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি বিচার বিভাগের আওতাধীন থাকবে।

মৌলিক প্রয়োজন ও রাষ্ট্র ঃ

দেশের প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার নিশ্চয়তা এবং জীবনও ইজ্জতের নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের বৈধ জীবিকার সমস্ত দরজা খুলে দেবে, অবৈধ উপার্জনের দ্বার বন্ধ করে দেবে, বৈধ উপায়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উৎপাদন লাভ ও সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।

শাসতান্ত্রিক কার্যসূচী ঃ

আমরা বিশ্বাস করি সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। মানুষ দুনিয়ার বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করার অধিকারী। দেশের শাসনতন্ত্র যাতে আল কোরআন ও সুন্নাহর বিধৃত সমাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি শোষণ ও জুলুমমুক্ত ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে তদুদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংবর্ধন দলের অন্যতম লক্ষ্য হবে। পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থাই হবে উপরোক্ত আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম।

বিচার বিভাগ ঃ

দেশে আইনের শাসনকে নিরংকুশ করার উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। বিলম্বিত বিচার বিচারের অস্বীকৃতিরই নামান্তর, তাই বিচারকে সুলভ ও সহজ লভ্য করা হবে। আইনের শাসন চালু করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আদালত। আদালত সমূহের বিচারকগণের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিচারকে জনসাধারণের দ্বারে পৌছিয়ে দেবার জন্য নিম্ন আদালত সমূহের সংখ্যা, এখতিয়ার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। আইনশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়ও নৈতিকতা, সততা ও সচ্চরিত্রতার ভিত্তিতে বিচারকদের নিয়োগ করা হবে।

কারা সংস্কার ঃ

কারাগারের সমস্ত আমানবোচিত ও নৃশংস বিধিকে পরিবর্তিত করা হবে। একে দণ্ডালয় ও অপরাধের ট্রেনিং কেন্দ্রের পরিবর্তে কয়েদীদের নৈতিক ও মানসিক সংশোধনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হবে-যাতে কারাজীবনের বাইরে এসে তারা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজ জীবনে বসবাসের উপযোগী হতে পারে।

শিক্ষা ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন এবং জীবনের সকল সমস্যার মোকাবেলার জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টি। তাই জাতির সত্যিকার মুক্তি ও অগ্রগতির জন্য এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কাম্য যা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি করবে কর্তব্যবোধ,

আত্মবিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ, দেশপ্রেম, সততা, সত্য ও ন্যায় নিষ্ঠা, পরমত সহিষ্ণুতা, ধর্মপরায়নতা প্রভৃতি গুণাবলী। এই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে প্রতি বিভাগে ও স্তরে বাধ্যতামূলক করা হবে। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হবে এবং উপযুক্ত বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম রচিত হবে। উচ্চস্তরের ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনের জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। কাওমী মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে সরকার কর্তৃক যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিবেশকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য শিক্ষাঙ্গনের নৈতিকতা বিরোধী ও চরিত্র বিধ্বংশী কার্যকলাপ রোধের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কৃষি ঃ

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান, এর অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। সুতরাং সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এই কৃষি নির্ভর দেশের দারিদ্র পীড়িত মানুষের জীবনে প্রাচুর্য আনতে হলে জরুরী ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা , সার, উন্নতমানের বীজ, হালের গরু, ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কৃষকদের জন্যও কৃষি সমবায়গুলির সহজ শর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।

সর্বাধুনিক কৃষি ব্যবস্থার উপযোগী সকল প্রকার কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা জরুরী ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করতে হবে। এ ছাড়াও দেশের ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে বন্যা নিয়ন্ত্রনের সুষ্ঠু কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। বন্ধু রাষ্ট্র সমূহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম ও জাতিসংঘের সহায়তায় এবং জনতার ঐক্যের মাধ্যমে আমরা ফারাক্কা সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের পক্ষপাতী।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে সমবায় কৃষি প্রচলন এবং কৃষকরা যাতে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন তার জন্য প্রয়োজন বোধে সময় সময় মূল্য নির্ধারণ নীতি প্রবর্তন করা হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ও সামগ্রিক উন্নতি বিধানে কৃষিজীবিদের সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের দিকে উৎসাহিত করা হবে। সমবায় অন্তর্ভুক্ত চাষীদের জন্য তুলনামূলকভাবে

সহজ শর্তে ঋণ, কিস্তিমূলে মেশিনারী, স্বল্প মূল্যের সার ও পানি-সরবরাহের ব্যবস্থা করে সমবায়কে আকর্ষণীয় করা হবে।

শিল্প ঃ

শিল্প কারখানা বা বৃহৎ উৎপাদনী সংস্থা কয়েক প্রকার ঃ

(ক) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত।

(খ) রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সহমূলধনে পরিচালিত।

(গ) ব্যক্তি বা যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত।

প্রতিটি ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের সীমা, বিভাগ, উৎপাদনের চাহিদা ও সীমা, বেতন ও মুনাফার হার, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ও মান ইত্যাদি নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা অবশ্যই রাষ্ট্রের থাকবে। দেশের জনসাধারণের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রম শক্তির সদ্ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্প সম্প্রসারণ করাই হবে নতুন শিল্প স্থাপনের মূলনীতি। দেশের নিজস্ব সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে এবং জাতীয় সম্পদের সর্বোচ্চ উন্নয়ন করে বিদেশের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমানো হবে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা হবে। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় লক্ষ্য অনুসারে চূড়ান্ত আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প ঃ

গ্রামীণ সর্বসাধারণের আর্থিক উন্নয়নের জন্য এবং দেশের উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিদেশী মূলধন ঃ

বিদেশী মূলধন নিয়োগ কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় কতৃত্বাধীন পরিচালিত শিল্পের সহিত অংশীদারিত্বের শর্তে গ্রহণযোগ্য হবে। বিদেশী পুঁজি এককভাবে বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোন নাগরিকের সংগে যৌথভাবে বিনিয়োগ করা যাবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ

ব্যবসা-বাণিজ্যে সমস্ত বৈধ পন্থা খোলা রাখা হবে। তবে অন্যায় ও অবৈধ পথে সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণের যাবতীয় রাস্তা বন্ধ করা হবে। জুয়া, ফটকাবাজারী, চোরাচালানী, কালোবাজারী, এক চেটিয়া ব্যাবসা অবৈধ মজুতদারী এবং ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক হারাম ঘোষিত অর্থ উপার্জনের পন্থাগুলিকে আইনতঃ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে।

শ্রমিক ঃ কর্মচারীঃ

বর্তমান সময়ে দ্রব্যমূল্যের দৃষ্টিতে একটি পরিবারের মৌল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে পরিমাণ বেতন অপরিহার্য কোন নূন্যতম বেতন তার চাইতে কম হবে না। শ্রমিক ও কর্মচারীদের বাসস্থান, চিকিৎসা ও তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। কুটির শিল্প ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বেতন ছাড়াও বোনাসের ব্যবস্থা থকবে এবং সম্পদ উৎপাদনে তাদের শ্রম মেহনতের যে অংশ রয়েছে তার জন্য মুনাফাতে ও তারা অংশীদার হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্ন্তভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা বৃহৎ উৎপাদনী সংস্থায় শ্রমিকদের জন্য শেয়ার ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে। সুস্থ নীতিভিত্তিক শ্রম সংগঠনকে উৎসাহিত করা হবে। শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে ন্যায় সংগত দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য যৌথ দর কষাকষির অধিকার দেওয়া হবে। আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার সুপারিশ ও প্রণীত নীতির ভিত্তিতে এবং ন্যায় নীতির আলোকে শ্রম নীতি নির্ধারন করা হবে।

ব্যাংক ঃ ইনসিওরেন্স ঃ

ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স ঃ ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হবে। যেহেতু সুদ শোষণের সব চাইতে বড় হাতিয়ার এবং ইসলামী বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সেহেতু ক্রমান্বয়ে সুদী ব্যবস্থা নির্মূল করে ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্পে অংশীদারির ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। নাগরিকদের স্বল্পকালীন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমান ইনসিওরেন্স পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে সংস্কার করে সমস্ত নাগরিককেই সামাজিক ও জীবন জীবিকার নিরাপত্তাভোগের অধিকারী করা হবে।

গৃহ নির্মাণ ঃ

সরকারের আর্থিক সাধ্যানুযায়ী শহর ও গ্রামাঞ্চলে সরকারী খরচে জনসাধারণের বাসোপযোগী কিস্তিমূল্যে পরিশোধযোগ্য অথবা ভাড়ার প্রথায় গৃহ নির্মাণ করা হবে এবং স্বল্প মূল্যের গৃহ নির্মাণের জন্য বিনাসুদে নাগরিকগণকে ঋণ দেওয়া হবে।

জন স্বাস্থ্য ঃ

জনস্বাস্থ্যকে সর্বতোভাবে উন্নত করার জন্য সস্তা মূল্যে এবং গরীবদের জন্যে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার ব্যয় কমানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সরকারী ডাক্তারখানায় কর্মচারীরা যাতে রোগীদের যথার্থ বন্ধু ও সেবক পরিণত হন তার জন্য নৈতিক সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে

চিকিৎসার সুবিধাকে সার্বজনীন করার জন্য এলোপ্যাথিক ন্যায় সরকারীভাবে ইউনানী, আয়ুর্বেদী ও হোমিওপ্যাথী ডাক্তারখানা স্থাপিত হবে

কলেরা বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামন ব্যাধির প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা করা হবে।

খাদ্য ও ঔষধের ভেজালকে পূর্ণ কঠোরতার সাথে বন্ধ করা হবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা, নার্সিং, মহামারী প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য স্কুলের পাঠ্য তালিকায় এবং বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে শামিল করা এবং জনগণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা হবে।

সাধারণ অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ

সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে জাকাত, ওশর ও অন্যান্য দান সংগ্রহের ব্যবস্থা করে "সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ তহবিল" গঠন করা হবে। পংগু ও জখম, উপায়ক্ষমহীন বৃদ্ধ, এতিম, বিধবা, দুর্ঘনায় ক্ষতিগ্রস্থ নরনারী, প্রাকৃতিক দূর্যোগে কবলিত এলাকার অধিবাসী ও শরিয়ত বর্ণিত হকদারগণকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য ও ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হবে। সমাজ থেকে বেকারত্বের অভিশাপ দূর, ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ ও উদ্বাস্থদের পূণর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সরকারী তহবিলকে হারাম আমদানী থেকে মুক্ত করা হবে এবং হারাম কাজে তার ব্যয় ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সরকারী বেসরকারী প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপব্যয়ের বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনমত সৃষ্টি করা হবে। বিলাসিতামুক্ত সহজ সরল জীবন যাপন ব্যবস্থাকে একটি আন্দোলনের আকারে গ্রহণ করা হবে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ, দেশের দায়িত্বশীল বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ও আন্দোলন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর ট্যাক্সের চাপ কমানো হবে এবং বিলাস দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হবে।

সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার ঃ

আইন ও প্রশাসনের সমস্থ ব্যক্তি এবং সরকারের সকল উপায় উপকরণ প্রয়োগ করে সমাজকে সবরকম অশস্নীলতা ও নৈতিক দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত করা হবে। যে সব কারণে সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও নৈতিক দুষ্কৃতির বিস্থার ঘটে, সেগুলো বিলুপ্ত করা হবে।

জনচরিত্রের সংশোধন এবং জনগণের নৈতিক ট্রেনিং এর জন্য ব্যাপকতর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। লোকদের মধ্যে যাতে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়, দায়িত্ব ও

কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, আইনের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক স্বার্থের প্রতি দরদ সৃষ্টি হয় এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ ও সুকৃতির প্রতিষ্ঠা হয় তজ্জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের সহায়ক এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে বৈধ এই ধরনের খেলা ধুলা, আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দোৎসবকে উৎসাসিত করা হবে এবং এর বিপরীত সব কিছুকে নিষিদ্ধ করা হবে। বিবাহ শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে অযথা অপব্যয় ও খ্যাতি অর্জনের মনোবৃত্তি নিরুৎসাহিত করা হবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঃ

তাদের সমস্ত নাগরিক ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করা হবে। তাদের জান, মান, ইজ্জত ও নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সরকার পুরোপুরি দায়িত্ব -শীল হবে। তারা পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা ভোগের অধিকারী। তাদের ধর্ম-উপসনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াদিতে কোন অহেতুক হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না।

প্রতিরক্ষা ঃ

কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রই নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল রেখে বা প্রতিরক্ষার জন্য অন্য কোন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে না। তাই জাতীয় নিরাপত্তাবোধকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে একটি আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে। জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য দেশের প্রতিটি সক্ষম নাগরিককে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং দান করা হবে। সৈনিকদের এমনভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হবে যাতে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনাবোধ এবং জেহাদী প্রেরণা গড়ে ওঠে।

বৈদেশিক নীতি ঃ

আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হবে স্বাধীন, বাস্তবমুখী ও ন্যায়নীতির প্রতীক। প্রতিক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব ও ন্যায়নীতি হবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির অপরিহার্য্য ভিত্তি। দুনিয়ার সকল জাতির সাথে ন্যায়নীতি ও সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা করা হবে। বিশেষ ভাবে প্রতিবেশী দেশ সমূহের সংগে সার্বভৌম সমতা ও একের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ না করার নীতির সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা

হবে। মুসলিম জাহানের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক দৃঢ়তর করা হবে এবং পারস্পরিক লেন-দেন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হবে।

ছিদ্দিক আহমদ-
চেয়ারম্যান, প্রস্তুতি কমিটি,
ইসলামিক ডেমোক্রাটিক লীগ।

তথ্য সূত্র ঃ ১) খতিবে আজম আ ফ ম খালিদ হোসেন পৃষ্ঠা নং-
২) মেনিফেসটো. পৃষ্ঠা নং- ১-১০।

খতীবে আযমের কারা জীবন ঃ

(এক) খতীবে আযমের কারাবাসের ইতিকথা ঃ

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি পাকিস্থানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে দেশের পট পরিবর্তনের পর খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) তাঁর বরইতলীস্থ বাসভবন হতে মুক্তিবাহিনীর স্থানীয় কামাণ্ডার জনাব সালাহুদ্দীন মাহমুদ কর্তৃক গ্রেফতার হন। প্রথমে মহকুমা শহর কক্সবাজার এবং পরে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে তাঁকে ২২মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তাঁর বিরূদ্ধে অনীত অভিযোগ সমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় পরবর্তীতে নির্দোষ মুক্তি লাভ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁর ও তাঁর দলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি আই, ডি, এলের সাংবাদিক সম্মেলনে বিশদ বক্তব্য রেখেছেন।

১. সাবেক মুক্তি বাহিনীর স্থানীয় কমাণ্ডার এবং বর্তমান কক্সবাজার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য জনাব সালাহুদ্দীন মাহমুদ 'গ্রেফতার' শব্দটির সাথে বৈপরিত্য পোষণ করে বলেন তাঁর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষীয় হেফাজতে নেয়া হয়েছিল মাত্র। গত বছর খতীবে আযমের স্বরণে বরইতলী গ্রামে আয়োজিত আলোচনা সভায় জনাব সালাহুদ্দীন মাহমুদ এ ব্যাপারে যে বিশদ ব্যাখ্যা দেন নিচে তা উল্লেখ করা হল ঃ

"স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরে কতিপয় অশুভ শক্তি মাওলানাকে হত্যা করার পায়তারা করেছিল। এ তথ্য জানতে পেরে আমি আমার শ্রদ্ধাস্পদ মুরব্বী হযরত খতীবে আযমকে দেখার জন্য তাঁর বাসভবনে আসি এবং কদমবুচি করে তাঁর দোয়া নিই। বিস্থারিত আলোচনার পর আমি তাঁকে কক্সবাজার মহকুমা হাকিমের আদালতে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করাই এবং জামিন গ্রহণ করি। যেহেতু তখন দেশে আইন শৃঙ্খলা ছিলনা সেহেতু তাঁকে অরক্ষিত অবস্থায় তাঁর বাসভবনে রাখা আমি নিরাপদ মনে করিনি। কারাগারই ছিল তখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঙ্গন। আমৃত্যু মাওলানার সাথে আমার পিতৃসুলভ সম্পর্ক বজায় ছিল। চকরিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের নির্ধারিত ফরমে তিনি প্রস্থাবক হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর আমি প্রথম তাঁর বাসভবনে হাজির হয়ে দোয়া নিই ও পুষ্প মাল্য অর্পন করি- অতএব গ্রেফতার শব্দটি যথাযথ সত্য নয়।"

(দুই) কারা জীবনে খতীবে আযমের কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ

দীর্ঘ ২২মাস ব্যাপী মাওলানার কারাগার জীবন ছিল নানা শিক্ষনীয় ঘটনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আপন মহিমায় উজ্জল। বিরোধীতার অভিযোগে মাওলানার অনেক ছাত্র, শিষ্য ও সহকর্মী সে সময় তাঁর সাথে কারাগারে ছিলেন। তাদের কাছ থেকে অনেক তাৎপর্য পূর্ণ তথ্য পাওয়া

যায়। আগামী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য ইতিহাসের পাতায় তোলা দরকার। আজান দিয়ে কারারই ঐ লৌহ কপাটের অভ্যন্তরে জামাতে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করেন তিনি। প্রতিদিন নামাজ শেষে দরসে কোরআন ও দরসে হাদীসের আয়োজন হতো। আপন জনের বিচ্ছেদে ব্যথায় ক্রন্দনরত অনেক বন্দীকে তিনি সান্ত্বনা দিতেন। চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল মুনইম সাহেব একদা বাড়ীতে ফেলে আসা প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ অবুঝ শিশুর মতো কাঁদছিলেন। মরহুম খতীবে আযম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "অশ্রু ফেলে যদি কারাগারের ঐ বিশাল দেওয়াল পার হতে পারতাম তা হলে সবাই মিলে গণ কান্নার আয়োজন করতাম কিন্তু তা তো অসম্ভব। অতএব এ কান্না নিষ্ফল। ধৈর্য ও সবর করতে হবে। এতেই মুক্তি, এতেই শান্তি।"

অনেক সময় তিনি সমঝদারদের নিয়ে মাওলানা রুমী রচিত মসনভীর গোপন রহস্য কথা আলোচনা করতেন স্বার্থক ভাবে।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আলীয়া মাহমুদুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেবও একই অভিযোগে খতিবে আযমের সাথে একমাস কারাগারে ছিলেন এবং পরবর্তীতে নির্দোষ খালাস পান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাকে খতীবে আযম মরহুমের জেল জীবনের অনেক তথ্য দিয়েছেন। নিচে তা বিবৃত করা হলো।

কারাগারে তখণ প্রচণ্ড শীত পড়ছে। কর্তৃপক্ষ কয়েদীদের জন্য যে সব শীতের কাপড় সরবরাহ করেছেন, শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য তা মোটেই যথেষ্ট নয়। তিনি জেল তত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের তাঁর এক ব্যবসায়ী ভক্তের কাছে কয়েদীদের জন্য কিছু কম্বল সরবরাহের জন্য একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখেন। মাওলানার আবেদনে সাড়া দিয়ে ভক্ত প্রয়োজনীয় কম্বল সরবরাহ করেন এবং খতীবে আযম প্রবল শৈত্য প্রবাহে আড়ষ্ট বন্দীদের মাঝে এগুলো বিতরণ করেন।

বিশেষ পজিশন প্রত্যাখ্যানঃ

খ্যাতনামা রাজনীতিবীদ ও প্রথিত যশা আলেমেদ্বীন হিসেবে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাজবন্দীর মর্যাদায় বিশেষ পজিশন দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন এমন কি কারাগারের অভ্যন্তরে রাজবন্দীর বিশেষ মর্যাদায় অবস্থানকারী মালেক মন্ত্রী সভার সদস্য মিঃ অং শুয়ে প্রু একদা মাওলানার প্রকোষ্ঠে এসে তাঁকে রাজবন্দীদের জন্য রক্ষিত প্রকোষ্ঠে যাবার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সুন্নতে ইউসুফের প্রতীক হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঐ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বললেন-"আমার অসংখ্যা কর্মী, সহযোগী ও ভক্তদের সাধারণ কয়েদীদের শেলে রেখে আমি অপেক্ষাকৃত কোন উন্নতর ব্যবস্থাপনায় যেতে পারিনা। এটা আমার রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দীক্ষার বিপরীত।" এর জবাবে মিঃ অং শুয়ে প্রু শ্রদ্ধায় অভিভূত

হয়ে পড়েন। মুক্তির পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি সাধারণ কয়েদীদের সাথে আহার করেছেন এবং রাত্রি যাপন করেছেন।

তখন চট্টগ্রাম কারাগারে একপ্রকার উকুনের (ঘইরগা) প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। জামা, কাপড়, বালিশ, লুঙ্গী, চাদর প্রভৃতি কাপড়ের আঁশে ও ফাকে লুকিয়ে থেকে এ সব উকুন কামড় দিত। একমাত্র গরম পানির দ্বারা এগুলো ধ্বংস করা যেতো। কিন্তু কারাগারে সবসময় গরম পানি পাওয়া দুষ্কর ছিল। অবসর সময় তিনি নিজ হাতে জামা কাপড় হতে উকুন পরিষ্কার করতেন। মুক্তির পর দেখা গেছে তাঁর সারা শরীর উকুনের কামড়ে দাগড়া দাগড়া হয়ে গেছে।

গ্রন্থ রচনা ঃ

জেলের অভ্যন্তরে বসে কোন Reperence book ছাড়াই "শানে নবুয়ত" নামে ৮ খণ্ডে সমাপ্ত একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য, নবী জীবনের বিভিন্ন দিক, নবুয়তের সার্বজনীন আবেদন, রিসালাতের দায়িত্ব ও তার ক্রম বিকাশ প্রভৃতি ব্যাপক ভাবে আলোচিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থে।

(তিন) ইসলাম পন্থীদের ঐক্যে খতীবে আযমের ভূমিকা ঃ

প্রাদেশিক ইসলামী সম্মেলন ঃ

আগেই উলেস্নখ করা হয়েছে খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সবসময় ইসলাম পন্থীদের ঐক্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জমিয়তে আহলে হাদীস, জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পি,ডি, পি, পাকিস্তান দরদী সংঘ, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং হাটহাজারী, লালবাগ, বগুড়া আলীয়া ও ফরিদাবাদ মাদ্রাসার প্রিন্সিপালদের নিয়ে ১৯৭০ সালের ৮ই ফেব্রম্নয়ারী ঢাকায় রমনা ময়দানে বিশাল এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। মরহুম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে ইসলামী দল সমূহের ঐক্যের ক্ষেত্রে উলেস্নখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নিচে অভ্যর্থনা কমিটির পৃষ্ঠপোষক ও কর্মকর্তাগণের তালিকা দেয়া গেল সম্মেলনের গুরম্নত্ব অনুধাবনের উদ্দেশ্যে।

অভ্যর্থনা কমিটির পৃষ্ঠপোষক ও কর্ম-কর্তাগণ ঃ

পৃষ্ঠপোষক

মাওঃ আবদুল ওয়াহাব (হাটহাজারী)

মাওঃ আতহার আলী (প্রাক্তণ সভাপতি, নেজামে ইসলাম পার্টি)।

মাওঃ হাফিজ মোহাম্মদ উলস্নাহ (হাফিজ্জী হুজুর)।

মাওঃ আরদুল ওয়াহাব (পীরজী হুজুর)।

মাওঃ ছৈয়দ মোহাম্মদ মোস্তফা আলমাদানী।

মাওঃ মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান।

মাওঃ ছৈয়দ মোহাম্মদ ইছহাক (পীরসাহেব চরমোনাই)।

মাওঃ আবু জাফর মোঃ ছালেহ (পীরসাহেব শর্ষিনা)।

মাওঃ জাষ্টিস এ, কে, এম, বাকের (অবসরপ্রাপ্ত)।

মাওঃ নুরমোহাম্মদ আজমী।

মাওঃ ছৈয়দ মোহাম্মদ মাছুম (সভাপতি, পূর্বপাক ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ)।

সভাপতি

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ, সেক্রেটারী, পকিস্থান জমঈয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি।

সহ-সভাপতি

জনাব সৈয়দ খাওয়াজা খায়রুদ্দিন (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্থান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)।

মাওঃ আবদুর রহিম (নায়েবে আমীর পাকিস্থান জামাতে ইসলামী)।

জনাব এ, এস, এম, মোফাখখার এডভোকেট (সভাপতি, খেলাফত রব্বানী পার্টি)।

মাওঃ ছৈয়দ মোঃ মতিন হাশমী (আঞ্জুমানে মুহাজেরীন)।

মাওঃ আবদুল আলী (সভাপতি, পূর্বপাক ইত্তেহাদুল ওলামা)।

সহ-সভাপতি

মৌলবী আবদুর রহমান (জেনারেল সেক্রেটারী, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস)।

মাওঃ বজলুর রহমান (ফরিদাবাদ মাদ্রাসা)।

মাওঃ নজীবুল্লাহ (প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া)।

মাওঃ আজিজুল হক (লালবাগ মাদ্রাসা)।

সৈয়দ আজিজুল হক, এডভোকেট (পি, ডি, পি)।

জনাব এ, আর, ভূইয়া।

মাওঃ আবদুল লতিফ (ফুলতলী, সিলেট)।

মাওঃ লুৎফর রহমান (বরুনী, সিলেট)।

মওলভী ফরিদ আহমদ, এডভোকেট (সহসভাপতি, পকিস্থান ডেমোক্রোটিক পার্টি)।

জনাব এ, টি, সাদী এডভোকেট (আহবায়ক, পাকিস্থান দরদী সংঘ)।

সম্পাদক

এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম এডভোকেট (জেনারেল সেক্রেটারী, পূর্বপাক মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)।

যুগ্ম সম্পাদক

প্রফেসর গোলাম সরওয়ার।

জনাব তোয়াহা বিন হাবিব।

মাওঃ মিঞা মফিজুল হক।

জনাব হাকিম হাফিজ আজিজুল ইসলাম।
মাওঃ আবদুল মতিন।
জনাব এ, কে, এম, মুজিবুল।
প্রিন্সিপাল রূহুল কদ্দুস।
মাওঃ আমিনুল ইসলাম।
জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর।

অফিস সম্পাদক

জনাব নূরুল হক মজুমদার, এডভোকেট-

সম্মেলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে মরহুম খতীবে আযম চার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রচার পুস্তিকায় জাতির উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রাখেন হুবহু নিচে তা প্রকাশ করা হলো। পাঠক এতে করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য মাওলনার দরদী মনের পরিচয় পাবেন।

মুসলমান ভাইসব,

পাক-ভারত উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানের বিরাট কোরবানীর ফলে পাকিস্তান হাসিল হয়েছিল। ইসলামের নামে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের দোহাই দিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এই মুসলিম রাষ্ট্রটি কায়েম করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান এলাকার মুসলমানরাই পাকিস্তানের পক্ষে সবচেয়ে বেশী ভোট দিয়ে ইসলামের জন্য তাদের দরদের পরিচয় দিয়েছিল।

কিন্তু গত ২২ বছর ইসলাম ও গণতন্ত্রের দুশমনদের চক্রান্তের ফলে পাকিস্তানকে আজও একটি গণতান্ত্রিক ও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নাই। এর ফলে জনগণের দুর্দশা বাড়েই চলেছে। এর মূল কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। পাকিস্তান কোন আদর্শ মোতাবেক চলবে আজও তার মীমাংসা করা হয় নাই। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টাকে যার বানচাল করতে চেষ্টা করেছিল। তারাই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে খতম করে ১৯৫৮ সালে জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করবার এক জঘন্য ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে দেশে আজ জঘন্য পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা ও গ্রহিত সমাজ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

দেশ আজ কোন্ পথে ?

১। পাকিস্তান মুসলমানরাই কায়েম করেছিল। তাই এ দেশকে রক্ষার দায়িত্বও তাদেরই। আজ বেদনার সহিত আমরা দেখতেছি যে, আল্লাহ ও রসূলের দেওয়া আইন মোতাবেকই দেশ চলুক। মুসলমানদের এই দাবী কতক রাজনৈতিক ও নেতা এখনও স্বীকার করতেছে না।

২। জনগণের ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধান করবার জন্য **ইসলামী** অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজ-বিধান বাদ দিয়ে ইংগ-মার্কিন ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ ও চীন রাশিয়ার **সমাজতন্ত্রবাদ** কায়েম করবার জন্য হৈ চৈ শুরু হয়েছে।

৩। মুসলমানী চালচলন খতম করে হিন্দুয়ানী, খৃষ্টানী ও বিদেশী রাজনীতি দেশে চালু করে আমাদের অল্প বয়স্ক শিক্ষান্বেষী ভাই বোনদেরকে উচ্ছৃঙ্খল ও টেডী বানান হচ্ছে।

মুক্তির পথ কি ?

এই অবস্থা হতে দেশকে রক্ষা করতে হলে **এবং** আমাদের যাবতীয় সমস্যাকে আল্লাহ ও রসূলের নির্ভূল আইনের মারফতে সমাধান করতে হলে সব মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুনরায় পাকিস্তান আন্দোলনের মতো বলিষ্ঠ সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

আগামী অক্টোবর মাসে গোটা পাকিস্থানে পয়লা সাধারণ নির্বাচন হবে। **মুসলমানদের** সবকিছু এ নির্বাচনের **উপরই** নির্ভর করে। হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিমদের ভোট কারা পাবে তা মুসলমানরা ভাল করেই জানে। তাই আগামী নির্বাচনে যাতে ঈমানদার, যোগ্য, চরিত্রবান **এবং** পাকিস্থানের **আদর্শ** ও **অখণ্ডতায়** বিশ্বাসী লোকেরাই মুসলমানদের সব ভোট পায় সেদিকে প্রত্যেক মুসলমানেরই বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্থ বড় বড় আলেম, পীর ও ইমাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা **একটি প্রাদেশিক** সম্মেলনের মারফতে মুসলমানদের মধ্যে **এই বিষয়ে** একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চান। এ মহা সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির পৃষ্ঠপোষক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তালিকা **হতেই এই** কথা **প্রমাণিত** হবে যে, **এই** সম্মেলন পূর্ব পাকিস্থানের সকল **ইসলামী** দল ও নেতার উদ্দোগেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে ।

আবেদনঃ

এই সম্মেলন কোন দল বিশেষের নয়। দলীয় ও নির্দলীয় সকল মুসলমানদেরই **এই** সম্মেলন। অভ্যর্থনা কমিটি তাই সকল মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক, কৃষক ও শ্রমিক, আলেম ও পীর, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী সকল মহলকেই **এই** মহাসম্মেলনে যোগদান করবার জন্য সাদর আহবান জানাচ্ছে ।

অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষেঃ
(মাওলানা) ছিদ্দীক আহমদ
প্রেসিডেন্ট

উলামাদের এক পস্নাট ফরমে জমায়েত করার প্রচেষ্টা ঃ

স্বাধীনতা উত্তর কালে বিভিন্নভাবে বিভক্ত আলেম সমাজদের একটি কমন প্লাট ফরমে সমবেত করার জন্য মরহুম খতীবে আযম যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান তা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এতদঞ্চলের আলেম সমাজের কোন্দল ও শতধা বিভক্তি তাঁকে রীতিমত ব্যথিত করে তুলে। ঐক্যের মহান প্রয়াসে দেশের বিভিন্ন স্থানে শীর্ষস্থানীয় উলামাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং উন্মাদের মতো বাধ্যক্য বয়সে টেকনাফ থেকে হিলির প্রত্যন্ত প্রান্তরে অসংখ্য সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে আলেম সমাজকে একটি কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান। এটা অনস্বীকার্য যে তাঁর এ আন্দোলন দেশের ইসলামী রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যদিও আলেম সমাজের এ ঐক্য কোন সাংগঠনিক রূপ লাভ করেনি।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে শাহ ওয়ালীউলস্নাহর (রহঃ) বিপস্নবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ এবং শেখুল হিন্দ মাদানী ও উসমানীর জিহাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত এ মনীষী ১৯৭৭ সালের মে মাসে চট্টগ্রামের হাইলধর মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী একমহা উলামা সম্মেলনে যে জ্ঞান গর্ভ ও দর্শন ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহায়ক হিসেবে লিখিত আকারে তাঁর এ কর্মসূচী এ গ্রন্থের লেখক কর্তৃক ১৯৭৮ সালে "আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য" নাম দিয়ে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়ে ছিল।

হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) বাংলাদেশের আলেম সমাজকে তিন ভাবে বিন্যস্ত করেন।

প্রথম ঃ আলেমদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ইসলাম বিরোধী চক্রান্তকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে হক্কানী আলেমদের "কাফির" ফতওয়া জারী করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও বহুধা বিভক্ত করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত। স্মর্তব্য যে, যুগে যুগে যখনই সংগ্রামী আলেম সমাজ ওয়াসাতের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ইসলামী ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন তখনই এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া 'মওলভী' এর বিরম্নদ্ধে ফতওয়া জারী করে জিহাদের গতিধারায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। ইতিহাস তার নির্মম সাক্ষী।

দ্বিতীয় ঃ ওলামাদের আরেকটি দল যারা রাজনীতি বিমুখ ও ধর্ম থেকে রাজনীতি পৃথকভাবে দেখেন এবং বাতিলের মোকাবেলায় জীবনের ঝুঁকি নিতে নারাজ। ভীতি তাঁদের অন্তকরণে জমাট বেধে আছে।

তৃতীয় ঃ আলেম সমাজের আরেকটি অংশ সত্যের পথে নিবেদিত এবং মানুষের গড়া আইন মুছে আলস্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পুরোভাগে দণ্ডায়মান"।

মাওলানা বলেন – "আলস্নাহর নৈকট্য লাভের বাসনা নিয়ে এদেশে একটি খোদায়ী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য ত্রিধা বিভক্ত আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দূর্ভেদ্য প্রাচীর। এ মুহূর্তে এটাই আমাদের সর্বপ্রথম করণীয়। মনে রাখতে হবে এ ভেদাভেদের ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রম্নরা সব মঞ্চ দখল করে কাস্মে হাতুড়ি মার্কা পতাকা তুলবে। এ বিভক্তি আত্মঘাতীর শামিল ও আত্মহননের নামান্তর।

হযরত খতীবে আযম (রহঃ) দুঃখ করে বলেন-"বাংলাদেশের আলেম সমাজ আজ তাঁদের জিহাদী চেতনা হারিয়ে হীনমন্যতার শিকার হয়েছেন অথচ যুগে যুগে ওলামারাই সংগ্রামী কাফেলার নেতৃত্ব দিয়ে আসসেন।

ইতিহাসের পতাকা তারাই সংযোজন করেছেন স্বর্ণালী অধ্যায়ের। শিরক বিদআত সহ যাবতীয় ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরম্নদ্ধে বাক ও কলম যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানদের ধ্বংসের হাত থেকে রড়্গা করেন এবং ইসলামী শিড়্গার প্রসার ও সুন্নতে রাসূলের (সাঃ) পুনরম্নজ্জীবনের জন্য তাদের জীবনকে ওয়াকফ করে দেন। এ মনীষীদের আত্মত্যাগ পরবর্তী সময়ের আলেমদের জন্য পথের দিশারী হলেও তাঁরা সে পথ হারিয়ে নির্জীব নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এ নিরবতা দীর্ঘদিন বিরাজ করার ফলে ওলামাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নৈরাশ্যের, ভীতি ও হীনমন্যতার বিভীষিকা। বিশ্ব কবি আল্লামা ইকবাল কত সুন্দর অথচ চমৎকার উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে এ চৈতন্যহীনতাকে বিবৃত করেছেন। ঃ

কাননের পুস্প পরিচ্ছেদে
শিশিরের সিক্ততা আছে,
চামেলী আছে, শ্যামলিমা আছে
রাত্রি শেষের হাওয়াও আছে
তবুও উত্তপ্ত হচ্ছেনা কোলাহল
এ পুষ্পিত ভূমির লালাহ
হৃদয়োত্তাপ হীন তাই।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ ও খতিবে আযম ঃ

বাংলাদেশের মুসলমানগণ এক আলস্নাহ্, এক কোরআন ও এক রাসূলে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও শতাব্দী কাল ধরে তাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ ও অনৈক্য ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এ বিভেদ অনেকটা ধর্মীয় নেতা ও দ্বীনের খাদেমগণ কর্তৃক সৃষ্ট। মুসলমানদের মধ্যে এ বিভক্তির ফলে সম্প্রীতির স্থলে হানাহানি, শ্রদ্ধার স্থলে ঈর্ষা, সহনশীলতার স্থলে উচ্ছৃঙ্খলতা এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যদ্দরুন আল কোরআনের ভাষায় 'সীসা' ঢালা প্রাচীর নির্মীত হতে পারেনি।

ফলে সঙ্গত কারণে এ দেশে দ্বীন বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর চত্বরে ফিরআউনী পৈশাচিকতার পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে। দিগন্তের কোণে এ অশনী সংকেত খাদেমে দ্বীনদের সংকীর্ণতা ও অনৈক্যের ফল।

১৯৫০ সালে ইসলামী শাসন তন্ত্রের মূলনীতি রচনার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পাকিস্থানের সব মতাবলম্বী সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে নেতৃস্থানীয় ৩১জন ওলামা ঐক্যবদ্ধ হন। ঐতিহাসিক ২২দফা মূলনীতি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় এ সম্মেলনে। খাদেমে দ্বীনদের এ ঐক্য স্থায়ী কোন সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ না করলেও তৎকালীন পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এ দেশের কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ, ওলামা ও মাশায়েখ উত্তেহাদুল উম্মাহ নামে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ইসলামী ঐক্যের প্লাট ফরম গঠনে এগিয়ে আসেন। ইত্তেহাদুল উম্মাহর মূলনীতিতে বলা হয়েছে যে,

(ক) শুধু ওলামা ও মাশায়েখদের ঐক্যই যথেষ্ট নয়। সকল শ্রেণীর ও পেশার মসলমানকেই ঐক্যে শরীক হওয়ার সুযোগ দিতে হবে, যাতে মুসলিম উম্মতের সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি হয়।

(খ) হানাফী ও আহলে হাদীস, দেওবন্দী ও বেরলভী, আলীয়া ও কাওমী ইত্যাদি নামে যত বিভেদই থাকুক, ইত্তেহাদুল উম্মহ্তে সবাইকে সাদরে গ্রহণ করা হবে।

(গ) ইত্তেহাদুল উম্মাহ কোন রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও এতে রাজনৈতিক দালের প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) যে সব রাজনৈতিক দল ইসলামের স্বার্থে ইত্তেহাদুল উম্মাহতে শরীক হবেন, তাঁরা নিজস্ব দলীয় কর্মসূচী আগের মতই চালিয়ে যেতে পারবেন।

(ঙ) ইত্তেহাদুল উম্মাহ সরাসরি নির্বাচনে কোন প্রার্থী দাঁড় করাবেনা কিন্তু নির্বাচনের সময় ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে সে উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।

খতিবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদের (রহঃ) নিকট যখন উপরোক্ত মূলনীতিতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর দাওয়াত আসে তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে এ সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি ভাল ভাবে জানতেন এর উদ্যেক্তা কারা তারপরও ইসলামী জনতার মহান ঐক্যের খাতিরে ইত্তেহাদুল উম্মাহতে যোগ দেন। তিনিই ইত্তেহাদুল উম্মাহর মসলিসে সাদারতের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পরে অবশ্য কর্তৃপক্ষ তাঁর নাম দু'নম্বরে নিয়ে আসেন। খতীবে আযমের ইত্তেহাদুল উম্মাহর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অনেকে ভাল চোখে দেখেননি এমন কি দেওবন্দী আখলাকের অনেক শীর্ষস্থানীয় আলেম ও নেজামে ইসলাম পার্টির অনেক কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানাকে উত্তেহাদুল উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এতে করে নেজামে ইসলামের মূল স্রোত থেমে যাবে। মাওলানা কিন্তু ইত্তেহাদুল উম্মাহর মূলনীতির কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেন, "ইত্তেহাদুল উম্মাহ হচ্ছে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন আর আমি এতে যোগ দিয়ে কোন ভুল করিনি এবং আমার নিজ রাজনৈতিক সংগঠন নেজামে ইসলামের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হয়নি।"

আসল কথা হচ্ছে মরহুম মাওলানা মুসলমানদের খুটি নাটি বিভেদ সত্ত্বেও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলিম জনতার ঐক্যবদ্ধ প্লাট ফরম চেয়েছিলেন। অবশ্য আজ প্রশ্ন উঠতে পারে ইত্তেহাদুল উম্মাহর মিশন কত ভাগ সফল এবং যারা ইত্তেহাদুল উম্মাহতে যোগ দেননি তাঁরা কি বিকল্প স্থায়ী কোন ঐক্যবদ্ধ প্লাট ফরম তৈরীতে কৃতকার্য হয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় এখনো আসেনি। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় এতে করে মুসলমানদের ঐক্যের প্রাথমিক সাংগঠনিক ভিত রচিত হয়। অপর দিকে যারা যোগ দেননি তাঁদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি সচেতন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ প্লাট ফরম তৈরীর বেশ কটি প্রচেষ্টা চালান এবং পুরোপুরি সাংগঠনিক রূপ নেয়ার পূর্বে এ ঐক্যে ফাটল দেখা দেয় অবশ্য। ঐক্য প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

যাঁরা ইত্তেহাদুল উম্মাহতে যোগ দেননি তাঁদের প্রধান অভিযোগ এ সংগঠনটির নেপথ্যে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা মূখ্য। অথচ তাঁরা সবাই যোগ দিয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহর কর্তৃত্ব ভার যদি নিজেরা গ্রহণ করতেন তা হলে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা হয়ে পড়তো গৌন।

১৯৮১ সালের ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকায় টি এণ্ড টি কলোনী মসজিদে অনুষ্ঠিত দেশের ৩০০ জন নেতৃত্ব স্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি খতীবে আযম হযরত

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) দলমত নির্বিশেষে সকল ইসলাম পন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হবার উপর যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন ঃ

"হযরত মূসা (আঃ) এর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি ও ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ) এর নির্দেশ অমান্য করে বনী ইস্রাঈলের একটি অংশ গোবাছুর পুজার মতো শেরেকী কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে তাদেরকে উম্মত হতে বিচ্ছিন্ন না করে হযরত মূসা (আঃ) এর আগমনের অপেক্ষা করেছেন এবং সাময়িকভাবে শেরেককে বরদাশত করেছেন। কারণ, উম্মতের লোকদের সাময়িক কোন বিভ্রান্তির সংশোধন যত সহজ, তিক্ততার মধ্য দিয়ে বিভক্ত হবার পর স্বমতের প্রতি প্রধান্য দানের স্বাভাবিক প্রবনতায় লিপ্ত দল সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা তত সহজ নয়।"

"ছোট-খাট এখতেলাফী বিষয় ভুলে গিয়ে ইসলামের ভিত্তিতে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গঠনের স্বার্থে সকল ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলাম দরদী ব্যক্তিদের প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি। আমি আসার সময় অনেকে নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু দু'দিনের সম্মেলন আমাকে যে কতটা অভিভূত করেছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এ বৃদ্ধ বয়সে কেউ আমাকে অর্ধঘন্টা এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু এখানকার আলোচনা আমাকে এতই আকৃষ্ট করেছে যে, আমি সন্মেলন থেকে চলে যাবার সময় দ্বিতীয়বার না আসার চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত না এসে পারিনি। আমি যেন 'ইত্তেহাদুল উম্মাহর' আকর্ষণে গ্রেফতার হয়ে গিয়েছি। ইত্তেহাদুল উম্মাহর এ সম্মেলনে শরীক হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

তিনি বলেন, "আমি আজ জীবনাসায়াহ্নে এসে উপনীত হয়েছি। আমার দেহের শক্তি প্রায় ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সম্মেলনে এসে আমার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এই সম্মেলনের পর আপনাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। আমি নোয়াখালী থেকে আমার সফর শুরু করবো। সারা বাংলাদেশে ইত্তেহাদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবো। আমি আপনাদের কাছে এ দোয়া চাচ্ছি যেন আমার মৃত্যু মুসলিম উম্মাহর ইত্তেহাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই হয়।"

হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ অত্যন্ত আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, "ইত্তেহাদুল উম্মাহর সম্মেলনে আমি এসেছিলাম সন্দিহান মন নিয়ে, কিন্তু ফিরে যাচ্ছি সংশয়মুক্ত এবং আশাবাদী অন্তর নিয়ে। এ সম্মেলনে আগত ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ইসলাম-দরদী সুধী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যের নিষ্ঠাপূর্ণ সাড়া লক্ষ্য করে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছি। আমি বালেগ হবার পর থেকে বিভিন্ন মতের ওলামা ও মাশায়েখকে এভাবে একত্রিত হতে খুব কমই দেখেছি। আমি ইসলামের জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা কল্পে রাজনীতি করেছি, কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ব্যাপারে তেমন কিছু করতে পারিনি। আপনারা দোয়া করবেন যেন আলস্নাহ

আমাকে মাফ করেন। আমি আমরণ ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের ঐক্যের উদ্দেশ্যে নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি হিসেবে আমার সকল সদস্য ও সাথীদের নিয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহর পক্ষে কাজ করে যাব।"

খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ –

গত ২২শে জুলাই চট্টগ্রাম জেলার আজীজনগরে অবস্থিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে উত্তেহাদুল উম্মাহর উদ্যোগে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সাদারাতের অন্যতম সদস্য খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব প্রধান অতিথীর ভাষণে বলেন ঃ

"এদেশে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে ইত্তেহাদুল উম্মাহর সংগঠনে শরীক হওয়া সকল মুসলমানের কর্তব্য। সকল উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার এমন একটি সরল আহবান দিতে এর আগে আর কেউ সক্ষম হননি।"

তিনি বলেন, "ইত্তেহাদুল উম্মাহ একটি অরাজনৈতিক দল বটে, কিন্তু এতে প্রত্যেক দলের নিজ নিজ লাইনে রাজনীতি করার সুযোগ রয়েছে। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ আরো বলেন, আমি ইত্তেহাদুল উম্মাহর সভাপতিমণ্ডলীর প্রথম সদস্য। মৃত্যু পর্যন্ত আমি ইত্তেহাদে শরীক থাকতে চাই। আজকে যা বলছি তা আমার একান্ত মনের কথা।"

ইত্তেহাদ নেতা বলেন, "জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে আমি গোটা জাতিকে নিজেদের ভিতরকার বিভিন্ন খুঁটিনাটি মতভেদ, রাজনৈতিক স্বার্থ ও হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইত্তেহাদুল উম্মাহর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।"

প্রবীন রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট আলেম জনাব মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন, "ইত্তেহাদুল উম্মাহর বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। তাঁরা এদেশের ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোকে খুশী করার জন্য এবং নিজেদের অবস্থান নিরাপদ করার লক্ষ্য নিয়ে তা বলেন। নতুবা ইত্তেহাদুল উম্মাহর বিরোধিতা করার কোন যুক্তি নেই।"

তিনি বলেন, 'এখানে না আছে কোন ব্যক্তির প্রাধান্য আর না আছে কোন দলের প্রধান্য। আর একমাত্র এ কারণেই অন্য যে কোন সংগঠনের তুলনায় এ সংগঠনের মধ্যে সবচাইতে বেশী ওলামা-মাশায়েখ ও সুধীবৃন্দের সমাবেশ ঘটেছে।"

খতীবে আযমের রাজনৈতিক সহযোগী ঃ

মরহুম খতীবে আযম যাদের সাথে রাজনীতি করেছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম নিচে উলেস্নখ করা হল। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মাওলানা মরহুম হয়তো দলীয় রাজনীতি করেছেন নয়তো ফ্রন্ট রাজনীতি করেছেন।

১। জনাব মাওলা জাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ) (পাকিস্থান)।
২। জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (রহঃ), (সাবেক প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থান)।
৩। জনাব মাওলানা ইহতেশামূলহক থানবী (রহঃ), (করাচী)।
৪। জনাব রানা জাফরুল্লাহ, (লাহোর)।
৫। জনাব মাওলানা মতিন খতিব (রহঃ) (করাচী)।
৬। জনাব এডভোকেট মৌলভী ফরিদ আহমেদ (রহঃ), (কক্সবাজার)।
৭। জনাব ব্যারিষ্টার সানাউলস্নাহ (রহঃ), (চট্টগ্রাম)।
৮। জনাব অধ্যাপক সোলতানুল আলম (রহঃ), (অধ্যাপক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
৯। জনাব মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ), (কিশোরগঞ্জ)।
১০। জনাব মাওলানা আশরাফ চৌধুরী (রহঃ), (সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পূর্ব পাকিস্থান)
১১। জনাব মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ (রহঃ), (ঢাকা)
১২। জনাব শহীদ মাওলানা মাহমুদ মোস্থফা আলমাদানী (রহঃ),(ঢাকা)।
১৩। জনাব মাওলানা মুসলেহুদ্দীন, (ব্রাক্ষণবাড়ীয়া)।
১৪। জনাব এডভোকেট ফিরোজ আহমদ চৌধুরী, (কক্সবাজার)

ছাত্র রাজনীতির ক্রম বিকাশে খতীবে আজমের চিন্তাধরা ও ভূমিকা ঃ

মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ নেতৃত্ব সৃষ্টি ও সফলকাম ইসলামী বিপ্লব ঘটাবার লক্ষ্যে একদল দক্ষ চরিত্রবান, জ্ঞানী, যোগ্য ও নিবেদিত প্রাণ কাফেলা সৃষ্টির জন্য ১৯৬৯ সালের এক শুভ লগ্নে সংগ্রামী নেতা হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদের (রহঃ) যৌথ প্রচেষ্টায় ইতিহাসের পাতায় জন্ম লাভ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতির্নিধিত্বশীল সংগঠন "ইসলামী ছাত্র সমাজ"। এর আগে মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ), মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ), মাওলানা সামসুল হক থানভী, মাওলানা মতিন খতীব (রহঃ), মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ), মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতা করাচীতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে দ্বীনি আন্দোলনের কাজ চালানোর জন্য একটি "ছাত্র সংগঠন" গঠনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। ইসলামী ছাত্র সমাজ গঠন ঐ পরিকল্পনারই বাস্থবায়ন।

১৯৭০ সালের ২৩শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে ইসলামী ছাত্র সমাজ এক গণ জমায়েতের আয়োজন করে। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে ইসলামী সংবিধান প্রবর্তনের বাধাদানকারীদের হুঁশিয়ার করে দেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলামী ছাত্র সমাজের পৃষ্ঠ পোষকতা করেছেন।

১৯৮৪ সালের ২৭শে এপ্রিল চট্টগ্রাম মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত ইসলামী ছাত্র সমাজের কর্মী সম্মেলন ও সুধী সমাবেশ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা '৮৪ তে যে বাণী দিয়েছেন নিচে তা পাঠকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল-

"বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজের চট্টগ্রাম জেলা সম্মেলন" ৮৪ হতে যাচ্ছে শুনে আনন্দিত হয়েছি। দাওয়াত পাওয়া সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে উদ্বোধনী মজলিসে উপস্থিত থাকতে পারছিনা বলে দুঃখিত। কিন্তু আমার হৃদয় তোমাদের মাঝে পড়ে থাকবে। দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে ইসলামী ছাত্র সমাজ একদল যোগ্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার যে বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তা দেখে বৃদ্ধ বয়সে আমার মনে নতুন জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে। তোমাদের তৎপরতার মাঝেই যেন আমি নিজেকে খুঁজে পাই।

আমার প্রতীতি জন্মেছে যে তাগুতী শক্তির জমাট বাঁধা অন্ধকার ব্যূহ ভেদ করে ইসলামী ছাত্র সমাজের তরুণ সৈনিকেরাই জেগে উঠবে প্রভাতের সূর্যের ন্যায় ইসলামী আন্দোলনের দিক চক্র বালে।

যে কোন পরিস্থিতিতে এবং যে কোন পরিবেশে পবিত্র কোরানের নীতি নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাবে। এতেই মুক্তি, এতেই বিজয়।

এর গুরুন দায়িত্ব এ আন্দোলনে ইসলামী ছাত্র সমাজ জোর কদমে সামনে এগিয়ে চলুক এবং তাদের মাঝেই সৃষ্টি হোক হযরত আবু বকরের (রাঃ) এর মতো নীতির প্রশ্নে আপোষহীন সংগ্রামী, হযরত ওমরের মতো দূরদর্শী প্রশাসক, হযরত উসমানের ন্যায় সরল ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন, হযরত আলীল (রাঃ) ন্যায় জ্ঞানী ও বীর কেশরী এবং হযরত খালিদের মতো শ্রেষ্ঠ সেনাপতি আলল্লাহর কাছে এই আমার প্রার্থনা। আমীন।"

১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম পৌর করপোরেশনের দেয়ালে "আল-কোরআনই বিশ্ব মানবতার মুক্তির মূল সনদ" এ শেস্নাগান লিখার সময় প্রায় রাত ১টায় ছাত্র ইউনিয়নের কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল কর্মী লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে ইসলামী ছাত্র সমাজের কর্মীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এ হামলায় ছাত্র সমাজ কর্মী সোলতান মাহমুদ চৌধুরী, আবদুল রহিম,

মুহাম্মদ ইদরিস ও আবু তাহের গুরুতর আহত হন এবং প্রায় অচেতন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দিন কয়েক চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে চট্টগ্রামের সিরাজদ্দৌলা সড়কস্থ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ একাডেমীতে তাদের বিশ্রামে রাখা হয়। হযরত খতীবে আযম তখন পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে ঢাকার পি, জি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঢাকা থেকে নিজবাড়ী চর্কারিয়া ফেরার পথে তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ একাডেমীতে আহত কর্মীদের দেখতে আসেন এবং শান্ত্বনা দেন। জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে হলেও দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য কর্মীদের তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন তোমাদের এ রক্ত দান বৃথা যাবেনা। মাওলানার এ বক্তব্য আহত কর্মীদের মাঝে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শিহরণ জাগে।

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কার আন্দোলনে খতিবে আজমের বিপ্লবী চিন্তাধারা ও ভূমিকাঃ

শিক্ষা সংস্কারের খতিবে আযমের বিপ্লবী চিন্তাধারা

প্রাথমিক কথা

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এর অধিবাসীদের শতকরা প্রায় নব্বই জনই মুসলমান। তাদের রয়েছে 'ইসলাম' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়নি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, একদিকে দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অবর্তমানে মুসলমানগণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই আপামর মুসলিম জন-সাধারণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছেনা। অপরদিকে, নাস্তিক্য জড়বাদী শিক্ষার প্রভাবে বিপুল সংখ্যক মুসলিম যুব মানস রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে দু'টি বিপরীতমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা নামক পাশ্চাত্য-শিক্ষা আর অপরটি হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা নামক ধর্মীয় শিক্ষা। এই মাদ্রাসা-শিক্ষা আবার দু'টি ভিন্নমুখী ধারায় পরিচালিত হয়ে আসছে। একটি হচ্ছে দেওবন্দী বা কওমী (বেসরকারী) পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অপরটি হচ্ছে আলীয়া পদ্ধতির সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষা। উল্লেখিত ত্রিমুখী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার কোনটিও নিজ নিজ ক্রটি ও অপূর্ণাঙ্গতার দরুণ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। কারণ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তার সাথে ইসলামী শিক্ষার দুরতম সম্পর্কও নেই বলা যায়। তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুসলমানদের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে গণ্যও করা যায় না। অপরদিকে, আলীয়া পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় মিশ্র পাঠ্যরীতি প্রবর্তনের ফলে বৈষয়িক শিক্ষার দাপটে মূল ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। এ পদ্ধতির মাদ্রাসাগুলোর (অনেকটার) শিক্ষা দীক্ষা একটি বিতর্কিত ভাবধারা মুখী পরিচালিত। সর্বোপরি, ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্যগত পরিবেশও সেখানে অনুপস্থিত। আর দেওবন্দী পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক বিষয়াবলী সম্পূর্ণভাবে থাকলেও প্রয়োজন পরিমাণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়বালী অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এ শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণ যুগোপযোগী বলা যায় না। তদুপরি, এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় নব্য বাতিল মতবাদসমূহের তরদিদমূলক পাঠ্য বিষয় এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চারও অভাব রয়েছে। সর্বোপরি, উক্ত পদ্ধতির মাদ্রাসাগুলোতে (অনেকটাতে) ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশও (বর্তমানে) নেই। সুতরাং এ শিক্ষাধারার বর্তমান পদ্ধতিও ক্রটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ এবং বর্তমান যুগের জন্য যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার অভাবে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ

বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নেতৃত্ব দিয়ে 'পথ প্রদর্শক' হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

এ পরিস্থিতির অবসান কল্পে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা -ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পরত থেকে এর জন্য বহু চেষ্টা প্রচেষ্টা চলে আসছে। একদিকে দেশের প্রচলিত ত্রিমুখী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মুসলমানদের আদর্শ ভিত্তিক একমুখী জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য চলছে বিচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিক আন্দোলন। অপরদিকে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দী পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাকে কিছুটা সংস্কার, পরিবর্ধন ও শৃংখলায়নের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষায় রূপান্তরিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা। এ পরিপ্রেক্ষিতে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বহু ধরনের প্রস্তাব, পরামর্শ ও কর্মসূচী প্রকাশ ও প্রচার করা হয়ে আসছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছু কিছু গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, লক্ষনীয় ব্যাপার হলো, এ পর্যায়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রদত্ত মতামত ও পরামর্শসমূহের যথাযথ যাচাই -বাচাই ও সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণ না করে আবেগের বশবর্তী হয়ে সে সবের আলোকে শিক্ষা -সংস্কার করতে গিয়ে অনেকেই ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংহার করে দিচ্ছেন। আবার অনেকেই 'ঐতিহ্য সংরক্ষণ' এর দোহাই দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারকে দেখছেন ভীতির চোখে। এমতাবস্থায় বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলেম, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ খতীবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রঃ) শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতায় যেসব মতামত, পরামর্শ ও কর্মসূচী পেশ করেছেন, সেগুলোকে নতুনভাবে তুলে ধরা একান্তভাবে প্রয়োজন। যাতে শিক্ষা-সংস্কারে যারা এগিয়ে আসবেন, তারা সুষ্ঠু নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়নে ভুলপথে পরিচালিত না হয়।

উল্লেখ্য যে, মরহুম খতীবে আজম (রঃ) ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের অগ্রপথিক। তাঁর মত ব্যাপক ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা-সংস্কারের ডাক আর কেউ দিয়ে গেছেন কি-না, তা আমার জানা নেই। "মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রম বিকাশের ধারা" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখে তিনি শিক্ষা সংস্কারের জন্য সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি 'দৈনিক আজাদ'; মাসিক মদীনা এবং মাসিক আততাওহীদে' প্রকাশিত হবার পর "মুসলমানদের মধ্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।" (প্রকাশকের কথা ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা) পরে প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কর্তৃক প্রচারিত 'প্রশ্নমালা'র উত্তরে তিনি যেসব মতামত ব্যক্ত করেছিলেন সে সব পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলে শিক্ষা-সংস্কারের একটি রূপরেখা সচেতন ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সুধীজনের চিন্তা জগতে মাদ্রাসা-শিক্ষার সংস্কারের যে ভাবনা জাগে তা তাঁরই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি বলা যায়। তাই শিক্ষা

সংস্কারে তাঁর যে সব নীতিমালা ও রূপরেখা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সে সবের অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করি।

মাদ্রাসা-শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

শিক্ষা-সংস্কারের মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগেই আমাদের জেনে নিতে হবে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার না করেই যদি সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, তা হলে সংস্কারের মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেবার প্রয়োজনই থাকে না। অন্যথায়, মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার একান্ত ও আবশ্যিক। এ পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ

"মাদ্রাসা শিক্ষার পরম লক্ষ্য হতেছে জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা।" (প্রশ্নমালার উত্তরে ঃ ১১)

তিনি আরো বলেন ঃ

"দ্বীনি শিক্ষার প্রসার ও সর্বোপরি আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার' এর উদ্দেশ্য একদল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নৈতিক শক্তিসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করাই মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।" (প্রশ্নমালার উত্তরে ঃ ২)

তিনি আরো বলেন ঃ

"মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য হতেছে 'এলায়ে কলেমাতুল্লাহর' উদ্দেশ্যসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করা।" (প্রশ্নমালার উত্তরে ঃ ১৮)

পাক ভারত ও বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাগুলো যেহেতু দেওবন্দ সাহারানপুর মাদ্রাসার ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত সেহেতু এসব মাদ্রাসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন। তই প্রসঙ্গক্রমে দেওবন্দ সাহারানপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ

"ইসলামী আন্দোলনের ধারাকে কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখার জন্য দেওবন্দ ও শাহারানপুর মাদ্রাসার মত বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। (সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কেরাম)।"

(আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ৪)

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো বর্তমানে অর্জিত হচ্ছে কিনা তা সুধীজনরাই বিবেচনা করবেন। আমার নিজের কোন মন্তব্য করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করিনা। তবে খতীবে আজম (রহঃ) এর মতে, মাদ্রাসা শিক্ষার উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। তাই তাঁর সুচিন্তিত মতামতগুলোই শুধু তুলে ধরছি।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ক্রটি ঃ

খতীবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব (রহঃ)এর মতে মাদ্রাসা শিক্ষার উপরুক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো বর্তমানে পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হচ্ছে না। আলীয়া পদ্ধতির নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম এবং দেওবন্দী পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"এই তিন প্রকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা 'এলায়ে কলেমতুল্লাহ' ও 'যুগের চ্যালেঞ্জের' মোকাবেলা করার জন্য যতটুকু যোগ্যতা প্রয়োজন তা এ তিন প্রকার মাদ্রাসা শিক্ষার কোনটার দ্বারাই সৃষ্টি হতেছে না।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -৩)

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন ঃ

.... এমতাবস্থায় ব্যর্থতার একমাত্র কারণ হতেছে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তর্নিহিত ক্রটি।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -৪)

শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ণাঙ্গতা ঃ

"খতীবে আজম (রহঃ) এর মতে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জন করতে পারছেন না। বরং, উভয়বিধ মাদ্রাসা শিক্ষায় দেশের বিপুল চিন্তা শক্তির অপচয় ঘটছে। তাই, শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"এ দুই প্রকার মাদ্রাসায় যে দেশের বিপুল চিন্তাশক্তির অপচয় হতেছে, উহা স্বীকৃত সত্য। ১০/১২ বৎসর ছাত্ররা এই সব মাদ্রাসায় পড়ে, অথচ না আরবী ভাষায় ইহাদের কোন দখল হয়, না খালেছ দ্বীনি শিক্ষা অর্থাৎ কোরআন হাদীস, ফেকাহ ও আকায়েদ সম্পর্কে ষ্টেন্ডার্ড শিক্ষা লাভ করে। তবে স্বীকার করতে হবে, পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষা ছাত্ররা পায় না। এর প্রমাণ হল জীবনের বহু দিক সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কি, উহা এক প্রকার তাহাদের ধারণার অতীত। ১০/১২ বৎসর শিক্ষার পরও এ অবস্থা হলে নিশ্চয় এ ব্যবস্থায় চিন্তা শক্তির অপচয় হচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -৭)

সংশয় নিরসন ঃ

এখানে উল্লেখ থাকে যে, হযরত খতীবে আজম (রাঃ) বাংলাদেশের উভয় প্রকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার 'ক্রটি' রয়েছে বলে উল্লেখ করলেও চরমপন্থীদের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ ও বেকার বলেননি। বরং, মাদ্রাসা শিক্ষার অবদানকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তুলে ধরেরেছন। তিনি বলেন ঃ

"বাংলার উভয়বিধ মাদ্রাসা শিক্ষা ক্রটিমুক্ত না হইলেও বিগত পৌণে এক শতাব্দী ব্যাপী এদেশের ইসলামী মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, তা সত্যই অভূত পূর্ব।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা-১০)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যথাসময়ে এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত না হলে পাক-ভারত (বাংলাদেশ) এ ইসলামী শিক্ষার কোন নাম নিশানা থাকত কি না সন্দেহ। যতটুকু ইসলামী প্রভাব আজ এ দেশে বাকী রয়েছে, উহা এসব মাদ্রাসা শিক্ষারই অবদান।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -২)

মুসলিম আদর্শ বিরোধী জাতীয় শিক্ষা ঃ

বলা বাহুল্য যে, এ মাদ্রাসা শিক্ষার 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' ও 'গুরুত্বপূর্ণ অবদান' থাকলেও তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। অন্যদিকে, বাংলাদেশের যে 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা' রয়েছে, তা-ও মুসলমানদের আদর্শ বিরোধী। এ প্রসঙ্গে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ

"আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, উহা বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় জড়বাদী দর্শনই এর ভিত্তি।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -২৫)

এমতাবস্থায়, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন অতীব জরুরী বলে তিনি মনে করেন। তবে, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার যেসব কারণের প্রতি এখানে ইংগিত করা হল, সেগুলো ছাড়া আরো বহু কারণ তিনি ব্যক্ত করেন। এ স্বল্প পরিসরে সবগুলোর উল্লেখ সম্ভব হয়নি। বিস্ত ারিতভাবে জানতে হলে, তাঁর লিখিত "মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা" নামক পুস্তিকাটি এবং "আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য" নামক তাঁর বক্তৃতা সংকলনটি দেখা যেতে পারে। সেখানে "মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা" এবং "আলেম সমাজের দায়িত্ব" বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি গভীর বেদনা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে যে মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিয়ে রেখেছেন, তা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি না করে পারে না।

জাতীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার একত্রিকরণ ঃ

জাতীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষা (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা) ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে একত্রিকরণের প্রস্তাবও অনেকেই দিয়ে থাকেন। ফলে, বিষয়টি সম্ভব ও উচিত কি -না, তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলেও অনেকে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু খতীবে আজম (রাঃ) বলেন, এটা কখনো হতে পারে না। জাতীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা

শিক্ষার একত্রিকরণকে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার মৃত্যু পরওয়ানার সমতুল্য' বলে অভিহিত করেন প্রস্তাবিত (১৯৬৪ সালে) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের এরকম একটি প্রস্তাবের উত্তরে তিনি বলেন ঃ

" .... আমরা কোনদিন মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত একত্রিকরণের প্রস্তাব করতে পারিনা। কারণ, উহা হবে মাদ্রাসার মৃত্যু পরওয়ানার সমতুল্য। (প্রশ্নমালার উত্তরে-২০)

তিনি আরো বলেন ঃ

"মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা বহির্ভূত রাখতে হবে।" (ঐ ঃ ২৫)

কেন একত্রিকরণ করা যাবে না ঃ

জাতীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন একত্রিকরণ করা যাবে না তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"এদেশে ইংরেজরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, উহাই আমাদের আজিকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠান হতে ইংরেজ আমলে যে ধরনের লোক বের হত, আজও ঠিক সেই ধরনের লোক সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানবিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এদের মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শন।" (প্রশ্নমালার উত্তরে-২০)

কওমী মাদ্রাসা ও আলীয়া মাদ্রাসা ঃ

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রচলিত দ্বিমুখী ধারার দ্বিপ্রকারের মাদ্রাসা শিক্ষাকে একত্রিতকরণ করা যায় কিনা, এ সম্পর্কে অনেকে চিন্তা ভাবনা করে থাকেন। কিন্তু, খতীবে আজম (রহঃ) এর মতে, তাও সম্ভব হতে পারে না। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন ঃ

"ওল্ড স্কীম ও খারেজী (কওমী) ব্যবস্থায় দুই প্রকার ভিন্ন মেথডে শিক্ষা দেওয়া হয়। দুই প্রকার মাদ্রাসার লক্ষ্য এক হলেও ঐতিহ্য, পরিবেশ ও মেজাজ ভিন্ন। এমতাবস্থায় উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার একত্রিকরণ সম্ভব বলে আমি মনে করিনা।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -৬)

ভবিষ্যত করণীয় ঃ

সুতরাং একথা পরিস্কার হয়ে বুঝা গেল যে, খতীবে আজম (রহঃ) এর মতে, জাতীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা এবং দ্বিবিধ মাদ্রাসা শিক্ষাকে একত্রিকরণ উচিত ও সম্ভব নয়। তাই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে কিভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষায় রূপান্তরিত করা যায়, সে বিষয়ে তার মতামতগুলো ধরাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর (রাঃ) শিক্ষা দর্শন ও ভারসাম্য পন্থা

শাহ সাহেবের শিক্ষা-দর্শনের অনুসরণ ঃ

খতীবে আজম (রহঃ) মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারে ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এর শিক্ষা দর্শন অনুসরণ করার জন্য আহবান জানান। তাঁর মতে ইসলামীয়াতের উন্নত শিক্ষার জন্য শাহ সাহেবের ভারসাম্য পন্থায়' অগ্রসর হলে সার্বিক সমস্যার সমাধান সহজতর ও শিক্ষার সুলভ দ্রুত সম্প্রসারিত হবে। তাঁর শিক্ষা দর্শন কি ছিল এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর দর্শন ছিল গতানুগতিক দরসে নেজামিয়ার অন্ধ অনুকরণ না করে মৌল ইসলামিয়াত, অর্থাৎ হাদীস, তফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের গবেষণা ভিত্তিক উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা। বৈষয়েক ও মাকুলাত বিষয়ক যতটুকু সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজন ও ইসলামী শিক্ষার জন্য সহায়ক ততটুকু মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষা দেওয়া।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা ঃ৪)

ভারসাম্য পন্থার অনুসরণের সুফল ঃ

শাহ সাহেবের শিক্ষা-দর্শন অনুসরণ করার সম্ভাব্য সুফল ও উপকারিতা সম্পর্কে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ "তফসীর, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের গবেষণা ভিত্তিক উন্নত শিক্ষার জন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহর (রহঃ) প্রদর্শিত 'ভারসাম্য পন্থায়' অগ্রসর হলে কোরআন হাদীসের আলোকেই সর্বপ্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, জাগতিক ও মজহাবী সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন যেমন সহজতর তেমনি উহার শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে উহার সুফল সমগ্র জাতির মধ্যে দ্রুত সম্প্রসারিত করে দেওযা সহজতর।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১২)

অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

শাহ সাহেবের উক্ত শিক্ষা দর্শন অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ "তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি এতই শক্ত যে, উহার প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা আজও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং মুসলমানদের রাজ্যহারা হওয়ার পরও তাদের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি হারায় নি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে চলেছে। যদিও প্রতিকূল পরিবেশের জন্য সর্বগ্রাসী রূপ গ্রহণ করতে পারে নি।" (মাঃশিঃ ক্রম বিকাশের ধারা-৪)

পাঠ্যসূচীর সংস্কার ও মান্নোয়ন ঃ

হ্রাস, সংযোজন ও মানোন্নয়ন ঃ

খতীবে আজম (রহঃ) মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারে মূখ্য করণীয় হিসেবে পাঠ্যসূচীর সংস্কারকে চিহ্নিত করেন এবং এর প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে পাঠ্যসূচীতে হ্রাস, সংযোজন এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন ও স্তর বিন্যাস

অবশ্যই করতে হবে। তিনি বলেন ঃ "দ্বিতীয় বিষয়সমূহের শিক্ষার মান আরও উন্নত করে অপরাপর বিষয়সমূহ হ্রাস ও সংযোজন অবশ্যই করতে হবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -১২)

(ক) স্তর বিন্যাস ঃ

মাদ্রাসা-শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষায় রূপান্তরিত করার সুবিধার্থে খতীবে আজম (রহঃ) এর মতে, মক্তব থেকে শুরু করে জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ১৬ বছরের একটি শিক্ষা কোর্স বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। তাঁর প্রস্তাবিত এই শিক্ষা কোর্সের স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"ইহার বিভিন্ন স্তর হবে নিম্নরূপ ঃ মক্তব (বা প্রাথমিক) ৫ বৎসর: দাখেল (বা মাধ্যমিক) ৫ বৎসর: ফাযেল (বা স্নাতক) ৪ বৎসর; কামেল (বা স্নাতকোত্তর) ২ বৎসর।" প্রশ্নমালার উত্তরে-২৬)

তিনি তাঁর প্রস্তাবিত স্তর বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত মোতাবেক পাঠ্য বিষয়ও নির্ধারণ করে দেন।

ফাজেল বা স্নাতক পর্যায় ঃ

"ইহার বাধ্যতামূলক বিষয় হবে- হাদীস, তফসীর, ফিকহ, উসূল, আকায়েদ, ইসলামের ইতিহাস ও আরবী সাহিত্য। (প্রশ্নমালার উত্তরে-১৫)

ইহা ছাড়া কম্বিনেশন সাবজেক্ট এর যে কোন ৫টি বিষয় ঃ (১) রাষ্ট্র বিজ্ঞান (২) অর্থনীতি (৩) সমাজ বিজ্ঞান (৪) মনতেক, (৫) হেকমত, (৬) বাংলা, (৭) উর্দু, (৮) ইংরেজী, (৯) জেনারেল সাইন্স, (১০) ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক ব্যাখ্যা।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -১৫)

দাখেল বা মাধ্যমিক পর্যায় ঃ

"মাধ্যমিক পর্যায়ে আরবী সাহিত্য, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, হাদীস, তফসীর, এলমে কালাম ও ইসলামের তামাদ্দুনিক ইতিহাসের শিক্ষাকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৭)

এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের যে কোন ৫টি কম্বিনেশন বিষয় হিসেবে গণ্য হবে ঃ (১) ইসলামের ইতিহাস (২) রাষ্ট্র বিজ্ঞান (৩) অর্থনীতি, (৪) সমাজ বিজ্ঞান, (৫) মনতেক (৬) হিকমত, (৭) বাংলা, (৮) উর্দু, (৯) জেনারেল সাইন্স ও (১০) ইসলামী জীবন ব্যবস্থা।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -২৮)

মক্তব বা প্রাথমিক পর্যায় ঃ

"শিশু সন্তানদের ধর্মীয় রীতি-নীতিতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ ও ইসলামী পরিবেশে মাতৃভাষা ও গণিতের নিম্নতম পর্যায়ের শিক্ষাদানের জন্য দেশের সর্বত্র মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে গড়ে তুলতে হবে।" (ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৮)

মক্তব পর্যায়ের অন্যান্য পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

" .... এমতাবস্থায় মক্তবসমূহের শিক্ষার সাথে প্রাইমারী মানের পার্থিব বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -১১)

(খ) পাঠ্যসূচীর হ্রাস ঃ

খতীবে আজম (রহঃ) এর মতে, মাদ্রাসার বর্তমান পাঠ্যসূচীতে কয়েকটি বিষয় হ্রাস করতে হবে। তিনি হিকমত, মনতেক, বালাগাত ও প্রাচীন মাকুলাত বিষয়াবলী বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"হিকমত; মনতেক ও বালাগাত বাদ দেওয়া যেতে পারে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে এ সব বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য ছিল এবং বাস্তব জীবন, ধর্মীয় ও পার্থিব কোন ক্ষেত্রেই এগুলোর আর প্রয়োজনীয়তা নেই।

উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় অপশনাল বিষয় হিসেবে এই সবকে আধুনিক বিষয়সমূহের পাশাপাশি রাখা যেতে পারে।"

(মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা ঃ১৬)

তিনি আরও বলেন ঃ "প্রাচীন মাকুলাত বিষয়বালী তার প্রয়োগনীতি হারিয়ে ফেললেও যুগোপযোগী ইসলামী দর্শনের সহায়ক মাকুলাত বিষয় নির্বাচনে ওলি উল্লাহ চিন্তাধারার ভিত্তিতে ফলপ্রসু সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনও সফল হয় নি।" (ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ৯)

সংশয় নিরসন ঃ

এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও খতীবে আজম (রহঃ) পুরাতন মাকুলাত বিষয়াবলীর প্রয়োজনীয়তা নাই বলে মত প্রকাশ করেছেন, তবুও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় মাকুলাতের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আসলে, তিনি সাধারণভাবে পুরাতন মাকুলাত বিষয়াবলী এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ মাকুলাত বিষয়াবলীর প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করছেন। অথচ, উচ্চ পর্যায়ের মাকুলাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"দ্বীনি শিক্ষার সমাপ্তি পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণকে এমন বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে তাহারা কোথাও ঠেকা বশতঃ ইহা উপলব্ধি না করে যে, ইসলাম বাস্তব জীবনে অচল।" (ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৬)

(গ) পাঠ্যসূচীতে সংযোজন ও সন্নিবেশ ঃ

ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তা উপলব্ধি করার জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই খতীবে আজম (রহঃ) মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক বিষয়াবলী এবং ইসলামের তামাদ্দুনিক ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত নব্য বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় ইলমে কালামের সহায়ক হিসেবে ইলম তাছাউফকেও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। প্রথমে তিনি মাদ্রাসাগুলোতে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা না হওয়ার কারণ হিসেবে ওলামায়ে হক্কানীর 'চিন্তাশক্তির স্থবিরতা' এবং 'অতি পুরাতন মাকুলাত চর্চার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ "ওলামায়ে হক্কানীর চিন্তাশক্তির স্থবিরতার জন্য একদিকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষা যেমন হচ্ছে না, অপরদিকে মাকুলাতের নামে কতকগুলা অতি পুরাতন বিষয় পড়ান হচ্ছে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে ঃ ৭)

তাই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

(১) আধুনিক বিষয়াবলী ঃ

পাঠ্যসূচীতে আধুনিক ও পার্থিব বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করার কাজ হিসেবে তিনি বলেন ঃ

" ----- বর্তমানে আধুনিক বিষয়াবলীর জ্ঞান না থাকলে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করা এবং অন্যান্য মতবাদের অসারতা প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়।" (প্রশ্নমালার উত্তরে ঃ ১৮)

তবে, পার্থিব বিষয়গুলোকে মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আগে ইসলামী মূল্যবোধ ও দর্শন এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সংশোধন করার পরামর্শ দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা বিধায়, আমাদিগকে সমস্ত পার্থিব বিষয়সমূহ ও ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গীতে পূরণ করে শিক্ষা দিতে হবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে ঃ ৩০)

একটি গাজাখুরী প্রস্তাবের জওয়াব ঃ

এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ও পার্থিব বিষয়াবলীকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, তবুও বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়াবলী মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবেনা। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তাই তিনি বলেন ঃ

" .... জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি পৃথক বিভাগ রহিয়াছে, সেখানে যদি বাণিজ্য বিভাগে বিজ্ঞান শিক্ষার মত গাজাখুরী প্রস্তাব করা না হয়, তবে মাদ্রাসার কারিকুলামে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রস্তাব কেন করা হয়, তার কোন কারণ আমাদের বোধগম্য নয়। (প্রশ্নমালার উত্তরে ঃ ২৩)

সুতরাং, বিজ্ঞানের কতটুকু অংশ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"বিজ্ঞানের শুধু ঐ সমস্ত বিষয় পড়া যেতে পারে, যার সাথে যুগের চ্যালেঞ্জের সম্পর্ক রয়েছে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -২৩)। মোটকথা, তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে সাধারণ বিজ্ঞানকেই অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষপাতী।

(২) রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অর্থনীতি ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে 'সিয়াসিয়াত ও একতেসাদিয়াত' এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন ধারার সমন্বয় সাধন করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষানীতিতে বালাকোটের সে জেহাদী প্রেরণা কার্যকরী করতে হবে সামগ্রিকভাবে।" (আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ১৬)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আধুনিক যুগে 'সিয়াসিয়াত ও একতেসাদিয়াত' এমনি বিষয় যে,এর উপর দখল ছাড়া ইসলামই যে পরিপূর্ণ জীবন বিধান তা বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ বিষয় সমূহকে ইসলামী জীবন দর্শন ব্যাখ্যার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।" (ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৬)

(৩) সমাজ বিজ্ঞান ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "ইসলামকে যদি আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি করতে চাই তবে, রাষ্ট্র

বিজ্ঞানের, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি অবশ্যই আমাদের পাঠ করতে হবে। কারণ, এসব বিষয়ের উপর দখল না হওয়া পর্যন্ত কোন জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরা ও স্বকীয় দর্শনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।" (ক্রমবিকাশের ধারা - ১৩)

(৪) ইসলামের তামাদ্দুনিক ইতিহাস ঃ

খতীবে আজম (রহঃ) মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামের তামাদ্দুনিক (সাংস্কৃতিক) ইতিহাসকে পাঠ্যসূচী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে কোন কোন কিতাব ও বিষয় পড়ানো দরকার সে প্রসঙ্গে বলেন ঃ

" .... এ বিষয়ে 'কাসাসুল আম্বিয়' ও ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও অনুশীলন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস ও শাসন পদ্ধতি অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। (ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৭)

(৫) ইলমে তাছাউফ ঃ

খতীবে আজম (রহঃ) আকায়েদের কিতাবে আধুনিক বাতিল 'তরদীদ' সন্নিবেশিত করতঃ এর সহায়ক হিসেবে ইলমে তাছাউফকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তাই তিনি বলেন ঃ

"আকায়েদের পাঠ্য পুস্তকে আধুনিক যুগের বাতিল মতবাদের তরদিদও সন্নিবেশিত করতে হবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে - ১২) এবং এর সহায়ক হিসেবে

"এ বিষয়ের (ইলমে কালাম) সহায়ক হিসেবে এলমে তাছাউফের বিকাশ আবশ্যক। যাতে শিক্ষার্থীরা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও মনোযোগী হতে পারে। তদুপরি, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তরদীদ ও ইসলামের সহিত তুলনামূলক অধ্যয়ন ও ধর্মীয় প্রচারে নতুন প্রাণ শক্তি লাভ করতে পারে।" (ক্রমবিকাশের ধারা ১৬)

মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম ঃ

খতীবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) এর মতে, মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম হবে একমাত্র আরবী। উর্দূ ও বাংলার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা দেয়া যাবে। ফার্সী ও অপশন্যাল বিষয় হিসেবে থাকবে। এ সম্পর্কিত তাঁর বিস্ত ারিত মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) আরবী ঃ

ফাজেল পর্যায়ের মাধ্যম ঃ

"ফাজেল ও ফাজেলোত্তর পর্যায়ে আরবীকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মক্তব ও দাখেল পর্যায়ে বাংলা ও উর্দুকে ব্যবহার করা চলবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে-২৮) এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন ঃ

"এ (উচ্চ) পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম আরবী হওয়া উচিৎ। এতে ছাত্ররা পূর্ববর্তী ইমামদের ভাবধারার সাথে সরাসরি পরিচিত হতে ও মৌল সহায়ক গ্রন্থসমূহের রস ও স্বাদ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা - ১৫)

আরবী সাহিত্যের মানোন্নয়ন ঃ

খতীবে আজম (রহঃ) এর মতে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বর্তমান মান সন্তোষজনক নয়। তাই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মানোন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন ঃ "আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বর্তমান মানকে কোন প্রকারেই সন্তোষজনক বলা যায় না। একে অধিকতর বাস্তবমুখী করে এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক সব ব্যাপারে তাদের ভাবকে সহজভাবে প্রকাশ করতে ও প্রবন্ধাদি লিখতে পারে তদনুযায়ী উন্নীত করতে হবে।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা- ১৬)

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের জন্য তিনি চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন ঃ

(১) উচ্চমানের পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ, (২) শিক্ষার সকল স্তরে আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়া, (৩) ফাজেল পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম আরবী করা, (৪) আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স কোর্স প্রবর্তন। তিনি বলেন ঃ "উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় আরবীকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহা ছাড়া আরবী শিক্ষার বুনিয়াদ ছাত্রদের মধ্যে যাতে শক্ত হয় তজ্জন্য উচ্চমানের পুস্তক পাঠ্য তালিকাভূক্ত করতে হবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -১৫)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আরবী ভাষায় ছাত্রদের বুনিয়াদ শক্ত করার উদ্দেশ্যে মক্তব পর্যায় হতে আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান এবং ফাজেল পর্য্যায়ে দ্বীনি বিষয়সমূহ আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য ফাজেল পর্য্যায়ে অনার্স কোর্সও প্রবর্তন করা যায়।" (প্রশ্নমালার উত্তরে - ২২)

জেনে রাখা ভাল ঃ

এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশের অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একমাত্রা বাংলাকেই গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার সকল পর্যায়ে বাংলাই হবে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু হযরত খতীবে আজম (রহঃ) বলেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব অবাস্তব। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন ঃ

(ক) .... বাংলার মাধ্যমে ইসলামীয়াতের উচ্চতর বিষয়সমূহের শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব অবাস্তব। এ পর্যায়ের শিক্ষা একমাত্র আরবীর মাধ্যমে দেওয়াই সঙ্গত। কারণ, ইসলামী পরিভাষাসমূহের অনুবাদ করা যেতে পারেনা। (খ) তা ছাড়া ইসলামী বিষয়সমূহ আরবীর মাধ্যমে যত সহজে আয়ত্ব করা যায় তাহা অপর কোন ভাষা দ্বারা সম্ভব নয়।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -১৬)

(খ) মাতৃভাষা বাংলা ঃ

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাই বাংলাদেশের জনগণকে ইসলামী আদর্শে পরিচালিত করার মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে ওলামায়ে কেরামকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী হতে হবে। এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলার গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে খতীবে আজম (রহঃ) এর চিন্তাধারা হলো নিম্নরূপ।

মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চার গুরুত্ব ঃ

"মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতি মাতৃভাষার মাধ্যমে ইসলামের অধিকতর চর্চা করেছে। তা একদিকে সমগ্র জাতিকে ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, সে ভাষায় মৌলিক অবদান রাখিয়া বিশ্বের সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা -১৪)

বাংলাভাষী ওলামায়ে কেরাম ও মাতৃভাষা ঃ

বাংলাভাষী ওলামায়ে কেরাম মাতৃভাষার প্রতি কতটুকু গুরুত্বারোপ করেছেন এ প্রশ্নে তিনি বলেন ঃ

"কিন্তু বাংলার আলেম সমাজ নিজ মাতৃভাষায় আল কোরআনের ভাবধারায় সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রামাণ্য ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি।" (ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৪)

অবজ্ঞার পরিণাম ফল ঃ

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ওলামায়ে কেরামের অবজ্ঞা ও অবহেলার পরিণামে কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ

"(১) মাতৃভাষার প্রতি তাদের এই অবজ্ঞার ফলে ইসলামের শ্বাশ্বত আবেদন দেশের সুধী সমাজের অন্তরে এখনও ভাল করে অনুপ্রবেশ করতে পারে নি।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৪)

(২) উপমহাদেশের উর্দু ভাষাভাষী উত্তর প্রদেশ হতে উৎসারিত এ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাভাবিক কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার স্থান না থাকায় উর্দূতে ওলামায়ে দেওবন্দ এর বিপুল অবদান থাকা স্বত্তেও বাংলা ভাষায় তার (বাংলাভাষী ওলামায়ে কেরাম) তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করতে পারেন নি। ফলে উর্দু ভাষা-ভাষী অঞ্চলের তুলনায় বাংলা ভাষা-ভাষী শিক্ষিত সমাজের ইসলামী মানস সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক পিছনে থেকে যায় এবং অমুসলিম কৃষ্টি বিকাশ লাভ করে।" (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা -৯)

ভবিষ্যত কর্মসূচী ঃ

এমতাবস্থায় বাংলাভাষী ওলামায়ে কেরামের ভবিষ্যত কর্মসূচীটা কি হওয়া উচিত, সে প্রসঙ্গে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ

"মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র জাতির মানসিকতাকে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার মহান উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাবধারায় উৎসারিত বাংলা সাহিত্যের শিক্ষা করে নবতর সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে হবে। (মাঃ শিঃ ক্রমবিকাশের ধারা ঃ ১৭)

তিনি মক্তব পর্যায় থেকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাবও করেন। এ পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ

"ফাজেল ও ফাজেলোত্তর পর্যায়ে আরবীকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মক্তব ও দাখেল পর্যায়ে বাংলা ও উর্দূকে ব্যবহার করা চলবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে-২৮)

উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ঃ

খতীবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) মাদ্রাসা শিক্ষা উর্দুকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতি। তবে, ইংরেজী ও ফারসীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা তাঁর মতে ঠিক নয়। বরং অপশন্যাল বিষয় হিসেবে ইংরেজী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দান করেন। ফার্সী ভাষা

সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "ফারসীকে দাখেল ও ফাজেল পর্যায়ে অপশন্যাল বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -১৫)

অন্যত্র তিনি দাখেল ও ফাজেল পর্যায়ের ঐচ্ছিক ও অতিরিক্ত বিষয়াবলীর তালিকায় ফারসী ও ইংরেজীকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে বিজ্ঞান, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অনেকেই পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। এ সব বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা না হলে মাদ্রাসা শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায় বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন। কিন্তু খতীবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহঃ) এ ধরনের প্রস্তাবকে গাজাখুরী প্রস্তাব বলে অভিহিত করেন। তবে, মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কথিত বেকারত্ব ঘুচানোর জন্য ছাত্রদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করে তোলা এবং আলাদা 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাই তিনি বলেন ঃ "মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করে তোলার প্রস্তাব নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা ছাত্রদের বেকারত্ব ঘুচিবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে-১৮)

তিনি আলাদা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করে বড় বড় মাদ্রাসার সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিতে গিয়ে বলেন ঃ "এসব ইনষ্টিটিউট বড় বড় মাদ্রাসার সাথে এটাচড (সংযুক্ত) থাকবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে-১৩)

বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়াবলী ঃ

প্রস্তাবিত আলাদা বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে কি কি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে (ক) কেতাবত (খ) হ্যান্ড কম্পোজ (গ) বস্ত্র বয়ন ও (ঘ) বৈজ্ঞানিক কৃষি ইত্যাদি বিষয় বৃত্তি শিক্ষার উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে। (প্রশ্নমালার উত্তরে-১৪)

পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বেকারত্ব ঘুচানোর লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষার জন্য বৃহত্তর পর্যায়ে 'পলিটেকনিক' ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"ইহা ছাড়া বৃহত্তর পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার জন্য "পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। (প্রশ্নমালার উত্তরে-১৪)

মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চতর গবেষণা ঃ

খতিবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহঃ) মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগের সার্বিক সমস্যার সমাধানের উপযোগী করে তোলার জন্য গবেষণা ভিত্তিক উন্নত শিক্ষা বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। আর এজন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) এর 'ভারসাম্য পন্থায়' অগ্রসর হবার কথা বলেন। তাই এ বিষয়ে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করেন।

প্রাথমিক কাজ ঃ গবেষণার ভিত্তি ঃ

"মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে মৌলিক চিন্তা শক্তির বিকাশ এবং গবেষণা কার্যে আগ্রহ সৃষ্টির ভিত্তি স্বরূপ ঃ (ক) আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও মজাদ্দেদীনের চিন্তাধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। (খ) তদুপরি, বিগত শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী আইনের যে বিকাশ ও বিবর্তন হয়েছে। তার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -৩৬)

বক্তৃতা, সেমিনার ও অন্যান্য ঃ

উন্নতমানের গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

(ক) "ছাত্রদের দরসী কিতাব পড়ার মাঝে মাঝে নব্য বাতিল শক্তির পরিচয় ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষ সেমিনার ও বক্তৃতার আয়োজন করে তাদের সার্বিকভাবে গড়ে তুলতে হবে।" (আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ৬)

(খ) .... এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত তার (শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী) মূল গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও অনুশীলন ছাত্রদের মননশক্তির বিকাশ ও মিল্লাতের প্রভূত উপকার সাধনে সক্ষম।" (ক্রমবিকাশের ধারা -১২)

উচ্চতর গবেষণার প্রবর্তন ঃ

মাদ্রাসা-শিক্ষাকে গবেষণা ভিত্তিক ও উন্নতমানের করে গড়ে তোলার জন্য খতীবে আজম (রাঃ) এর প্রস্তাব হলো, মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তকারী মেধাবী ছাত্রদেরকে উচ্চতর গবেষণা কার্যে নিয়োজিত করা। এ জন্য কোন ধরনের বিষয়বস্তু নির্ধারন করতে হবে, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

(ক) "গবেষণা বলতে এমন কোন জটিল বিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত, যার সমাধান ইসলামে নেই বলে প্রচার করে ইসলাম এ যুগের জটিল সামাজিক জীবনে অচল বলে অপ-প্রচার করা হয়।"

(খ) "অথবা আধুনিক যুগের বিভিন্ন মতবাদ ও ফিরকায়ে বাতেলের তরদীদমূলক বিষয়ে গবেষণার কাজ দেওয়া উচিত।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -৩৫)

বাতিল শক্তির মোকাবেলা ঃ

খতীবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহঃ) বলেন, বর্তমান যুগে নুতন নুতন চ্যালেঞ্জ ও নব্য বাতিল শক্তিগুলোর মূল উৎপাটন ও মোকাবেলার দায়িত্ব মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বর্তায়। তাই মাদ্রাসা শিক্ষায় বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার কর্মসূচী থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তাহলো এই যে,-

বাতিল শক্তির মোকাবেলার দায়িত্ব ঃ

"ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম চিন্তাবিদগণ নব্য চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবেলা করিলেও দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থায় তার কোন প্রতিফলন না হওয়ায় সমাজের এক শ্রেণীর লোক এখনও বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ রয়েছে। যুগের চিন্তাশীল আলেমদের এসব অবদানকে সার্বজনীন রূপ দান করে বাতিল চিন্তাধারার মূলোৎপাটনের দায়িত্ব ও কর্তব্য মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর অতি স্বাভাবিক ভাবে অর্পিত।" (ক্রমবিকাশের ধারা -১১)

ভবিষ্যত করণীয় ঃ

এমতাবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে বাতিল শক্তির মোকাবেলা করতে হলে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে, এ প্রসঙ্গে খতীবে আজম (রহঃ) বলেন ঃ

"এ কাজে ইমাম গাজ্জালীর অনুশীলন ও প্রয়োগনীতি অনুসরণ করতে হবে।"

"চিন্তার রাজ্যে বাতিলপন্থীদের এমনি এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এলমে কালামের এমন এক ভিত্তি রচনা করেন, যাতে তদানীন্তন নাস্তিক, খারেজী, রাফেজী, বাতেনীয়া ও মুতাজিলাপন্থীদের বিভ্রান্তি হইতে সমগ্র মুসলিম জাতির মোহমুক্তি ঘটে।" (ক্রমবিকাশের ধারা -১১)

তদানীন্তন বাতিল ফিৎনাসমূহ এবং বর্তমান কালের বাতিল ফিৎনাসমূহের স্বরূপ ও সাদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "চিন্তার ক্ষেত্রে সে দিনের ও এদিনের রোগের পার্থক্য ঃ সেটা যক্ষ্মা হলে আজকের বিভ্রান্তির ক্যান্সার।"

সুতরাং, রোগের ভিন্নতার জন্য ঔষধ ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু, ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বর্তমান বাতিল শক্তির মোকাবেলায় তাঁর অনুসরণপূর্বক নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

(ক) বাতিল শক্তির তথ্যানুসন্ধান ঃ

"নব্য বাতিলপন্থীদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে যুগোপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে তার মোকাবেলা করার দায়িত্ব অতি স্বাভাবিক ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বর্তায়।" (ক্রমবিকাশের ধারা -১২)

(খ) ইলমে কালামের সংস্কার ঃ

"ইলমে কালামের শিক্ষাকে নব্য বাতিলপন্থীদের খন্ডন উপযোগী করে প্রদান করতে হবে। এবং এ কাজে ইমাম গাজ্জালীর অনুশীলন ও প্রয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন বাতিল পন্থীদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও উহার অসারতা প্রমাণমূলক শিক্ষা সন্নিবেশিত করতে হবে।" (ক্রমবিকাশের ধারা -১৬)

(গ) উচ্চতর গবেষণায় বাতিল মতবাদের তরদীদ মূলক বিষয়বস্তু ঃ

"আধুনিক যুগের বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও ফিরকায়ে বাতেলার তরদীদমূলক বিষয়ে গবেষণার কাজ দেওয়া উচিত।" (প্রশ্নমালার উত্তরে -৩৫)

কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ ঃ

বর্তমানে মাদ্রাসার শিক্ষাজীবন শেষ করে অনেকেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের অনেককেই এর পক্ষে মত প্রকাশ করতে দেখা যায়। হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহঃ) শুধু এর পক্ষে মত প্রকাশ করতেন, তা নয়; বরং এর প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। কারণ, "যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্মধারায়ও রূপান্তর ঘটেছে। লক্ষ্য এক হলেও প্রয়োগ কৌশল ভিন্নতর। মেশিনগানের মোকাবেলা মেশিনগান দিয়ে করতে হয়। তীর ধনুক দিয়ে নয়। তাই তাঁর মতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও সংস্কার করতে হলে সু-পরিকল্পিত ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে (শর্ত সাপেক্ষে) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি বলেন ঃ

"মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করে আধুনিক শিক্ষার জন্য উৎসাহী ছাত্রদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে, তাদের নিয়ন্ত্রণের ভার ইসলামী সমাজের আলেমদের হাতে থাকবে। যাতে তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়ে না দেয়।" (আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ১৭)

মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"শিক্ষার সর্বস্তরে আলেম না থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থার নূতন বিন্যাস কোন দিনই সম্ভব নয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে করে ছাত্ররা ইসলামের প্রগতিশীল জীবনাদর্শ থেকে দূরে সরে দাঁড়ায় এবং আপনা আপনি ভাবে কাল মার্কস ও লেলিনের ভ্রান্ত দর্শনে আকৃষ্ট হয়। ..... মুসলিম যুব সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত এই অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে চুরমার করে ভেঙ্গে ইসলামী ভাবধারায় বিন্যস্ত করার জন্য মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্রদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো ইসলামী আন্দোলনের একটি অপরিহার্য কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কোন সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী যেন এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অর্গল হয়ে না দাঁড়ায়।" (আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ১৮)

শেষ কথা ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে খতীবে আজম (রহঃ) এর যেসব চিন্তাধারা ছিল, তা মোটামুটিভাবে উপরে উল্লেখ করা হলো। এ সম্পর্কে তাঁর মমামত ও পরামর্শ আরো থাকতে পারে। তবে উল্লেখিতগুলো তাঁর 'মৌলিক চিন্তাধারা' হিসেবে অভিহিত করা যায়। অন্ততঃ এসবের আলোকেই মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সাধিত হলে অনেক উপকার ও সুফল অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য যে, খতীবে আজম (রহঃ) এর উল্লেখিত মতামত প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশই স্বাধীনতা পূর্বকালের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে সামনে রেখেই ব্যক্ত করা হয়েছিল। আর বাকীগুলোও ব্যক্ত করা হয়েছিল আজ থেকে অন্তত এক দেড় যুগ আগে। বর্তমানে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও কর্ণফুলীর অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নূতনভাবে দেখা দিলেও উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার ও পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি রয়ে গেছে। সুতরাং, খতীবে আজম (রহঃ) এর উক্ত মৌলিক চিন্তাধারার আলোকে প্রয়োজন বোধে আরো নতুন কর্মসূচী গ্রহণপূর্বক মাদ্রাসা শিক্ষার যথার্থ সংস্কারে এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে মনে করি।

পরিশেষে, খতীবে আজম (রহঃ) এর উক্ত সুপারিশমালা কার্যকর হলে ওলামায়ে কেরাম এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কি উপকার সাধিত হবে, এ প্রসঙ্গে তাঁরই একটি উদ্ধৃতি পেশ করার মাধ্যমেই এ দীর্ঘ আলোচনার ইতি টানছি। তিনি তাঁর লিখিত মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রম বিকাশের ধারা' নামক প্রবন্ধের উপসংহারে বলেন ঃ

"আমার উক্ত সুপারিশসমূহ কার্যকরী হলে মাদ্রাসায় আর প্রাধান্য বজায় রেখে ছাত্ররা এমন দ্বীনি শিক্ষা লাভ করবে যা শুধু স্বয়ং সম্পূর্ণই হবে না, বরং ইসলাম এক গতিশীল প্রচন্ড শক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে এবং আলেম সমাজের মন হবে সকল কুসংস্কার, হীনমন্যতা দূরীভূত হবে। .... আরও দেখতে পাইবেন যে, ইসলাম এক শ্বাশত জীবন বিধান, যার তুলনা বিরল।"

তথ্য সূত্র ঃ ১) লেখাটির অংশ বিশেষ আততাওহীদ - জুলাই- আগষ্ট '০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক। ২) খতীবে আযম আ ফ ম খালিদ হোসেন।

খতীবে আযমের চিন্তাধারায় মাদরাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা ঃ

বর্তমানে আমরা ইতিহাসের এমন এক ক্রান্তিকালে সমুপস্থিত, যখন মূল্যবোধের উপর আধুনিক বস্তুবাদী বিজ্ঞান সভ্যতার প্রভাবে নয়া নয়া চ্যালেঞ্জ সমুপস্থিত। ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম চিন্তাবিদরা নব্য চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবেলা করলেও দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থায় এর কোন প্রতিফলন না হওয়ায় সমাজের এক শ্রেণীর লোক এখনও বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ রয়েছে। যুগের চিন্তাশীল আলেমদের এসব অবদানকে সার্বজনীন রূপ দান করে বাতিল চিন্তাধারায় মূল উৎপাটনের দায়িত্ব ও কর্তব্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অতি স্বাভাবিকভাবে অর্পিত। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, চিন্তার রাজ্যে বাতিল পন্থিদের সৃষ্ট এমনি এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করে ইমাম গজ্জালী এলমে কালামের এমন এক শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করেন যাতে তদানিন্তন নাস্তিক, খারেজী, রাফেজী, বাতেনিয়া ও মুতাজেলা পন্থীদের বিভ্রান্তি হতে সমগ্র মুসলিম জাতির মোহমুক্তি ঘটে।

যুগের সব বাতিল পন্থীদের সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান করে অনেকক্ষেত্রে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘ ৩০ বৎসর সাধনার পর তিনি এমন এক প্রযুক্তি রীতি প্রবর্তন করলেন যাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতেও বহু সাধনার প্রয়োজন। চিন্তার ক্ষেত্রে সেদিনের ও এ দিনের রোগের পার্থক্য ঃ সেটা যক্ষ্মা হলে আজকের বিভ্রান্তির ক্যান্সার। রোগের ভিন্নতার জন্য ঔষধ ভিন্নতর হতে পারে তবে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির ভিত্তি এতই মজবুত যে, সেই রীতি ও

সূত্র অনসরণ করে নব্য বাতিল পন্থীদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে যুগোপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে উহার মোকাবেলা করার দায়িত্ব অতি স্বাভাবিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উপর বর্তায়।

মৌল ইসলামিয়াত অর্থাৎ তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের গবেষণা ভিত্তিক উন্নত শিক্ষার জন্য শাহ ওলি উল্ল্যাহ মুহাদ্দেসে দেহলভীর প্রদর্শিত ভারসাম্য পন্থায় অগ্রসর হলে কোরআন হাদীসের আলোকেই সর্বপ্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, জাগতিক ও মজহাবী সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন যেমন সহজতর তেমনি উহার শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে উহার সুফল সমগ্র জাতির বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত তাঁর মূল গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও অনুশীলন ছাত্রদের মননশক্তির বিকাশ ও মিল্লাতের প্রভুর উপকার সাধনে সক্ষম। আড়াইশত বৎসর পূর্বে শাহ সাহেবের অন্তরে যে নব উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছিল উহার সম্যক ও যথাযথ উপলব্ধি থাকলে উপমহাদেশের মুসলিম জাতির ভাগ্য ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করত।

গ্রীক দর্শন ভিত্তিক প্রাচীন মাকুলাত বিষয়াবলীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রযুক্তি ক্ষমতা বহু পূর্বেই হারিয়ে ফেললেও বিকল্প আবিষ্কারের অভাবে এর জের এখনও চলতেছে। দেওবন্দের প্রথম যুগে পরিচালকদের অন্যতম হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গুহীই প্রথম সত্য উপলব্ধি করে মানতেক-হেকমত ইত্যাদি শিক্ষায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ইসলামকে যদি আমরা একটি

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি করতে চাই তবে রাষ্ট্র বিজ্ঞান অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি অবশ্যই আমাদের পাঠ করতে হবে। কারণ, এসব বিষয়ের উপর দখল না হওয়া পর্যন্ত কোন জীবন-বিধানের পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরাও স্বকীয় দর্শনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সমাজিক সমস্যার যুগোপযোগী বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

আমাদের ফিকাহ্ শাস্ত্রে ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে বিধায় মুসলিম জাতির জন্য তা নতুন বিষয় নয়। বরং যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সহজতর উপলব্ধির জন্য জ্ঞানের শ্রেণীভাগ মাত্র। ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে তার দর্শনও ফলিত বিভাগের পর্যালোচনা করে উন্নততর সূত্র ও সমাধান উদ্ভাবন করে এইসব বিষয়ের অধিকতর বিকাশ মুসলিম মনীষীদের পক্ষে এখনও সম্ভব। যেমন এক যুগে মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা দুনিয়ার প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, মুসলিমজাতি খোদাপ্রদত্ত এমন এক জ্ঞানের অধিকারী যার আবেদন শ্বাসত ও চিরন্তর। গণিতশাস্ত্র, ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইতিহাস মুসলমানদের উন্নতির যুগে গুরুত্ব সহকারে পঠিত হত এবং উচ্চ পর্যায়ে দ্বীনি শিক্ষার পূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব বিষয়ের পাঠ মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য বিবেচিত হত। মুসলমানরা এসব বিষয়ের উপরেও প্রভুর উন্নতি সাধন করেন।

মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে জাতি মাতৃ ভাষার মাধ্যমে ইসলামের অধিকতর চর্চা করেছে তারা একদিকে সমগ্র জাতিকে ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে সে ভাষায় মৌলিক অবদান রেখে বিশ্বের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইরানীরা ফার্সী ভাষায় ইসলামী বিজ্ঞানের প্রসার করে ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারকে কয়েকশত বৎসর ধরে সমৃদ্ধ করতে থাকে। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার আমদানী হয় ফার্সী সাহিত্যের মাধ্যমে।

উপমহাদেশের উর্দু ভাষাভাষী আলেম সমাজ মুসলমানদের পতন যুগে উক্ত ভাষার মাধ্যমে ইসলামের যে সেবা করেছে উহা আজ মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিরাট সম্পদ। কিন্তু বাংলার আলেম সমাজ নিজ মাতৃভাষায় আল-কোরআনের ভাবধারায় সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রমাণ্য ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নে তেমন উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। তাঁরা এ কাজের গুরুত্ব সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করলে আজ বাংলা সাহিত্যের উপর বিজাতীয় ভাবধারার (উপনিষদীয়) যে অপবাদ আছে তাহা হয়ত থাকত না মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের এই অবজ্ঞার দরুণ ইসলামের শ্বাসত আবেদন দেশের সুখী সমাজের অন্তরে এখনও ভাল করে অনুপ্রবেশ করতে পারে নি। তবুও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ যুগে মীর মোশারফ হোসেন, মহাকবি কায়কোবাদ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আকরম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ইসলামী ভাবধারায় বাংলার সাহিত্য

ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। বিগত দশক ধরে আরবী, ফার্সী ও উর্দু হতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ অনূদিত হয়ে বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

কতিপয় সুপারিশ ঃ

(১) (ক) উচ্চ পর্যায়ের মাকুলাত, হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের শিক্ষাকে অধিকতর গবেষণা অনুসন্ধান ভিত্তিক ,করে গড়ে তোলা। এ সম্পর্কে যুগস্রষ্টা শাহ ওলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর উদ্ভাবিত দর্শন ও অনুশীলন পদ্ধতি আমাদের জন্য এখনও পথপ্রদর্শক। এ পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম আরবী হওয়া উচিত। এতে ছাত্ররা পূর্ববর্তী ইমামদের ভাবধারার সাথে সরাসরি পরিচিত হতে ও মৌল সহায়ক গ্রন্থসমূহের রস ও স্বাদ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

(খ) ইলমে কালামের শিক্ষাকে নব্য বাতিল পন্থীদের খণ্ডন উপযোগী করে প্রদান করতে হবে এবং এ কাজে ইমাম গাজ্জালীর অনুশীলন ও প্রয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন বাতিল পন্থীদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও উহার অসারতা খণ্ডনমূলক শিক্ষা সন্নিবেশিত করতে হবে। এ বিষয়ের সহায়ক বিষয় হিসেবে এলমে তাছাওফের বিকাশ আবশ্যক, যাতে শিক্ষার্থীরা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও মনোযোগী হতে পারে। তদুপরি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তরদিদ ও ইসলামের সহিত তুলনামূলক গ্রন্থ অধ্যয়ন ধর্মীয় প্রচারে নতুন প্রাণশক্তি লাভ করবে।

(গ) আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বর্তমান মানকে কোন প্রকারেই সন্তোষজনক বলা যায় না। এটাকে অধিকতর বাস্তবমুখী করে এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক সব ব্যাপারে তাদের ভাবকে সহজভাবে প্রকাশ করতে ও প্রবন্ধটি লিখতে পারে তদনুযায়ী উন্নীত করতে হবে।

(২) উচ্চ পর্যায়ের মাকুলাত ঃ (ক) ঃ দ্বীনি শিক্ষার সমাপ্তি পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণকে এমন বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা কোথাও ঠেকিয়ে এ উপলব্ধি না করে যে, ইসলাম বাস্তব জীবনে অচল। আধুনিক যুগে সিয়াসিয়াত ও একতেসাদিয়াত এমনি বিষয় যে এর দখল ছাড়া ইসলামই যে পরিপূর্ণ জীবনবিধান তাহা বিশেস্নষণ ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়সমূহকে ইসলামী জীবন দর্শন ব্যাখ্যার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তবে এ সব বিষয়ের উপর মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য উপযোগী করে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনী সংযোগ করতে হবে।

(খ) ইসলামের তমদ্দুনিক ইতিহাস ঃ এ বিষয়ে কাসাসুল আম্বিয়া, সিরাতুন্নবী, হেকায়তে সাহাবা, হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও ইমামগণের জীবন চরিত ও অনুশীলন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস ও শাসন পদ্ধতি অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য ঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র জাতির মানসিকতাকে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার মহান উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাবধারায় উৎসারিত বাংলা সাহিত্যের শিক্ষা করে নবতর সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক পর্যায় ঃ এ পর্যায়ে আরবী সাহিত্য, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, হাদীস, তাফসীর, এলমে কালাম ও ইসলামের তমদ্দুনিক ইতিহাসের শিক্ষাকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এ পর্যায়ের শিক্ষায় আরবীর প্রাধান্য ভিত্তিক ও বৈষয়িক শিক্ষা এ রকম কমই রাখতে হবে। যাতে দ্বীনি শিক্ষার একটা দৃঢ় ভিত্তি এ পর্যায়ে তৈয়ার হয়।

(৪) মক্তব শিক্ষা ঃ শিশু সন্তানদের ধর্মীয় রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত, বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ ও ইসলামী পরিবেশ ও গণিতের নিম্নতম পর্যায়ের শিক্ষা দানের জন্য দেশের সর্বত্র মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে গড়ে তুলতে হবে।

আমার উপরোক্ত সুপারিশ সমূহ কার্যাকরী হলে মাদ্রাসায় আরবী প্রাধান্য বজায় রেখে ছাত্ররা এমন দ্বীনি শিক্ষা লাভ করবে যাহা শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই হবে না বরং ইসলাম এক গতিশীল প্রচার শক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে এবং আলেম সমাজের মন হতে সকল প্রকার হীনমন্যতা দুর হবে। তাঁর দ্বীন ও দুনিয়াকে একই সঙ্গে দেখতে পাবেন, আরও দেখতে পাবেন ইসলাম এমন এক শ্বাসত জীবন-বিধান যার তুলনা বিরল।

ইলমে নববীর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের অবস্থান ও জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ননায় খতীবে আযমের চিন্তা ধারা

ছাত্র জীবনের দু'স্তর ঃ যারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছাত্র তাদের জীবন দু'স্তরে বিভক্ত ঃ

১। জ্ঞানান্বেষন ও দ্বীনি বিষয় সমূহ পান্ডিত্য অর্জনের স্তর। ২। দাওয়াত ও তাবলীগ তথা প্রচার-প্রসারের স্তর। আলেম- ওলামা ও ইসলামী জ্ঞানান্বেষী ছাত্রদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত ব্যতীত অন্য কোন আয়াত নাযিল না হলেও যথেষ্ট হ'তো।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

অনুবাদ ঃ "তাদের একটি অংশ কেন বের হলোনা, যাতে দ্বীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক করে দেবে তাদের স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে" (সূরা তাওবা)

আয়াতের উল্লেখিত 'নফর' শব্দের অর্থ হলো, কাংখিত বস্তু অর্জনের নিমিত্তে একাগ্রচিত্তে ব্রতী হওয়া এবং যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, লোভ-লালসা ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্যে চুড়ান্ত সাধনা করা। তাই সাধারণতঃ একজন ছাত্র যেমন বাহ্যিকভাবে দেশ ত্যাগ ও আত্মীয়-স্বজনের বিরহ যাতনা সইতে বাধ্য হয়। আর এটা হচ্ছে

বাহ্যিক, "নফর"। তেমনি দুনিয়ার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে, জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে ও মনোবৃত্তি অবদমন করে ইলম নামের এ মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হওয়াও অত্যাবশ্যকীয়। এটাই হচ্ছে প্রকৃত "নফর"। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী (রঃ) চমৎকার উপমা দিয়ে অতি সুক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করেন।

তিনি বলেন ঃ "মানুষ চারটি শ্রেণীভুক্ত ঃ

১। যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে রিক্তহস্ত এবং তাদের অন্তর-আত্মা পার্থিব লোভ লালসার কালিমা মুক্ত। তারা হলেন, মানবজাতির সুমহান ব্যাক্তিত্ব নবীকুলের অধিকাংশ সদস্য।

২। যারা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী কিন্তু তাদের অন্স্থরে এর লেশমাত্র প্রভাব নেই। যেমন প্রখ্যাত নবী হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত উসমান গণী (রাঃ), ওমর বিন আব্দুল আযিয (রঃ) ও ইব্রাহিম বিন আদহাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। যাদেরকে আলস্নাহ পাক অঢেল ধন সম্পদ দান করেও তাদের অন্স্থর আত্মাকে নিজের জন্যে রিজার্ভ করে রেখে দেন।

৩ যাদের হাতে রয়েছে পর্বত সম অর্থ-বিত্ত। তাদের আত্মা দুনিয়ার-প্রেমে মত্ত, লোভ-লালসায় দিশেহারা এবং "আরো কিছু আছে না কি" রোগে আক্রান্স্থ। এরাই তো খাঁটি দুনিয়ার, অতি লোভী সম্প্রদায়।

৪। যাদের সম্পদাসক্তি মাত্রাতিরিক্তি। কিন্তু তারা সর্বদাই শূণ্যস্স্থ। তারা হচ্ছে দৈন্য দশা গ্রস্স্থ সেই ভিক্ষুকের দল যাদের ভাগ্যে ধন-সম্পদ জুটেনি। কিন্তু তারা ধন-সম্পদের খোঁজে অহর্নিশি, দিকবিদিক ঘুরতে থাকে। অভাব অনটনের জ্বালায় সদা কাঁদতে থাকে। এবং হা-হুতাস করতে থাকে দূর্ভাগ্য ও লাঞ্চনা, বঞ্চনার তোড়ে। এরা হচ্ছে অভাবী ফেরাউন দল।

এদের অবস্থা ধনাঢ্য দুনিয়া প্রেমিকদের চেয়েও অধিকতর খারাপ। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ধনশালীরা মানুষের উপকার করে থাকে। সৃষ্টিজগতও তাদের সম্পদ দ্বারা লাভবান হয়। কিন্তু এই "নাই কিছু" এর দলভুক্ত হতাশাগ্রস্ত ফকিরদের কাছ থেকে কেউ উপকৃত হবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না।

অনুরূপ আমরা অনেক ছাত্রকে দেখতে পাই যে, পার্থিব চাকচিক্য উপভোগ করতে থাকে এবং দুনিয়া প্রেমে তাদের অন্স্থর ভরপুর। পক্ষান্তরে অনেক ছাত্র আছে যারা অর্থ-বিত্তও বিনোদন দ্রব্য থেকে রিক্ত বঞ্চিত হস্স্থ। এবং তাদের অন্তরও পদ ও সম্পদের লোভ-লালসা থেকে মুক্ত-পবিচ্ছন্ন। এরা হচ্ছে সেই গরীব ছাত্ররা যাদেরকে মন ও মানের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হিসেবে গন্য করা হয়। এভাবে সাধারণ মানুষের ন্যায় ছাত্রদেরকেও চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ইলম (জ্ঞান-বিজ্ঞান) দু'প্রকার

১। শরীয়তের বিধান সম্পর্কীয় জ্ঞান, ২। সৃষ্টিজগত সর্ম্পকীয় জ্ঞান। আলস্নাহ্ রাব্বুল আলামীন শরীয়ত সম্পর্কীয় জ্ঞনের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণকে বৈশিষ্ট মণ্ডি করেছেন। পক্ষন্তরে সৃষ্টি জগত সম্পকীয় জ্ঞান-তুলনামূলক ভাবে নবীদের চেয়ে সাধারণ মানুষরাই বেশী লাভ করে থাকে।

কেননা শরীয়তের জ্ঞান হচ্ছে অতি উন্নত মানের। আলস্নাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই মানুষ ইলমে শরীয়তের মুখাপেক্ষী হয়। কেননা তা ব্যাতিরেকে স্বীয় প্রভূর সাথে বান্দার সম্পর্ক সূদৃঢ় হতে পারেনা। আল্লাহপাক সৃষ্টি সর্ম্পকীয় জ্ঞানের অধিকারী কিছু সংখ্যাক জ্ঞানী নির্ধারন করে রেখেছেন। তাই প্রকৃত ইলম হচ্ছে শরীয়তের ইলম আর সৃষ্টি সম্পর্কীয় ইলম হচ্ছে ইলমে শরীয়তের রক্ষাক ও প্রহরী স্বরূপ। যেমন কৃষক ক্ষোত করে ফসল উৎপাদনের জন্যে। তার যাবতীয় কাজকর্ম মূলতঃ ক্ষোতের উন্নয়ন ও অধিক ফলনের লক্ষ্যোই চলতে থাকে। তবে ক্ষোতের চতুস্পার্শ্বে ঘিরা-বেড়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হলেও কিন্তু তা ক্ষেতের মূল লক্ষ্য নয়।

ফসলের সংরক্ষনের লক্ষ্যেই ঘিরা-বেড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। অনুরূপ দেখা যায় শরীয়ত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব জ্ঞান তথা সৃষ্টি সম্পর্কীয় জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয় শরীয়তের জন্যেই। অন্য কোন কারণে নয়, যেমন আমরা দেখতে পাই হযরত মূসা (আঃ) একজন শ্রেষ্ঠ রাসূল ও যুগ-শ্রেষ্ঠ আলেম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক খিজির (আঃ) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের আদেশ দেন। হযরত খিজির (আঃ) সম্পর্কীয় যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী একজন আলস্নাহর ওলী কোন নবী ছিলেন না। অথচ হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন একজন শীর্ষ স্থানীয়। নবী ওলী-বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের কাশফ-ইলহাম দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শীর্ষ স্থানীয় নবী-রাসূলগনের তালিকায় হযরত মূসা (আঃ) এর নাম আসে তৃতীয় নাম্বারে। আর এক নাম্বারে হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং দ্বিতীয় নম্বরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। নবী রাসূল ফিরিস্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলস্নাহ্ পাক তার মহান রাসূল মূসার (আঃ) অন্তর আত্মা শরীয়তের জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

তৎকালে এ বিষয়ে (ইলমে শরীয়তে) তার সমকক্ষে কেউ ছিলো না। আর হযরত খিজিরের ছিলো সৃষ্টি সম্পর্কীয় অসাধারণ জ্ঞান। কিন্তু হযরত মূসার জ্ঞানের তুলনায় হযরত খিজিরের জ্ঞান ছিলো অতি নিন্মোমানের। এতদসত্বেও সর্বাজ্ঞ ও মহা প্রাজ্ঞ আল্লাহ, নবী মূসা (আঃ) কে সৃষ্টি সম্পর্কীয় জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে হযরত খিজিরের দারস্থ হতে এবং সদা তার সংস্পর্শ থেকে শিষ্যত্ব গ্রহনের কড়া নির্দেশ দিলেন।

এবার দেখা যাক হযরত মূসা (আঃ) প্রভুর আদেশ কি ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেলেন। কিভাবে খিজির কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী বিনাবাক্যে শ্রদ্ধাভরে মেনে নিলেন। এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর নিমিত্তে কিভাবে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন। কুরআনে কারীমে হযরত মূসার (আঃ) সেই ঐতিহাসিক সফর বা জ্ঞানন্বেষনের অভিযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আলস্নাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

অর্থাৎ "মুসা যখন বললেন ঃ আমি ক্ষান্ত হবো না যতক্ষণ না আমি দু'সাগরের সম্মিলন স্থলে পৌঁছি অথবা বছরকে বছর চলতে থাকব।" (সূরা কাহ্‌ফ)

আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, হযরত মূসা তার ইলমী সফরের সংগীর কাছে মনের সুদৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললেনঃ দু'সাগরের সম্মিলন স্থলে খিজিরের সাক্ষাৎ লাভ না হওয়া পর্যন্ত্ম বিরামহীন ভাবে চলতে থাকবো, অথবা জীবন সংবরন করবো। যদিও এ সফর বছরকে বছর সময় নেয় তাতে কিছু আসে যায়না।"

কেননা জ্ঞানার্জনের পথে সারাটা জীবন চলতে এবং জানমাল কুরবানী করতে আমি প্রস্তুত। মোক্ষম উদ্দেশ্য হাসিলের আগে আমি আরামকে হারাম করেছি। এমন বিরল মনোবল ও অসম সাহস সৃষ্টি সম্পর্কীয় জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন নবী মূসা। এবং অবশেষে কামিয়াবও হয়ে ছিলেন। হযরত মূসার ঘটনা থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহন করা বাঞ্ছনীয়। যে সব শিক্ষার্থীর এ ধরনের নির্মল আগ্রহ, অপ্রতিরোধ্য মনোবাসনা ও উর্চুমানের সাহস নেই তাদের পক্ষে নবুওয়তের-জ্ঞান-ভান্ডার হতে যথার্থ জ্ঞানাহরণ সম্ভবপর নয়। পারস্যের আধ্যাত্মিক কবি হাফিজ সিরাজী তার এক ফার্সী কবিতায় এ দৃঢ়তার অনুপম রূপ দিয়ে বলেনঃ যার মর্মার্থ এই, আমার সাধনা কখনো পরিত্যাগ করবেনা যতক্ষণ না আমার লক্ষ্য অর্জিত হয়। এবং স্ব-শরীরে প্রেমাস্পদের দ্বারে পৌছে যাই অথবা আমার প্রাণ ধড় থেকে বেরিয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কি পরিমান ইলম শিক্ষা কর্তব্য ঃ

এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কি পরিমান ইলম শিখলে একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যকীয় ইলম শিখেছে বলা যাবে। আলস্নাহ পাক স্বয়ং এ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ দ্বীনের গভীরতম জ্ঞানার্জন পর্যন্ত্ম শিক্ষা লাভ করতে হবে। সুতরাং যে ছাত্র জ্ঞান অন্বেষনের লক্ষ্যে আত্মীয় পরিজন ও ঘরবাড়ী ত্যাগের মতো সুকঠিন পদক্ষেপ নিয়েছে তার জন্য আবশ্যিক করনীয় হচ্ছে "তাফাক্কুহ ফিদ্দীন" দ্বীনের গভীরত জ্ঞান-অর্জন-পর্যন্ত্ম সাধনা করে যাওয়া। যদিও এতে পুরো জীবনও শেষ হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে জ্ঞান-অন্বেষনের একান্ত্ম লক্ষ্য! চুড়ান্ত পর্যায়। আর দুনিয়ার যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে ও দুনিয়ার মায়া-মমতা ত্যাগ করে ঘর থেকে বের হবার মূহুর্ত থেকেই এর সূচনা ঘটে।

বস্তুতঃ "তাফাক্কুহ ফিদ্দীন" হচ্ছে "জাওহারে ফরদ (অবিভাজ্য বস্তু) স্বরূপ যা তা'লীম-তাআলস্মুম বা শিক্ষা শিখানোর মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সুতরাং দ্বীনি বিদ্যান্বেষনের একাম্ত লক্ষ্য হচ্ছে "তাফাক্কুহ ফিদ্দীন নামের সেই অনুপম ও অবিভাজ্য বস্তুটি অর্জন। তা'লীম তাআলস্মাম, সহ অন্যান্য সহায়ক বস্তু সমূহ হচ্ছে উপকরণ মাত্র, উদ্দেশ্য নয়।

অনুরূপ মানব কুলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া চাই সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাবুল আলামীনের মারেফত বা সঠিক পরিচয় লাভ করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন।

তরজমা ঃ "মানুষ কি চিন্তা করে দেখেনা উট কিভাবে সৃষ্টি করা হলো, আসমান কিভাবে উপরে উঠানো হলো, পর্বত রাজি কিভাবে খাড়া করা হলো, এবং জমিন কিভাবে সমতল করা হলো"?

আয়াতটির মমার্থ হলো, কেন মানবকুল এসব বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে মহান সৃষ্টি কর্তা আল্লাহর পরিচয় লাভের লক্ষ্যে চিন্তা করেনা ? গভেষণা করেনা? এবং সৃষ্টিই তো আল্লাহর মারেফতের যথার্থ উপকরণ অনুরূপ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ ধরণের বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার তাগিদ এসেছে।

যাতে এসবের উৎস আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু যারা বস্তুর সীমানা পেরিয়ে, আল্লাহর মারেফাত অর্জনের লক্ষ্যে সামনে এগুতে পারেনা তারা মঞ্জিলে মাকসুদে পৌছতে পারেনা। বঞ্চিত হয় লক্ষ্য অর্জন থেকে। বিভিন্ন বই পুস্তকে লিপিবদ্ধ ইলম সমূহ হচ্ছে উপকরণ মাত্র। এসব ইলমের পর্যালোচনা ও অধ্যাবসায় করতে করতে হৃদয়ে একটি বিশেষ অবস্থান সৃষ্টি হয় যাকে বিদ্বান সম্প্রদায় "মলকা" বা যোগ্যতা বলে অভিহিত করে থাকেন। মলকা হচ্ছে মানুষের মানস পটে একটি অন্তর্নিহিত শক্তি যদ্বারা অন্তরের সুপ্ত ভাব প্রকাশ পায় অতি সহজে ও সুচারন্ন রূপে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উপকরণাদি সঠিক ও সুচিন্তিত পন্থায় কাজে লাগিয়ে যোগ্যতা অর্জিত হবার পরও মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়না। এর পারিভাষিক নাম হচ্ছে "খতা" বা ভুল। এ ভুলের কারণে মূজতাহিদ ও ফকীহ (তথা লক্ষ্যর্জনের সাধানরত যোগ্যতা সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি) লক্ষ্যর্জনে ব্যর্থ হলেও তার সাধনা ও কৃত কর্মের অবশ্যই বিনিময় পাবেন আলস্নাহর দরবারে। যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ 'মলকা' নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেনা এবং তার উপকরণাদি বিন্যাসে পুরো জীবন ও শেষ করে দেয় ফকীহ বা যোগ্যতা সম্পন্ন প্রজ্ঞানী হতে পারবেনা।

প্রিয় ছাত্ররা, লক্ষ্য করে দেখ, মানতিক ও ফিকহ শাস্ত্র সহ যাবতীয় শাস্ত্রের মূল বিষয়াদি বারবার পর্যালোচনা করতে থাকো। তাহলে তোমাদের অন্তরে এমন এক মজবুত অবস্থার সৃষ্টি হবে যার বিপরীত কোন কথা বলতে বা কাজ করতে পারবেনা। এ অবস্থাটিই হচ্ছে 'মলকা'। যখনই শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় তখন তারা জ্ঞানান্বেষনের

একটি স্তর অতিক্রম করে ফেলে আর সেটা "মলকা" (যোগ্যতা) অর্জনের স্তর। কিন্তু হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবাদি পাঠের পরও যার অন্তরে এই যোগ্যতা প্রোথিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্র অর্জিত হয়নি তার।

যোগ্যতা অর্জনের পর প্রচার প্রকাশের পালা ঃ এতক্ষণ যোগ্যতা অর্জন প্রসংগে আলোচনা চলেছে, এবার দাওয়াত ও তাবলীগ প্রসংগ। যখনই কোন শিক্ষার্থী হাদীস - ফিকহ তথা ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের মৌলিক বিষয়াবলীতে "মালাকা" বা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে- কিন্তু সে শিক্ষাজীবনের প্রথম স্তর তথা জ্ঞানাহরণ ও যোগ্যতা অর্জনের স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্তর তথা দাওয়াত ও তাবলীগে পদার্পন করতে পারবে। যাই হোক আল্লাহ পাক যার অন্স্থরে ইলমে নববীর একটি অংশ ঢেলে দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের তাওফিক দান করেন, সেই সঠিক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে ময়দানে নামভে পারে। এটাই হচ্ছে শিক্ষা জীবনের দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরের বর্ণনা কুরআন করীম এভাবেই দিয়েছে।

তরজমাঃ যাতে তারা স্বজাতীকে সতর্ক করে দেবে যখন তারা প্রত্যাবর্তন করবে তাদের কাছে। যাতে তারা বাঁচতে পারে এ আয়াতে যে,

শব্দ এসেছে তা কুরানের সাহিত্যকলা ও বচন শৈলীর অনুপন নিদর্শন। এ শব্দের কোন সমার্থক শব্দ নেই। অন্য কোন শব্দ দিয়ে কোন ভাষাতেই এর সরাসরি অনুবাদ সম্ভব নয়। অনেকে এর তরজমা। (ভীতি প্রদর্শন) দিয়ে করে থাকেন। আমি মনে করি এ তরজমা সাগরের তরজমা বদনা দিয়ে করার সমতূল্য। পানি ধারন করেছে বলে যেমন সাগরকে বদনা বলা য়ায় না। তেমনি ভয় প্রদর্শনের অর্থ ধারণ করেছে বলেই "ইনযার কে সরাসরি ভয় প্রদর্শন বলা যেতে পারে না। সুতরাং "ইনযার" এর মর্মার্থ অনুধাবন করা অত্যাবশ্যকীয়। যাতে ভীতিপ্রদর্শন ও তার মধ্যকার পার্থক্য ফুটে উঠে, এর অতি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে, একজন ডাকাত কোন ধানাঢ্য ব্যক্তিকে ধরে বললোঃ "তোমার সিন্দুকের চাবি দিয়ে দাও, নইলে স্বয়ং ক্রিয় বন্দুকের গুলি ছুড়ে এক্ষুনি তোমার প্রাণ বধ করবো।" এটি এক ধরনের ভীতি প্রদর্শন। পক্ষান্তরে সন্স্থানের নৈতিক পদস্খলন ঘটলে তার পিতা তাকে দুঃখ ও ক্ষোভ ঝেড়ে বলে ঃ "তুমি যদি স্কুলে অনুপস্থিত থাকো তাহলে তোমাকে জবাই করে ফেলবো। এটিও এক ধরনের ভীতি প্রদর্শন।

তবে উভয়ের কারণ ও ধরনের মধ্যে আকাশ –পাতাল তফাৎ রয়েছে। কেননা পিতা সন্স্থানের সুখ-শান্স্থির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারে। এবং পৈতৃক আবেগ নিয়েই সন্তানকে সদা কল্যাণের পথ দেখায় ও অকল্যাণ কিছু দেখলে শাসায়। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, যদি তাদের মৃত্যু ও সন্স্থানদের জীবন এ দুয়ের কোনো একটা গ্রহণে এখতিয়ার দেয়া হয় তাহলে ৮০% মা নিঃসন্দেহে সম্স্থানের জীবন রক্ষার্থে নিজের মৃত্যুকে খুশী মনে বরণ করে নেবে। বাপের স্নেহ-মমতা সাধারণতঃ মায়ের সম পর্যায়ের হয় না। তারপরও ৫০% বাম সন্তানের সুখ–স্বাচ্ছন্দের জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে। মোদ্দা কথা

হলো মা-বাবা সম্স্থানের স্বার্থে নিজেদের জীবন, কুরবান করতে পারে। পক্ষান্তরে ডাকাত নিজের স্বার্থে অন্যের জীবন নাশে কুণ্ঠাবোধ করে না। তার অন্তরে মালামাল ও মালিকের কোন মূল্য নেই। তার উপকারের চিন্তা করাতো দূরের কথা। নিঃসন্দেহে সন্তানের প্রতি ভীতি-প্রদর্শনের লক্ষ্য সম্স্থানের উপকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই তো বাপ যে (নিজের) সন্তানের সুখ-শান্তির পথে নিজের সুখ-শান্তি বিলিয়ে দেয়।

সম্স্থানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে এবং তাকে স্কুল-মাদ্রাসায় আনা-নেয়া করার জন্য মূল্যবান শ্রম, সময় ও সম্পদ ব্যয় করাকে অযথা কাজ, সময় অপচয় ও আর্থিক লোকসান মনে করেনা। বরং এতে তার সুখানুভূতি ও মানসিক তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই বাপের ভীতি-প্রদর্শন ও ডাকুর ভীতি-প্রদর্শন সমান হতে পারেনা। বাপের ভীতি প্রদর্শনে কল্যাণের আহবান থাকে। পক্ষান্স্থরে ডাকুর ভীতি-প্রদর্শনে থাকে অকল্যাণের গ্রাণ্টি। সুতরাং ইনযার এর প্রতিশাব্দিক ব্যাখ্যা (ভীতি প্রদর্শন) দিয়ে হতে পারেনা। ইনযার এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, একজন মানুষের ধ্বংস ও পতন ঠেকানোর লক্ষ্যে আরেকজন মানুষের সৎ সাহস ও সততার সাথে যথা সম্ভব এগিয়ে আসা। এবং প্রয়োজনে তার জন্যে সমূহ ব্যক্তিগত স্বার্থ আরাম ও শান্স্থি-স্থিতি বিলিয়ে দেওয়া। বস্তুতঃ এটি নবী রাসূলগণের বৈশিষ্টাবলীর একটি। কুরআনে কারীমে তাদের (নবী-রাসূলগণ) কে মুবাশশির (সু-সংবাদদাতা) ও মুনযির (সতর্ককারী) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এর বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে।

তরজমাঃ "যদি তারা এই বিষয় বস্তুর বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন" (সূরা কাহাফ) অন্য একটি আয়াতে এসেছে ঃ

তরজমা ঃ "জাহান্নামীদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না।" অর্থাৎ এরা যদি দোযখে যায় তাতে আপনার কিছুই হবার নেই। তাদের সম্পর্কে তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা, তবে আপনি অবশ্যই জিজ্ঞেসিত হবেন আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সত্যের পথে ডাকা বিপদ থেকে সতর্ক করা এ দায়িত্ব তো পালন করেছেন। কেন তাদের অবস্থা নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবেন ? কেন আপনার বাণী তারা গ্রহণ না করায় পরিতাপ করবেন?

উপরের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা গেলো যে, প্রিয় নবী (সাঃ) পাপাচারী কাফের মুশরেকদেরকে মুক্ত করার জন্যে নির্বেদিত প্রাণ ছিলেন। সত্যের পথে ডাকা ও জাতিকে অশুভ পরিণতি থেকে সতর্ক করার দায়িত্ব অত্যন্স্থ সততার সহিত পালন করেছেন। তাদের কাছে এ কাজের কোন বিনিময় চাননি। চাননি কোন ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করতে। কেননা বাপের ইনযারের লক্ষ্য যেমন সম্স্থানের কল্যাণ ও শুভ কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাপের পার্থিব কোন উদ্দেশ্য ও ব্যক্তি স্বার্থসহ অন্য কিছুই হতে পারেনা।

তেমনি নবী রাসূলগণের সারা জীবনের সাধনা ও জিহাদের লক্ষ্য ও বিনা স্বার্থে ও বিনা বেতনে আল্লাহর সাথে তার বান্দাদের সম্পৃক্ত করানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা।

ইলমে শরীয়তে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জনের পর শিক্ষার্থী যদি নবী প্রদর্শিত নিয়মে 'ইনযার' বা দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে তা হলে গতানুগতিক বক্তৃতা বিবৃতি ও ছকবাধা ওয়াজ নসীহত কোনই কল্যাণ বয়ে আনবেনা। এজন্য অনেক সময় আমাকে যখন ওয়াজ নসীহত করতে ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তৃতা দিতে বলা হয়, তখন আমার মনে নৈতিক অধপতনের গভীর গহবরে নিপতিতদের পক্ষে আল্লাহর সেই মহান বান্দাদের প্রতিনিধিত্ব করা শোভা পায়না, যাদেরকে আল্লাহ পাক নবুওয়তের সুউচ্চ আসনে আসীন করেছিলেন।

যখন আমি নিজের দিকে তাকাই তখন অনুধাবন করতে পারি, দাওয়াত ও তাবলীগের হাতিয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। ওয়াজ-নসীহত, বক্তৃতা, বিবৃতি শ্রোতাদের হৃদয়ে যথার্থ প্রভাব ফেলতে পারছেনা। শ্রোতাদের দোষে নয়। আমাদের মত দাওয়াত ও তাবলীগের দাবিদারদের দোষেই এমনটি হচ্ছে। উক্ত আয়াতে গভীর দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখা যাবে সত্যি সত্যি মানুষ নসীহত গ্রহণ করবে, সতর্ক হবে এবং তাদের শিরা- উপশিরায় তাকওয়া ও আল্লাহভীতি প্রবাহিত হবে, যদি, ইনযার, সঠিক পন্থায় ও সঠিক জায়গায় উপবিষ্ট হয়।

কেননা আল্লাহর বানী মিথ্যা হতে পারেনা তিনি (আশা করা যায়, তারা সতর্ক হবে) বাক্যটি বাক্যের পরে তার সাথে সংযুক্ত করেই বিন্যাস করেছেন।

এর ফল হিসাবে। অর্থাৎ সঠিক পন্থায় দাওয়াত ও তাবলীগেরই ফল হলো "হাযর বা দাওয়াত গ্রহণ ও সকর্ত হওয়া। তাই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে আমাদের "ইনযার" সঠিক পন্থায় সঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ছেনা। পারছেনা মানব মানসে ভয়ভীতি ও সতর্ক হবার অনুভূতি সঞ্চার করতে। কেননা শ্রোতা সাধারনের প্রতি আমাদের মায়া মমতা নেই। কোন পাপীচারীকে দেখলে তার প্রতি নিন্দা ও ঘৃনা ছুড়ে মারি। এবং এতে তৃপ্তি অনুভব করি। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এবং আমাদের মধ্যে এক বিশাল ঘন পর্দা বিদ্যমান। অথচ আল্লাহর এই পাপাসক্ত বান্দাদের সাথে আমাদের মায়া-মমতার সম্পর্ক থাকা উচিত ছিলো। আমরা যাবতীয় রোগ-ব্যাধি থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু আমাদের কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ও ঘাড়ে দায়িত্ব এসে যায়, তার সাথে মায়া-মমতা ও মানবতার আচরণ করা। মানুষের রোগে ভোগা একটি স্বাভাবিক ব্যপার। রোগ থেকে মুক্তি চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ওয়াজিব। "হে আলস্নাহ রোগ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। রোগ থেকে আমাদের বাঁচান। এবং রোগাক্রান্তকে আরোগ্য দান করন্নন" কিন্তু রোগীকে ঘৃনা করে সরে থাকা হারাম, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রোগে ভোগে ততক্ষণ পর্যন্ত তার চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রন্নষার ব্যবস্থা করা

ওয়াজিব ও অবশ্যই করণীয়। আর যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে তার দাফন-কাফনের সুব্যবস্থা করা ওয়াজিব। অনুরূপ যে কোন গোনাহকে ঘৃণা করা এবং তার থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা ওয়াজিব। তবে গোনাহগার ব্যক্তিকে নিন্দা করা ও তাকে ঘৃণা করা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী। বিশষতঃ নায়েবে রাসূল হবার দাবিদার আলেম- ওলামাদের জন্য এধরনের আচরণ কোন মতেই বৈধ হতে পারেনা।

নবী-রাসূলগণের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে কাফের মুশরেকদের মোকাবেলায় ও তাদেরকে সত্যের পথে ডাকার তৎপরতায়, কিন্তু কখনো শুনা যায়নি যে, তারা পুরো জীবনে আল্লাহর দুশমনের সমালোচনা করে তৃপ্ত হয়েছেন। প্রিয় নবী (সাঃ) এর ঘাড়ের উপর সিজদারত অবস্থায় উটের বর্জ্য নিক্ষেপ করা হলো। জীবন বায়ু উড়ে যাবার অবস্থা, এই করুণ মুহূর্তেও নিজের অবস্থান থেকে মোটেও হটেননি। তাদেরকে কুফরীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করাই ছিলো তার একমাত্র চিন্তা ও ব্রত। তাদের মুক্তি তার কাজে নিজের জীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান ছিলো।

"প্রতিকুল আবহাওয়ায় নৌযান চলতে পারেনা, এটি একটি নিয়ম ও চিরায়িত সত্য, কিন্তু নবী গণের আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে সামগ্রিক বৈরী পরিস্থিতি ও কুফরীর মতো ঝড় হাওয়ার প্রবল তোড়েও তাদের দাওয়াতী "টাইটানিক" এক মুহূর্তের জন্যেও থেকে যায়নি। তাই যে সব শিক্ষার্থী "তাফাক্কুহ ফিদ্দীন" এর পর্যায়ে পৌছানোর আগে তৃপ্তির ঢেঁকুর ফেলে এবং সনদ পত্রের বস্তা কাঁধে করে ঘরে ফিরে, নবুওয়াতের ইলম তাদের ভাগ্যে জুটেনা। আর যে আলেমে দ্বীন কর্মোদ্যম, মায়া-মমতা ও সহমর্মিতা দিয়ে নিজের জাতিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর চিন্তা ভাবনা করে না, যথা সাধ্য চেষ্টা চালায়না, নবুওয়তের উত্তরাধিকারে তার কোন হিস্সা নেই। নেই তার মধ্যে নবীগণের প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতা।

ফকীহুল হিন্দ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রহঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক গুরু ও পীর মুরশেদ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) এর কাছে নিজের আত্মিক অবস্থাদি ব্যক্ত করে চিঠি পত্র লিখতেন না। এ ব্যপারে তার পীর সাহেব এক সময় জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ আমি এ ব্যপারে চিন্তা করি। কিন্তু আমি লেখবোটা কি ? আমার তো এমন কোন অবস্থা নেই যা আপনার কাছে ব্যক্ত করতে পারি। তবে হ্যাঁ আপনার অবিরাম বর্ষিত ফয়েজের বরকতে আমার অতীত ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে তিনটি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি।

১। কুরআন-হাদীস আমার মজ্জাগত হয়েছে তথা স্বভাবধর্মে পরিণত হয়েছে। ঘুমে চেতনে এ দুয়ের বিরোধীতা করতে পারি না। (এটা হচ্ছে ইলমে শরীয়তের শিক্ষার্থীদের অন্তরে সৃষ্ট আত্মিক যোগ্যতা) যাকে "মালকা" বলা হয়েছে।

২। আমার কাছে কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহের সঠিক মর্ম সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে। আয়াত ও হাদীস সমূহের মধ্যে মর্মগত কোন বিরোধ বা প্রভেদ দেখতে পাইনা।

৩। আমার কাজে গুণকীর্তন ও নিন্দাবাদ সমান হয়ে দাড়িয়েছে। কারো নিন্দাবাদ ও গালমন্দে অশান্তি বোধ করিনা এবং গুণকীর্তনে আনন্দ বোধও করিনা।

হযরত হাজী সাহেব একথা শুনে বলে উঠলেন, "বাহ বাহ! ইমদাদুল্লাহর জীবন শেষ হয়ে গেলো কিন্তু এমন সুন্দর ও উন্নত অবস্থা তার ভাগ্যে জুটলো না।" এটা অবশ্যই তাঁর বিনয় সুলভ উক্তি। কেননা আলস্নাহর বান্দারা যখনই আধ্যাত্মিকতার কোন স্তর অতিক্রম করেন আরো উঁচু স্তরে পৌছুতে পারবেন সেই আশায় অতীতে অর্জিত সর্বস্ব্বর বেমালুম ভূলে যান। হযরত হাজী এমদাদুলস্নাহ মুহাজের মক্কীর বেলায়ও তাই ঘটেছে।

অন্তর-আত্মায় এ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াই তো মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ এ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় উপায় উপকরণ কাজে লাগিয়ে কান্নাকাটি করে আলস্নাহর কাছে একাগ্র চিত্তে দোয়া করতে থাকতে হবে, "(হে আল্লাহ! আমাকে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে দাও)" আল্লাহর অসীম মহিমায় যাকে এ মহান নিয়ামত দান করবেন তার উপর অবশ্যই কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে, নিজ জাতিকে নবী প্রদর্শিত পন্থায় দাওয়াত তাবলীগ ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ইনযার" যা সতর্ক করার লক্ষ্যে কোমর বেঁধে মাঠে নামা। "ইনযার" এর মর্মার্থ তো আগেই বলা হয়েছে। শিরক-কুফর সহ যাবতীয় পাপাচারকে ঘৃনা করে তা থেকে দূরে থাকা। পাপাচারীকে ঘৃনা করে তার থেকে দূরে সরে থাকা নয়। সুতরাং তাকে স্বীয় দায়িত্ব অনুধাবন করে সংস্কার ও উপকারের মানসিকতা নিয়ে যথা সাধ্য তা পালনে ব্রতী হতে হবে। যাতে দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন হয়।

কোন স্নেহময় পিতা কি পারবে তার ছেলেকে ক্ষমা করতে যদি সে তরবারীর আঘাতে তাকে আহত করে কিংবা মাথা ফেটে দেয় ? কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, প্রিয় নবীর স্নেহ-মমতা কোন পর্যায়ের ছিলো ? তার মুখে পাথর ছুড়া হলো, দাঁত ভেঙ্গে গেলো। শিরক ও কুফরীর রোগে আক্রান্ত পাপিষ্টরা তার মাথায় তরবারী বসিয়ে দিলেন। লৌহ বর্মের কড়া মাথায় বিধে গেলো। বেহুঁশ হয়ে গর্তে পড়ে গেলেন তিনি। এমন নাজুক সময়েও পবিত্র মুখ থেকে বের হলো একটি ক্ষীন স্বর,

হে আল্লাহর বান্দারা আমার পানে এসো, তাদের এ অমার্জনীয় অপরাধের মার্জনা করে দু'চোখের পানি ঝরিয়ে একাগ্র চিত্তে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন ঃ হে মাবুদ ! আমার জাতিকে ক্ষমা করো পথ দেখাও যেহেতু তারা অজ্ঞ কিছু জানেনা, বুঝেনা।"

সুহৃদ পাঠক, দুনিয়ায় এমন কোন পিতার সন্ধান কি দিতে পারবেন যিনি তার কলিজার টুকরো সন্তানের প্রতি এমন দয়া ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করতে পারেন। যেমনটি প্রিয় নবী (সাঃ) তাদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন, যারা আঘাতের পর আঘাত করে পবিত্র শরীর জর্জরিত

করেছিল। সারা দুনিয়ার পিতৃস্নেহ একত্রিত করে যদি নবীর স্নেহের সাথে তুলনা করা হয়-তাহলে সেই তুলনা হবে এক বিন্দুকে মহাসাগরের সাথে তুলনা করার মতোই।

হায় আপসোস ! (আমার নিজের ও আমার আলেম ভাইদের জন্য) ইলম তলব করতে করতে জীবন প্রায় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু হৃদয় খোদায়ী ইলম ও "তাফাক্কুহ ফিদ্দীনের" ছোঁয়াও লাগেনা। প্রতি বছর দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে ছাত্র জীবনের কর্ণধার বের হচ্ছেন। কিন্তু কই ! কারোইতো নবীর আদর্শের সাথে সম্পর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছাত্র জীবনের উভয় স্তর অতিক্রম

(চার) জাতি গঠনের নিমিত্তে ওলামাদের প্রতি খতীবে আযমের ভবিষ্যত ত্বাত্ত্বিক কর্মসূচী ঃ

হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় ওলামাদের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত কর্মসূচীর রূপ রেখা নির্ধারণ করেন। লেখক সম্পাদনা করে এ সব রূপরেখা ধারাবাহিক ভাবে "আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য" পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেন। নিম্নে উদ্ধৃতাংশ হুবহু পেশ করা হলো। মাওলানার এরূপরেখা আগামী দিনের ইসলামী আন্দোলনের তন্দ্রাচ্ছন্ন ওলামাদের এবং সর্বোপরী মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি করবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়।

কর্মসূচী ঃ

"যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে কর্মধারারও রূপান্তর ঘটছে। লক্ষ্য এক কিন্তু প্রয়োগ কৌশল ভিন্নতর। মেশীন গানের মোকাবেলা মেশীন গান দিয়ে করতে হবে তীর ধুনুক দিয়ে নয়। এই সত্যকে সামনে রেখে ওলামাদের ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে।

১। (ক) ইসলামী মূল্য বোধের পুনরম্নজ্জীবনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেওবন্দের শিক্ষাধারায় দেশের প্রত্যম্ত অঞ্চলে নূতন নূতন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(খ) মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে সিয়াসিয়াত ও একতেসাদিয়াতের অম্তর্ভূক্তির মাধ্যমে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন ধারার সমন্বয়ে সাধন করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস্ত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষানীতিতে বালাকোটের সে জেহাদী প্রেরণা কার্যকরী করতে হবে সার্নগ্রিম ভাবে।

(গ) প্রত্যেক মাদ্রাসাকে বাতিল শক্তির মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রদের দরসী কিতাবের সবক পড়ার মাঝে মাঝে নব্য বাতিল শক্তির পরিচয় ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষ সেমিনার ও বক্তৃতার আয়োজন করে তাদের সার্বিক ভাবে গড়ে তুলতে হবে। ইসলাম যে শুধু কতিপয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নাম তা নয় বরং একটি অব্যাহত ও প্রাণবন্ত জীবন বিধান, ছাত্র জীবন এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানে বর্দ্ধিত না হলে বাস্তব জীবন কমরেডদের মোকাবেলায় নিজেদের অযোগ্য প্রমাণিত করবে। অবশ্য এই ব্যাপারে যেন মৌলিক লেখা পড়ায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। স্মরণ রাখতে হবে ভাল ছাত্র না হলে ভাল রাজনীতিজ্ঞ হওয়া যায় না। কারণ রাজনীতি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(ঘ) মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখতে হবে কোন ছাত্রটির কোনদিকে ঝোঁক অধিক। কেউ লিখিতে অভ্যস্ত, কেউ বক্তৃতায় পারদর্শী, কেউ বা

বিতর্ক (মোনাযারা) প্রতিযোগিতা সিদ্ধহস্ত। যে যে বিষয়ে অধিক মনোযোগী তাকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে তারা এর একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়াবে। এই নিয়ম অনুসরণ করা হলে দেশের মাদ্রাসা সমূহ থেকে যে উল্লেখ যোগ্য ছাত্র প্রতি বৎসর ফারেগ হচ্ছে তারা কার্য ক্ষেত্রে এক দক্ষ ও সুচতুর সিপাহ- সালারদের ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

২। ওয়াজ ও বক্তৃতার আবেদন সাময়িক। সুদূর প্রসারী আহবান সৃষ্টির জন্য একটি নূতন পন্থা বেছে নিতে হবে। প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে অন্ততঃ একটি ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তির চেষ্টা করতে হবে। এই ছেলেটি মাদ্রাসায় পড়া লেখা শেষ করার পর গোটা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ভাবে আলেম কেন্দ্রীয় সমাজ সৃষ্টি হলে সমাজের সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ বিদায় নিয়ে একটি ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হতে বাধ্য। উপরক্ত ইহা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথকে ত্বরান্বিত করবে। এই কর্মসূচীকে অবশ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে মেনে না নিয়ে সম্মিলিত ও দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত করা বাঞ্ছনীয়।

৩। মাদ্রাসায় লেখা পড়া শেষ করে আধুনিক শিক্ষার জন্য উৎসাহী ছাত্রদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। তবে তাদের নিয়ন্ত্রনের ভার ইসলামী সমাজের আলেমদের হাতে থাকবে যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেয়। শিক্ষার সর্বস্তরে আলেম না থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে করে ছাত্ররা ইসলামের প্রগতিশীল জীবনাদর্শ থেকে দুরে সরে দাড়ায় এবং আপনা আপনি ভাবে কাল মার্কস ও লেনিনের ভ্রান্ত দর্শনে আকৃষ্ট হয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন প্রভৃতি বিভাগের পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয়েছে মার্কস, ডিকো, আগাষ্ট, হবস, প্যারেটো, মাশাল, রন্নশো, প্রমুখ পাশ্চাত্য খোদায়ী আদর্শে অনাস্থাবান ব্যক্তিদের চিন্তাধারার উপর। অত্যন্ত চতুরতা ও পরিকল্পনার সাথে আল-কোরান ও আল-হাদীসের শিক্ষা ইবনে খালদুন, আলফারাবী, ওমর বিন খাত্তাব, আল বকরী, আল ইদ্রিসী, আত-তাবারী, ইবনে সীনা, যায়েদ বিন রিফা, ইমাম আবু হানিফা, কাজী আবু ইউসুফ, ইমাম গাজ্জালী, ইবনে সালাম, ইবনে কুতাহাবা, দীনওয়াবা, তাহতাবী আবুল হাসান মাওয়ারদী, আবু ওমর আলকিন্দী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ বিশ্ব বিখ্যাত মনিষীদের তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাধারাকে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। মুসলিম যুব মানসের সম্পূর্ণ বিপরীত এই অস্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে চুরমার করে ভেঙ্গে ইসলামী ভাবধারায় বিন্যস্ত করার জন্য মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্রদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো ইসলামী আন্দোলনের একটি অপরিহার্য কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কোন সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী যেন এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অর্গলা হয়ে না দাঁড়ায়। ৪। বর্তমান সমাজের ছাত্রদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। এদের মধ্যে ঈমান আছে কিন্তু প্রশিক্ষনের অভাবে প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি হয়নি। যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দৃষ্টি ভঙ্গির ও বিবর্তন প্রয়োজন। অন্যথায় যুগের উপর দৃষ্টি ভঙ্গির প্রভাব বিস্তার করা অসাধ্য নয়, হলেও সহজ সাধ্য নয়। কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের প্রতি বিদ্রূপ, উপহাস ও ইসলাম বিরোধী এ সমস্ত উক্তি থেকে বিরত থেকে ভাই বন্ধু ডেকে তাদের বুকে তুলে নিতে হবে সর্ব প্রথম। মনে রাখতে হবে এরা আমাদেরই ছেলে, ভাই, বন্ধু। নাস্তিকতার গন্ধময় গহবর থেকে এদের তুলে এনে তাওহীদী আবে জমজম অবগাহনের বন্দোবস্তকরাই হবে এদের 'সিরাতুল মোস্তাকীম' এ আনার সহজতর উপায় আন্দোলনে উজ্জীবিত যে সমস্ত মাদ্রাসার ফারেগ ছাত্ররা সেখানে অধ্যয়ন করছে তাদের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দ্বীনের দাওয়াত পৌছাতে হবে। এ ভাবে পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে এ সমস্ত ছাত্ররা তাওহীদের নিশান বর্দার হবে এটা নিশ্চিত। 'গোমরাহ' হয়েছে ভেবে যদি তাদের ছেড়ে দিই তাহলে ধর্ম বিমূখ শিক্ষা দায়িত্বশীল পদে সমাসীন হবে। আমাদের ঘরে লালিত সন্তান আমাদের শত্রু ভেবে অস্ত্রের ট্রিগার টিপতে সংকোচ করবেনা মোটেই।

৫। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদ ছিল একাধারে নামাজ আদায়ের স্থান অপর দিকে ইসলামী রাজনীতির চর্চা ক্ষেত্র। সরদারে দু'জাহান (সাঃ) এখানে বসেই যুদ্ধের পরিকল্পনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। প্রতি ফজরের নামাজান্তে না পারলে অন্ততঃ প্রতি শুক্রবার জুমা'র পর উপস্থিত মুসলমানদের বর্তমান যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নূতন সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফযায়েলের সাথে সাথে মাসায়েল ও বয়ান করতে হবে।

৬। সমাজে এমন অনেক লোক আছে যাঁরা দোয়া, দরূদ, অজু, নামাজ, রোজা, জাকাতসহ, ইসলামী অনুশাসনগুলোর প্রতিপালনের নিয়ম সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। এদের হযরত মাওলানা ইলিয়াছ সাহেবের (রহঃ) সৃষ্ট তাবলীগ জামাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বেশী না পারলে অন্ততঃ একচিল্লা। এর ফলে খোদা ভীতির সৃষ্টি হবে এবং নৈতিক চরিত্রে সংশোধন আসবে। তাবলীগে থাকাকালীন সময়ে তাঁরা রাসূলে করীমের মক্কী জিন্দেগী ও সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানবেন, এরপর সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে হযরতের মদনী জিন্দেগী অর্থাৎ রাসুলের রাজনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, বিপ্লবের দাওয়াত এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহাবায়ে কেরামদের আত্ম ত্যাগ ও উৎসর্গ হাতে কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে সৃষ্টি হবে অসংখ্য ইসলামের সৈনিক যাদের ঈমান ও বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হবে এই জমীনে আল্লাহর হুকুমত।

৭। সুদক্ষ, আদর্শবান ও সচ্চরিত্র এমন এক কর্মী বাহিনী আমাদের সৃষ্টি করতে হবে যা পরবর্তী সময়ে ইসলামী হুকুমতের প্রশাসনিক দায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে পালনে সক্ষম। যে প্রশাসনিক কাঠামোর ইমারত ধর্ম নিরপেক্ষ, পুঁজিবাদ ও আমলাতান্ত্রিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতিটি ইটের ফাঁকে ফাঁকে ঘুষ, দুর্নীতি, খোদা বিমুখতাসহ অসংখ্য ইসলাম গর্হিত নীতি সমূহ জমাট বেঁধে আছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই কাঠামোকে ভেঙ্গে

চুরমার করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, দক্ষ দায়িত্বশীল কর্মীদের প্রশাসনের সর্বস্তরে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ইমারত গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যুগে যুগে ওলামাগণই সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন দূর্বার বিপ্লব। এই আলেম সমাজই সর্বকালের জেহাদের অগ্রনকীব তূর্যবাদক। এই ওলামাগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁদের ইতিহাস আত্মত্যাগ ও উৎসর্গতার ইতিহাস। তাঁদের ইতিহাস মানুষের গড়া সংবিধান ভেঙ্গে কোরান-সুন্নাহ নির্দেশিত সংবিধান রচনার সংগ্রামেরই দীপ্ত স্বাক্ষর।

আমাদের রয়েছে এক সুসংহত বাহিনী শুধু আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়াই বাকী। আমার উপরোক্ত কর্মসূচীগুলো অনুসরণ করা হলে এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামনে অগ্রসর হলে আলেম সমাজ তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়ে সাফল্যের বিজয় দুন্দুভি শুনবে। আর রচিত হবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এক আলোকিত মহা সড়ক।"

(খ) রাজনৈতিক সংস্কারে খতীবে আযমের বিপ্লবী চিন্তাধারা ও ভূমিকা ঃ

(ক) সাংবাদিক সম্মেলন ঃ

হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জাতীয় ইস্যুতে দলীয় বক্তব্য বিশদভাবে তুলে ধরার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ভাবে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন। মাওলানার ৪টি সাংবাদিক সম্মেলন বিষয় নির্বাচনের গুরুত্বে, বাক চাতুর্যের নিপুণতার এবং উত্তর প্রদানে আত্ম প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতায় সর্বাধিক তাৎপর্যবহ। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ। সাংবাদিকদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে তিনি খেই না হারিয়ে পয়েন্ট ভিত্তিক জবাব দানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রতিটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষত ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠনোপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যে জ্ঞানদীপ্ত ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদের মতো জবাব দিয়েছেন এতে তাঁর মেধা ও নেতৃত্বের সম্যক পরিচয় মেলে। মাওলানার গুরুত্বপূর্ণ ৪টি সাংবাদিক সম্মেলনের আংশিক বিষয়বস্তু ধারাবাহিক ভাবে নিচে বিন্যস্ত করা গেল। এ সব বক্তব্য জাতীয় দৈনিক সমূহ বিশেষ করে করাচীর দৈনিক জং, এ, পি,/ পি, পি, আই, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১। লাহোর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

২। করাচীতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

৩। ঢাকায় আই, ডি, এল এর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন, ১৭ই অক্টোবর ১৯৭৬।

৪। ঢাকায় জামাতে ইসলামীকে আই. ডি. এল থেকে রহিস্কার উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন, ১০ই অক্টোবর, ১৯৭৭।

(খ) করাচীতে সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ

নেজামে ইসলাম কৃষক-শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণে লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করবে ঃ

তৎকালীন পাকিস্তান জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন, তাঁর দল কৃষক শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণে লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি বলেন, লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক কৃষক-শ্রমিকের মাঝে কাজ করা এবং সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর হাত থেকে তাদের রক্ষা করা।

তিনি ১৯৬৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর নেজামে ইসলামের করাচী কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন। এ সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি-

জনাব মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ)
জনাব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ)
জনাব মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ)
জনাব মাওলানা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুছ (রহঃ)
জনাব মাওলানা মতিন খতীব (রহঃ) ও
জনাব মাওলানা বাদশাহ গুল (রহঃ)

নেতৃবৃন্দ কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে দ্বীনি আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। (পরে পূর্ব-পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ইসলামী ছাত্র সমাজ গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশে এখনো সংগঠন তরুণদের প্রতি ইসলামের বিপ্লবী প্রচার-প্রসারের কাজ চালিয়ে আসছে-লেখক)

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন, বর্তমান সময়ে নিঃস্ব ও দরিদ্র জনসাধারণ যাদের অধিকাংশই শ্রমিক ও কৃষক, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। বর্তমানে কতিপয় সুবিধাবাদী নেতা তাদের সমাজতন্ত্রের সবুজ কানন দেখিয়ে বিপদগামী করার অশুভ প্রয়াস পাচ্ছে।

আমাদের ত্রিবিধ ফিৎনার মোকাবেলা করতে হবে ঃ

অন্যান্য নেজাম নেতৃবৃন্দ সহ তিনি বলেন পাকিস্তান ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমাদের এক সাথে তিনটি 'ইজম' ও অনৈসলামিক আদর্শের সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

প্রথম ঃ ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা এ্যাংলো আমিরাত শ্বেত সম্রাজবাদীদের কাছ থেকে পাকিস্থান উত্তরাধীকার সূত্রে লাভ করেছে। শ্বেত সম্রাজ্যবাদীদের বুদ্ধি ভিত্তিক গোলাম আমলাতান্ত্রিক গ্রম্নপ এটাকে আরো বাড়িয়ে পাকিস্তানের সমাজ কাঠামোকে উলট পালট করে দিয়েছে। যার কারণে পুঁজিপতিগণ আলস্নাহকে ভূলে গিয়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা দারিদ্রতায় ও দুঃখের প্রান্ত্ম সীমায় নেমে এসেছে। পুঁজিবাদী এ ব্যবস্থার ভিত্তি সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত যা দরিদ্র জন গোষ্ঠীর রক্ত শোষণের মাধ্যম। ইসলাম এ ব্যবস্থাকে এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারেনা। ওলামাগণ সবসময় এর বিরোধীতা করেছেন এবং আগামীতেও করবেন।

দ্বিতীয় ঃ জাতীয়তাবাদের ফিৎনা, যা দেশ ও জাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে বিভক্ত করে ছাড়ে। এটা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধের সবচে বড় দুশমন। এ জাতীয়তাবাদ দেশীয়, আঞ্চলিক, বর্ণ ও ভাষাগত উদ্দীপনাকে প্ররোচিত করে একে অপরের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। এটা ইসলামী জাতীয়তা বোধের চিন্ত্মা চেতনার পরিপন্থী। ইসলামী জাতীয়তাবোধের নামে অর্জিত দেশে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক জাতীয়বাদের ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যদি আমরা এ ফিৎনার আগুনকে যথার্থ ভাবে নিয়ন্ত্রণ রোধ করতে না পারি তা হলে এর লেলিহান শিখা গোটা পাকিস্তানকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেবে।

তৃতীয় ঃ সমাজতন্ত্রের ফিৎনা, এটা কুফরী মার্কসীয় ব্যবস্থা যার প্রারম্ভ খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মদ্রোহীতা দিয়ে। যেখানে না গণতন্ত্র আছে না মানবাধিকার এবং পরিণামের দিকদিয়ে এ ফিৎনা অপরাপর ফিৎনা সমূহের চাইতে অধিক ধ্বংসাত্মক।

এ ত্রিবিধ ফিৎনা তথা ইজম আমাদের দ্বীন এবং ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ। আন্ত্মরিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয়ী হতে পারি তা হলে আমাদের বিশ্বাস আমাদের সর্ববিধ সমস্যার সমাপ্তি ঘটবে এবং পাকিস্ত্মানের জনসাধারণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে জীবনাতিপাত করতে পারবে।

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন–

"সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাকিস্ত্মান আদর্শিক রাষ্ট্র। আদর্শের দুর্বলতার কারণে রাষ্ট্রীয় সংহতি দূর্বল হয়ে পড়ে। পাকিস্ত্মানের দু'অংশ পৃথক হয়ে যাবে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্ত্মানে সাম্প্রতিক কালে যে সব ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে কোলকাতা থেকে আগত লোকদের হস্ত্ম ছিল

ক্রিয়াশীল। তার প্রমাণ এই যে, উর্দ্দু ভাষীদের বুকে যখন তারা ছোরা বসায় তখন বাংলা বলে এবং বাংলা ভাষা ভাষীদের যখন ছুরিকাহত করে তখন উর্দু বলে, যাতে উভয়ের মনে ঘৃনার উদ্রেক হয়। তিনি বলেন, যে সব ব্যক্তি এ দেশ থেকে ইসলামকে বিদায় দিতে চায় এসব তৎপরতা তাদের। ইসলাম কোন বৈষম্য ও পার্থক্যকে বরদাশত করেনা। তিনি শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের আসন বন্টনের প্রস্আবের সমালোচনা করে বলেন, ইসলামের শত্রনগণ এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীরাই এ সব কথা বলতে পারে।

(দুই) লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ

ইসলাম সুদের পরিবর্তে সম্পদের উপর ট্যাক্স আরোপ করে "সম্পদ পুঞ্জিভূত" হবার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছে।

নিখিল পাকিস্ত'ন জমিয়তে ইসলাম ও নেজামে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সুদী কারবার, ইজারাদারী এবং বীমা ব্যবসার বিরোধীতা করে বলেন ব্যাংকে সুদী লেনদেন বন্ধ করে দিয়ে অর্থ সঞ্চয় কারীদের অংশীদার করে ব্যাংক সমূহকে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তারিত করা হোক।

তিনি ১৯৬৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর লাহোরে দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন। এ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ) মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ), মাওলানা ইহতেশামুল হক থানভী (রহঃ) এবং মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ) উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা সুদ, ইনকাম ট্যাক্স, বীমা ব্যবসার বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন এতে সম্পদকে ব্যবসায় খাটিয়ে আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে সম্পদ জমা করে সুদ অর্জনের যে মানসিকতা সৃষ্টি হচ্ছে তাতে সম্পদ গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে যাচ্ছে। যদি ইসলামের নির্দেশানুযায়ী সম্পদের উপর সুদ প্রদানের পরিবর্তে জাকাত আদায় করা হয় তা হলে সঞ্চিয় সম্পদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। পুঁজি যদি ব্যবসায় খাটানো হয় তা হলে শিল্পের বিকাশ ঘটবে, বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং সম্পদ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির দুয়ারে পৌছবে।"

(তিন) আই, ডি, এলের সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জরিত ধংসোম্মূখ পৃথিবীকে একমাত্র খোদায়ী জীবন বিধান ইসলামই বাঁচাতে পারে।

ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগের প্রস্তুতি কমিটির চেয়াম্যান মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেছেন, তাঁর দল খোদা প্রেরিত এবং রাসুল (সাঃ) প্রবর্তিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসারী। তাঁর দল মনে করে ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয় এবং মুসলমানও প্রচলিত অর্থে কোন সম্প্রদায় নয়। ইসলাম একটি পূণাঙ্গ জীবন দর্শন।

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ রোববার মতিঝিলের শরীফ'স ইন রেস্তোরায় (১৭ই অক্টোবর ১৯৭৬) এর সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও আদর্শ উদ্দেশ্য ঘোষণাকালে একথা বলেন।

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন তাঁর দল বিশ্বাস করে মানব রচিত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জরিত ধংসোম্মুখ পৃথিবীকে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টার প্রেরিত ব্যবস্থা ইসলামই বাঁচাতে পারে। একমাত্র ইসলামই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও বৃহত্তর সংহতির মূলমন্ত্র।

অস্ত্রের চেয়ে যুক্তির অস্ত্র অধিক শক্তিশালী ঃ

আই, ডি, এল প্রধান মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন, তাঁর দল অস্ত্রের চেয়ে যুক্তির অস্ত্রকে বেশী শক্তিশালী বলে মনে করে। তাঁর মতে যুক্তির অবর্তমানে অস্ত্র উৎসাহ পায়। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে তাঁর দল নির্বাচনকে অত্যাবশ্যক বলে মনে করে।

(চার) ফারাক্কা ও নির্বাচন প্রসঙ্গে ঃ

ফারাক্কা সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপনকে তিনি অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন, নাশকতামূলক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য একদিকে দেশরক্ষা ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা জোরদার করা অপরিহার্য অন্যদিকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন।

রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি, নাগরিকত্ব হারাদের নাগরিকত্ব দান এবং দেশের বাইরে অবস্থানকারীদের দেশে ফিরে আসার অন্তরায়গুলি অপসারণকে তাঁর দল অত্যাবশ্যক বলে মনে করে।

(পাঁচ) দালাল আইন প্রসঙ্গে ঃ

দালাল আইন এবং সংবিধানের ৩৮ নং ধারা বাতিল করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগ এখানো দালাল আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নানারূপ হয়রানীর অভিযোগ করেন।

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে নাগরিকদের সমান মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং তার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানের কথা ঘোষণা করেন।

(ছয়) পররাষ্ট্র নীতি ঃ

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তাঁরা মুসলিম জাহানের সাথে ভ্রাতৃত্ব সুলভ সম্পর্ক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতা ও একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ না করার ভিত্তিতে সৌহার্দ্য বজায় রাখার পক্ষপাতী বলে তিনি জানান।

(সাত) বন্দী মুক্তি প্রসঙ্গে ঃ

এক প্রশ্নের জবাবে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান বলেন, যে তাঁর দল দালাল আইনে যারা এখনো বন্দী রয়েছেন তাঁদের এবং রাজনৈতিক কারণে যারা আটক তাঁদের মুক্তি দাবী করে। তবে নির্দিষ্ট অপরাধে যারা বন্দী তাদের মুক্তি কাম্য নয়।

(আট) ঐক্য জোট গঠন প্রসঙ্গে ঃ

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তাঁর দল ক্ষমতাসীন হলে যিনি দলের নেতা থাকবেন তিনি পার্লমেণ্টারী পার্টির নেতা হতে পারবেন না। কোন কোন দলের সাথে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছেন এবং তাঁর দল কাদের সমমনা বলে মনে করে, জানতে চাইলে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন যে, ডানপন্থী দল বিশেষ করে যারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্র ও ইসলামীমনা তাঁদেরকে তার দল সমমনা বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগও ইসলামের দাবীদার। তাদেরও তিনি সমমনা বলে মনে করেন। কিন্তু মুসলিম লীগ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাচেছ। তাঁর দল এই দু' মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ করার চেষ্টা করছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তাঁর দল যুক্তফ্রণ্ট বা নির্বাচনী ঐক্যজোটে বিশ্বাসী নয়। তবে আদর্শের ভিত্তিতে এক দল গঠনে বিশ্বাসী।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ জানান যে সাবেক মুসলিম লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে দল গঠনের ব্যাপারে জনাব সবুর খানের পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আসেনি।

তিনি বলেন ঃ জনাব সবুর খান সাবেক মন্ত্রী জনাব মফিজ উদ্দীনকে তাদের সাথে আলোচনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এপর্যায়ে আলোচনায় মাওলানা ছিদ্দীক আহমদের অনুসারীরা আগের কোন দলের নামে একদল গড়তে রাজী হননি। তারা নতুন নামে ঃ মুসলিম ডেমোক্রেটিক পার্টি অথবা ইসলামিক লীগ নামে দল গঠনের প্রস্তাব দিয়ে ছিলেন। কিন্তু জনাব সবুর খান তাঁদের কিছুই না জানিয়ে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ নামে দল গঠন করে

ফেলেন এবং তিনি নিজেই নেতা হয়ে বসেন। এমতাবস্থায় ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামীমনা রাজনৈতিক দলগুলোর এক দল হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী কিনা জানতে চাওয়া হলে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন, তাঁরাও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। তবে সাথে সাথে ইসলামিক আদর্শেও বিশ্বাসী হতে হবে

খন্দকার মোশতাক আহমদের দলের সাথে কেন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দল করলেন না এ প্রশ্নের জবাবে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান জানান যে, খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে তাঁদের তিন দফা বৈঠক হয়েছে। উভয় পক্ষই উভয়ের মেনিফেস্টো পড়ে দেখেছেন। তাতে উভয় দলের মধ্যে খুব একটা তফাৎ ছিল না। তাঁকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম দলের আগে ইসলামিক শব্দটা বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে। কিন্তু তিনি রাজী হননি। দলের নামকরণ এবং কিছু আদর্শ ভিত্তিক কারনেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারিনি।

(নয়) এ দেশে ইসলাম নিয়ে বিতর্ক চলছে ঃ

কোন আরব দেশের নামের আগে ইসলামিক শব্দ আছে কিনা এবং আমরা কেন ইসলামিক কথাটি নিয়ে এত মাতামাতি করি জানতে চাওয়া হলে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন, ওসব দেশে ইসলাম নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। তার মতে এখানে ইসলাম নিয়ে বিতর্ক চলছে। আমরা বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে প্রমাণ করে দিতে চাই যে এখানে ইসলাম চলবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, সব রাজনৈতিক দলের নামের আগেই ইসলাম শব্দ থাকতে হবে এমন কোন কোন কথা নেই।

তাঁর দল ক্ষমতাসীন হলে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা চালু করা হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা জবাব দেন ঃ "যত দুর সম্ভব ওই আদর্শ বাস্তবায়িত করব।" আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই। তবে অন্য কোন ধর্মের কোন বাঁধা থাকবে না।

(দশ) রাষ্ট্রীয় চার মুলনীতি প্রসঙ্গে ঃ

তার দল ক্ষমতাসীন হলে বর্তমান সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অক্ষুন্ন রাখবে কিনা জানতে চাওয়া হলে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা বলেন, আমরা এক স্তম্ভে বিশ্বাসী। এর পরিপন্থীগুলো বাতিল করা হবে। ধর্ম নিরপেক্ষতা বাতিল করা হবে। অবশিষ্টগুলো সম্পর্কে পরে জনগণের পছন্দ অনুয়ায়ী বিবেচনা করা হবে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তারা ইসলামের মূলমন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন কিনা প্রশ্ন করা হলে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী

সম্প্রসারণবাদী ভারতের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করেছি। স্বাধীনতার পরে ইমানের সাথে গঠনমূলক কাজে আমরা আত্মনিয়োগ করেছি।

(এগার) বুদ্ধিজীবি হত্যা প্রসঙ্গে ঃ

১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে যেসব বুদ্ধিজীবিদের হত্যা হরা হয়েছিল তারাও কি সম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী ভারতের এজেন্ট ছিলেন বলে তাঁর দল মনে করে কিনা এ প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে সাবেক জামতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পি.ডি.পি নিয়ে গঠিত ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগ নেতা বলেন ঃ এটা ঠিক করে বলা চলে না। বুদ্ধিজীবি হত্যাটা খুবই রহস্যজনক। এমনও ষড়যন্ত্র চলেছে যে একজনে হত্যা করে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করা হয় তখন তাঁর মতে ভারতীয় বাহিনী মীরপুরের কাছে এসে গেছে। রাজাকার আলবদর আস সামসরা তখন ভয়ে পালাচ্ছিল। পলায়নকারীরা এ কাজ করবে তা বিশ্বাস হয় না। এই প্রসঙ্গে জহির রায়হানের কথা তুলে তিনি বলেন, জহির রায়হান কিভাবে গুম হলে এটাও রহস্যজনক ব্যাপার। এ কাজ আল বদররা করেছে এটা বলা যায় না। এ ব্যাপারে এখনো তদন্ত করা হয়নি।

(বার) ৭১-এর গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গে ঃ

৭১ সালের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সময় তার দলের অনুসারীরা কি ভূমিকা নিয়েছিল জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এ সময় তিনি গ্রামে ছিলেন। এখানে কি হয়েছে তা তিনি তখন জানতে পারেননি। তিনি বলেন, অস্ত্রের মুখোমুখি হয়ে আমরা তৃতীয় মতাবলম্বীরা প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই কাটাকাটি মারামারি শুরন্ন হয়ে যায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাক বাহিনী, বাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এর নির্বিচার গণহত্যা নারী ধর্ষণকালে দখলদার সরকারের দু'জন মন্ত্রী যারা বর্তমানে ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগের নেতা তারা কি ভূমিকা পালন করেছিলেন এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেনঃ তারা তখন সিভিল এড-মিনিস্ট্রেশন নিয়ে ব্যস্থ ছিলেন। তারা হত্যার জন্য দায়ী নয়। তারা নিজেরা অস্ত্র ব্যবহার জানতেন না। তারা শান্থি শৃংখলা রক্ষা করতেন।

(তের) স্বধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে ঃ

তাঁর দলের সদস্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বাত্মকভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে এদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগ নেতা বলেন ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা বিরোধীতা করেছিলেন। কারণ এ স্বাধীনতাকে তারা সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদের চক্রান্থ বলে মনে করেছিলেন।

তিনি বলেন, বিদেশের হস্তক্ষেপ ছিল বলে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতা করেছিলাম। বিদেশের চক্রান্তে এদেশের মানুষও ছুটে চলেছিল।

প্রশ্ন ঃ তাহলে বিদেশীদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদের উস্কানীতেই এদেশের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল, নিজেদের ইচ্ছায় স্বাধীনতা চায় নাই–আপনারা কি এ কথা বলতে চান ?

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ এ দেশের মানুষও চেয়েছিল বিদেশীদের উস্কানিও ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কেন স্বাধীনতা চান নাই ?

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। কিন্তু তা বিদেশের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নয়। কেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হল এ প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন ঃ শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭০ এর নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলে আমি বিবৃতি মারফত বলে ছিলাম তার হাতে ক্ষমতা অর্পন করার জন্যে।

প্রশ্নঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কে দায়ী ?

উত্তর ঃ উভয় পক্ষেরই বাড়াবাড়ি হয়েছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৭০–এর নির্বাচনে জনগণ ৬–দপার পক্ষে রায় দিয়েছিল। স্বাধীনতার কোন কথা ছিল না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বায়ত্ব শাসন নিতে কোন বাধা ছিল না বলে আমরা মনে করি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইয়াহিয়া–ভুট্টোর অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তিনি তীব্র নিন্দা করেন।

প্রশ্ন ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধকালে আপনাদের কি ভূমিকা ছিল ?

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ

আমাদের কোন ভূমিকা ছিল না ? আমরা তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। কোন পথে যাব তা ঠিক করতে পারিনি।

প্রশ্ন ঃ সাম্রাজ্যবাদ বলতে কাকে বুঝাচ্ছেন ? ভারত না পাকিস্তান ?

উত্তর ঃ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ। পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী ছিল না সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের দল রাজাকার, আল–বদর, আল–শামস বা কথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্যদের নিয়ে গঠিত কিনা ?

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ আল–বদর, আল–সামস প্রভৃতি বাহিনী কোন রাজনৈতিক বাহিনী ছিল না। পাঞ্জাবী মিলিটারীরা এসব বাহিনী গঠন করেছিল। তদানীন্তন সরকার

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর-চেয়ারম্যানদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করেছিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কোন ব্যক্তি সদস্য হতে পারবেন কিনা জানতে চাওয়া হলে মাওলানা ছিদ্দীক আহম্মদ বলেন, আমাদের আদর্শ ইসলাম। মাইনরিটি সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সদস্য না হতে পারলেও তাদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে।

নির্বাচনী বিতর্ক সম্পর্কে তাকে মন্তব্য করতে বলা হলে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন যে, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সামান্য দু'চার মাস দেরী হলেও নির্বাচন হওয়া উচিত।

তাঁর দল ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশকে 'ইসলামী রিপাবলিক' করা হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন ঃ এখনো ঠিক করিনি। পার্লামেন্টে যেতে পারলে জাতির পছন্দ অনুয়ায়ী করব।

প্রশ্ন ঃ ৭১ সালের মার্চে ৬দফার প্রশ্নে আপোষ না করায় বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে যে মন্তব্য করেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ৭১ এর ২৫শে মার্চ রাতে পাক-বাহিনীর ব্যবস্থা গ্রহণকে তাহলে আপনারা সময়োচিত হয়েছে মনে করেন কি ?

মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ পাকিস্তানী সৈন্যদের বাড়াবাড়ির নিন্দা করি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবী করেন যে, ৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট রাতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর লোকেরা রেডিওতে বাংলাদেশকে ইসলামি রিপাশলিক করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খন্দকার মোশতাকের জন্য তা হতে পারেনি।

জাতির পিতা প্রসঙ্গে ঃ

ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা ছিদ্দীক আমাদের নিকট শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে মানেন কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, মুসলমানের জাতির পিতা বেদাত কাজ। কায়েদে আজমকেও জাতির পিতা বলে বেদাত কাজ করা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে ঃ

মাওলানা ভাসানী সন্তোষে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সত্ত্বেও তাঁর দল আর একটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, মাওলানা ভাসানী সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এটা করেননি। এ সময় তাঁর দলের জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর কানের কাছে এসে কি বলতে দেখা যায়। এ পর্যায়ে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বলেন যে, তাঁর দল ক্ষমতাসীন হলে মাওলানা ভাসানীর ইসলামিক

বিশ্ববিদ্যালয়ে অপূর্ণ কোন কিছু থাকলে তা পূরণ করা হবে। পররাষ্ট্র নীতিতে ভ্রাতৃত্ব এবং সমমর্যাদার ভিত্তিতে সখ্যভাব এর মধ্যে পার্থক্য কি তা জানতে চাইলে মাওলানা সাহেব বলেন যে, মুসলমান মুসলমান ভাই। তাকে ঘরের ভিতর এনে আদর আপ্যায়ন করা যায়। আর যারা বন্ধু তাদের আন্দর মহলে আনা যায় না।

আপর এক প্রশ্নের জবাবে ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগ নেতা বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান ৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধী দালালদের ক্ষমা করে দেয়ায় তাঁরা আলস্নাহর কাছে শোকর গোজার করেন।

ইসলামিক ডেমোক্রোটিক লীগের চেয়ারম্যান মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, গত ১৮ই অক্টোবর ইত্তেফাকে বাংলাদেশের সংগ্রাম ছিল বিদেশী উস্কানির ফল' কথাটি আমার উক্তি বলে বিবৃত হয়েছে। আমার বিবৃতির কোথাও আমি এ উক্তি করিনি।

(ষোল) ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ ঃ

দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে আই, ডি, এল এর সর্বস্স্তর হতে জামায়াতে ইসলামীকে বহিষ্কার।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সাতটি ছোট-বড় রাজনৈতিক দল নিজেদের পূর্ব পরিচিতি পরিহার করত ঃ "ইসলামী ডেমোক্রোটিক লীগ I.D.L নামে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল। উক্ত দলে অন্যান্যদের সাথে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালের ৮ই অক্টোবর "দলের গঠনতান্ত্রিক বিধান ও শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে সংগঠনের সকল স্তর হইতে সাবেক জামায়াতে ইসলামীকে সর্বসম্মতি ক্রমে বহিষ্কার করা হয়।" এর ২দিন পর ১০ই অক্টোবর, আই.ডি.এল এর পক্ষ থেকে ঢাকা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে দলীয় প্রধান হিসাবে খতীবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং জামায়াতে ইসলামীকে বহিস্কাকারের কারণ ব্যাখ্যা করে যে ভাষণটি প্রদান করেন তার গুরম্নত্বপূর্ণ অংশটি এবং উপস্থিত সাংবাদিকদে কে দেয়া প্রশ্নোত্তরটি আই.ডি.এল এর প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশ করা হয়। ১৯৮৮ সালের ৭ই মাওলানা নূরম্নল কবির আনসারী কর্তৃক সম্পাদিত সাময়িকী 'আফকার' পত্রিকায় এটা পূনর্মুদ্রন করা হয়। খতীবে আযমের দৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতি ও ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠক সমাজকে সম্যক ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে। আফকার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত সাংবাদিক সাক্ষাৎকারটি আমরা পাঠক সমাজকে উপহার দিচ্ছি।

প্রিয় সাংবাদিক ভাইগণ,

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের দলীয় বক্তব্য আপনাদের মাধ্যমে জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বিধায় আজ আমি প্রায় এক বৎসর পর আপনাদেরকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহবান নিয়েছি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনাদের সামনে আমাদের দলীয় একটি আভ্যন্তরীন ব্যাপার উথাপন না করে পারছিনা। জাতির সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের মন-মানসিকতার পরিপূরক চাহিদানুযায়ী আমরা ছোট বড় সাতটি সাবেক রাজনৈতিক দল নিজেদের পূর্ব পরিচিতি পরিহার করতঃ একটি পাঁচ দফা সম্বলিত সনদে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করলাম। কিন্তু আই-ডি-এল গঠনের পর হতে সাবেক জামাতে ইসলামীর সদস্যগণ পার্টির মধ্যে তাদের সাবেক দলীয় তৎপরতা চালিয়ে আসতেছে। বার বার তাদেরকে সকর্ত করা সত্ত্বেও এ ধরনের কার্য-কলাপ হতে বিরত না থেকে উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধি করে আসছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের দলীয় স্বার্থে২০৭ জনের স্বঘোষিত কাউন্সিলারগণ এক বে-আইনী রিকুইজিশান কাউন্সিল সভা আহবানের নোটিশ প্রদান করে। অথচ এ পর্যন্ত আই-ডি-এল এর কোন কাউন্সিল আহবানের কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। আমি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, যথাশীঘ্র সম্ভব কাউন্সিলারদের যথারীতি নির্বাচনের পর কাউন্সিল সভা আহবানের ব্যবস্থা করব। আপনারা এই অবৈধ নোটিশ প্রত্যাহার করুন। কিন্তু তারা কোন সন্তোষ জনক কারণ না দর্শায়ে নিজেরা স্বঘোষিত কাউন্সিলার সেজে আগামী ২৩শে অক্টোবর কাউন্সিল সভা ডেকে বসে।

এমতাবস্থায় গত ৮ই অক্টোবর দলের কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভায় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার পর দলের গঠনতান্ত্রিক বিধান ও শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে সংগঠনের সকল স্তর হতে সাবেক জামায়াতে ইসলামীকে সর্ব সম্মতিক্রমে বহিস্কার করা হয়েছে।

আশা করি আপনার সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমাদের এই পরিস্কার বক্তব্য সমূহ জাতির সম্মুখে তুলেয় ধরবেন। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রশ্নোত্তর ঃ

১। প্রশ্ন ঃ বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে আই.ডি.এল-এর জন্ম বলে আপনার ভাষণে উল্লেখ আছে। এ ব্যাপারে কোন কোন জাতীয় নেতা ও দলের সাথে আপনাদের আলোচনা হয়েছে ?

উত্তর ঃ এ পর্যায়ে আমরা সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। তন্মধ্যে মুসলিম লীগ প্রধান খান এ, সবুর, জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান

এবং ইসলামী সংহতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কনভেনশন মুসলিম লীগের সাথেও ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনা হয়েছে।

২। প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি ঢাকা ও বগুড়া সেনানিবাসে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি ? এবং এই সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন ?

উত্তর ঃ আমরা এ দুঃখজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা করি এবং ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তিদানের জন্য জোর দাবী করি। ঘটনার সাথে কে বা কারা জড়িত ছিল তা' আমরা কিছুই জানিনা। আমরা কেবল রাষ্ট্রপতি তাঁর বেতার ভাষণে যা' বলেছেন– "কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত সৈন্য এ ঘটনা সংঘটিত করেছে" এটুকুই জানতে পেরেছি।

৩। প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে আপনি আপনার দলে আল-বদর এর অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন। সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ঃ আমার বক্তব্য এখনও তাই। আমি উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলাম– রাজাকার আলবদর সরকারেরই সৃষ্ট বাহিনী ছিল। কোন রাজনৈতিক দলের যদি তাদের সঙ্গে কোনরূপ যোগসাজস থেকে থাকে তা তারাই বলতে পারে। আমাদের এসব জানার কথা নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাবেক নেজামে ইসলাম পার্টি কি কোন রাজাকার আল-বদর সৃষ্টি করেছিল ?

উত্তর ঃ না, আমি প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেও বলেছিলাম আমরা তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ় ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার দল হতে সাবেক জামাতে ইসলামীকে বহিস্কারের কারণ গুলি খুলে বলুন।

উত্তর ঃ ছোট–বড় সাতটি দলের সমন্বয়ে পাঁচ দফা ঐক্য সনদে স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামীক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠিত হয়। কিন্তু সাবেক জামাতে ইসলামী আই.ডি.এল গঠনের অব্যাহতি পর হতেই সনদের প্রথম ও প্রধান শর্ত "সাবেক দলীয় পরিচিতি পরিহার" এর বিরুদ্ধাচরণ করত ঃ গোপনে নিজেদের সাবেক দলীয় তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং সর্বশেষ আই.ডি. এল এর সংহতি বিনষ্টের ঘৃন্য উদ্দেশ্যে নিজেদের সাবেক দলীয় সদস্যদের দস্তখত সংগ্রহ করতঃ কাউন্সিল অধিবেশনের জন্য রিকুইজিশান নোটিশ প্রদান করেছে।

প্রশ্ন ঃ সাবেক জামাতে ইসলামী সদস্যগণ কি তাদের সমস্ত গোপন তৎপরতার জন্য মসজিদকেই উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে ?

উত্তর ঃ তাদের সাবেক দলীয় অঙ্গ সংগঠন সমূহের মাধ্যমে তারা এ তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং মসজিদ মিশন নামে তাদের একটি সংস্থাও রয়েছে। সাবেক জামাতে ইসলামীরাই এর নেতৃত্বে আসীন থেকে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাদের তফসীর

ক্লাশও হয়ে থাকে। কিন্তু মাওলানা মওদুদী রচিত তাফহীমুল কোরআন ছাড়া এ সমস্ত তাফসীর ক্লাসে অন্য কোন তাফসীর পড়ানো হয়না।

প্রশ্ন ঃ সাবেক জামাতে ইসলামীগণ কি কোন বিদেশী রাষ্ট্র হতে সাহায্য পেয়ে থাকে ? এবং অনুরূপ কোন বিদেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের রাজনৈতিক কোন যোগসাজশ আছে কি ?

উত্তর ঃ এই ধরনের অভিযোগ আমরাও শুনেছি। তবে এর কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

প্রশ্ন ঃ জামায়েতে ইসলামীদেরকে আই.ডি.এল হিসাবে দলে ভিড়িয়ে ছিলেন, এখন তাদেরকে কিরূপে জামাতে ইসলামী হিসাবে চিহ্নিত করেছে ?

উত্তর ঃ ২০৭ জন রিকুইজিশান নোটিশদানকারী তথাকথিত কাউন্সিলার এর সকলেই সাবেক জমাতে ইসলামীর সদস্যভুক্ত ছিল, অন্য কোন অঙ্গদলীয় সদস্যের নিকট হতে দস্তখত নেওয়া হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে যেখানেই জমাতে ইসলামীর লোক ছিল সে তৎসমর্থনে বিবৃতি দিয়েছে। তাই সমষ্টিগত অপরাধের জন্য সমষ্টিগতভাবেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের গঠনতন্ত্রের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদানের বিধান উল্লেখ আছে। সেই প্রেক্ষিতে বহিষ্কৃত সাবেক জমাতে ইসলামী সদস্যদের সে সুযোগ দেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর ঃ হাঁ, দেয়া হয়েছে। কথিত রিকুইজিশান নোটিশের কপি আমাকে হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে মাষ্টার শফিক উল্লাহ আমার বাড়ী যান। আমি তাঁর সাথে আলাপ এবং আমাকে প্রদত্ত কপি পড়ে দেখে বুঝতে পারলাম, একাজ একক জামাতে ইসলামীর উদ্যেগেই হয়েছে। তারপর আমি ঢাকায় এসেও মাষ্টার শফিক উল্লাহসহ অন্যান্য জামাত নেতাদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছি। তাদেরকে আমি বেআইনী নোটিশ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছি এবং ৮ই অক্টোবরের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে যোগদান করতে বলেছি। কিন্তু প্রথমদিকে কিছুটা আপোষমূলক কথাবার্তা বললেও শেষ পর্যন্ত তারা অজ্ঞাত কারণে আপোষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়, আর বৈঠকে যোগদান হতে বিরত থাকে। উক্ত বেআইনি নোটিশ প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি হয়, এমনকি তৎপ্রেক্ষিতে অবৈধ কাউন্সিল আহবান করে। যা কোন ক্রমেই আই.ডি.এল এর কাউন্সিল অধিবেশন হতে পারে না বরং তা' হবে সাবেক জামাতে ইসলামীরই কর্মী সম্মেলন। কাজেই তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলা চলেনা।

প্রশ্ন ঃ জামাতে ইসলামীদের বহিষ্কারের ফলে আপনার দল কি দুর্বল হয়ে পড়বে না?

উত্তর ঃ টিউমার অপারেশন করে বের করে ফেললে স্বাস্থ্য খারাপ হয় না, বরং সুস্থ ও সবল হয়ে উঠে। জামাতিরা আই, ডি, এল-এর মাঝে টিউমার স্বরূপ বিরাজ করছিল, তাদের বহিষ্কারের ফলে আই, ডি, এল নিরূপদ্রবে কাজ করে যেতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ জামাতে ইসলামীর সঙ্গে আপনাদের বিরোধ কি শুধু কৌশলগত ব্যাপার, না বিশ্বাস ও আকীদার ড়্গোত্রেও বিরোধ রয়েছে।

উত্তর ঃ বিশ্বাস ও আকীদার ক্ষেত্রে ও বিরোধ রয়েছে। এবং সে মত বিরোধ পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতে ও থাকবে। তবে আমরা সে সকল বিরোধকে রাজনীতিক্ষেত্রে টেনে আনতে চাইনি, তদুপরি আমরা মনে করেছি, এখতেলাফ তো মওদুদীর সঙ্গে, এরা জামাতে ইসলামী করছে বলে তো আর মওদুদী হয়ে যায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের এ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে তারা নিজেদেরকে মওদুদী মতবাদের সাচ্চা অনুসারী ও প্রচার কার্যে নিয়োজিত রূপে প্রমাণ করেছে। কৌশলগত বিরোধ হলো এখানে যে, " তারা ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনে বিশ্বাসী ও আমরা লিবারেল ডেমোক্রেট ও ইসলামী আদর্শবাদী"।

প্রশ্নঃ রিকুইজিশান নোটিশ স্বাক্ষর কারীদের মধ্যে কয়েকজন নাগরিকত্ব বিহীন লোকও রয়েছে একথা সত্য কিনা ?

(এ প্রশ্নের উত্তর দলের সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট শফিকুর রহমান প্রদান করেন)

উত্তর ঃ রিকুইজিশান নোটিশ প্রাপ্তির পর পত্রিকায় প্রদত্ত আমার বিবৃতিতে আমি একথা উল্লেখ করলাম। করণ, আই.ডি.এল এর গঠনতন্ত্র মোতাবেক এর সদস্যপদ লাভের জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া পূর্ব শর্ত কিন্তু রিকুইজিশান নোটিশ দানাকারীদের মধ্যে কয়েকজন এমনও আছেন দেখতে পেলাম যারা এখনও বাংলাদেশের নাগরিকত্বই ফিরে পায়নি। তথাকথিত কাউন্সিলারগণ যে কি ধরনের কাউন্সিলার তা সকলের অবগতির সুবিধার্থেই ইহার উল্লেখ করেছিলাম। অর্থাৎ যিনি সাধারণ সদস্য লাভের যোগ্যতাই রাখেন না অথচ তিনি স্বঘোষিত একজন কাউন্সিলার, রিকুইজিশানের দাবীদার।

প্রশ্ন ঃ যাদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নাই, তাদের কি এদেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার আছে ? যদি না থাকে তবে কি আপনারা এ ধরনের প্রয়াসের নিন্দা করেন ?

উত্তর ঃ যারা বাংলাদেশী নাগরিক নয়, আইনতঃ তাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার নাই। এবং সেহেতু আমরা যে কারন্নরই এহেন প্রয়াসের নিন্দা করি।

প্রশ্ন ঃ নাগরিকত্ব নেই এমন দস্তখতকারীর সংখ্যা কত তাদের নামগুলি বলুন।

উত্তর ঃ ৫/৭ জন রয়েছে। আমরা নাম বলতে চাইনা, তা' সরকারের অজানা নয়। তাদের সম্পর্ক যথারীতি সরকারী তদন্ত কার্য শুরু হয়েছে।

(আ.ফা.ম খালিদ, উল্লেখ্য যে এখানে মাওলানা সাহেব ক্যাডার ও লিবারেল এ দুটি শব্দ ব্যবহার করে জামাতে ইসলামীদের দুটি বিশেষ চরিত্রের প্রতিই পরোক্ষ ইঙ্গিত করেছেন, (১) জামাতে ইসলামী কম্যুনিষ্ট পদ্ধতির ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনে বিশ্বাসী যা, গণ সংগঠনের চরিত্রের বিরোধী অথচ আ.ডি.এল একটি গণসংগঠন। (২) জামাতে ইসলামীর কর্মপদ্ধতি ও কার্যকলাপ ফ্যাসিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত যা, বিলাবেলজিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ ইসলাম কোক্রমেই ফ্যাসিজমের অনুমোদন করেনা। সর্বোপরি মাওলানার ব্যবহৃত "ডেমোক্রেট" শব্দটি ও বিশেষ অর্থবহ। আর তা হচ্ছে জামাতে ইসলামীদের অগণতান্ত্রিক চরিত্র ও একনায়কত্ববাদী কর্মপদ্ধতির প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত দান।)

খতীবে আযমের বিশ্লেষণে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনে মুসলিম উম্মাহর নৈতিক দায়িত্ব ঃ

অর্থ ঃ হুজুর (সঃ) ফরমায়েছেন আমার জন্য সমস্ত ভূমণ্ডলকে তহুর এবং মসজিদ করা হয়েছে। (হাদীস কয়েক বার দরূদ শরীফ পাঠ করুন)।

জনাব ইমাম সাহেব এবং মুসল্লী ভাইসব!

ইমাম সাহেবের অনুরোধ ও আপনাদের আগ্রহে দু একটি প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য আমি এ মিম্বরে আরোহণ করেছি।

যে হাদিছটি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করলাম এ হাদিছটি একটি দীর্ঘ হাদিছের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। উক্ত হাদীছটিতে মসজিদের সহিত সংশ্লিষ্ট আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাই আমি আপনাদের চাহিদার পরিপূরক হিসাবে দীর্ঘ হাদীছটির অংশ বিশেষ আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করলাম। উপরোল্লিখিত হাদীছটির মোটামোটি ব্যাখ্যা এই যে বিশ্ব নবী বলেন, আল্লাহ তায়ালা তথা আমি এবং আমার সমগ্র উম্মতদের জন্য এ ভূমন্ডলকে পবিত্র এবং মসজিদে পরিণত করেছেন। আমাদের পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিচ্ছালাম ও তাদের অনুগামীদের ইবাদত খানায় ছিল তাদের মসজিদ। সেখান ব্যতিত অন্য কোথাও নামাজ আদায় করার শ্রষ্টার আদেশ মাত্রই ছিলনা। তাই প্রত্যেককে নামাজের সময় আপন স্থল ত্যাগ করে ইবাদতগাহে গিয়ে নামাজ আদায় করতে হত। কিন্তু আমাদের তো একাদশে বৃহস্পতি। খোদার নিকটতম নবী হযরত (সঃ) এর বদৌলতে এই বিশ্ব ভ্রক্ষাণ্ড আমাদের মসজিদরূপে পরিণত হয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছা নামাজ আদায় করতে পারেন। উকিলবার -লাইব্রেরীতে, গবেষক গবেষনাগারে, পরীক্ষক পরীক্ষাগারে কৃষক মাঠে, শ্রমিক তার কর্মস্থলে, যার যেখানে সুযোগ সুবিধা বেশী সে সেখানে প্রভুর একত্ব প্রকাশের নিমত্ত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেষ্ঠতম আসনে উপবিষ্ট শ্রষ্টা আইনদাতা বিধানদাতা, পালনকর্তা ইত্যাদি সর্বান্তকরণে সমর্থনে নিজের সর্বাঙ্গ নোয়াইয়া দৈনিক পাঁচবার মহাশক্তিধরের গোলামীর সম্মতি প্রকাশ করতে পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ।

রুগ্ন ব্যক্তি পানি ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে এ ভূমণ্ডলের যে কোন স্থানের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা লাভ করতে পারা যায়। এটা হল আমাদের মহানবীর মহান বৈশিষ্ট্য। নবী যে রকম উদার তার দয়াও অনুরূপ। তিনি হলেন সমস্ত নবীদের ইমাম, এবং আমার ভাষায় এই বিশ্ব ভ্রক্ষাণ্ডের বড় মসজিদের ইমাম। আমরা সকলে সেই বড় মসজিদের মুসল্লি। তিনি হলেন ইমামুল আম্বিয়া, আমরা হলান ইমামুল উম্মত। নবীর দায়িত্ব যে রকম শ্রেষ্ঠতম উম্মত। উপরোক্ত হাদীছটির সারমর্ম। আমি সংক্ষেপে তিনটি Poiut এর উপর এ হাদীছটি আলোচনা করিতেছি।

(ক) সহজ বোধ্য হবার জন্য বলছি। উক্ত হাদীছে এই ভূমণ্ডলকে যে মসজিদ করা হল' আমার ভাষায় এটা বড় মসজিদ। আর যেখানে নামাজ আদায় করবার মানসে চারিটি দেয়াল পরিবেষ্টিত যে ঘর নির্মাণ করা হয়, আমার ভাষায় উহা ছোট মসজিদ। বড় মসজিদের মর্যাদা ছোট মসজিদের চাইতে কম না। রাছুল (দঃ) হলেন এ মসজিদের ইমাম আমরা হলাম উহার মুসল্লি। এ মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অথচ আমরা অবহেলা করতেছি। শ্রষ্টার সমীপে এ অবহেলার হিসাব অবশ্যই দিতে হবে। মনে করুন, একজন লোক বা ইমাম ছাহেব কোন ব্যক্তিকে অন্ধকার রাত্রিতে টাকা কর্জদিল। ঋনগ্রহীতা পরে তাহা অস্বীকার করল। ইমাম ছাহেব বিচারকের দরবারে উহার নালীশ পেশ করল, কিন্তু ইমাম কোন সাক্ষী দিতে পারলনা। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধানমতে বিবাদীকে টাকা লয় নাই এমর্মে শপথ করতে হবে। ইমাম সাহেব বললেন মসজিদে গিয়ে শপথ করতে হবে; কিন্তু বিবাদী মসজিদে গিয়ে শপথ করতে অস্বীকার করল। কারণটা বুঝা গেল। বিবাদী ছোট মসজিদে গিয়ে শপথ করতে ভয় পাচ্ছে। সে মনে করছে আল্লাহ আমাকে দেখবে আর আমি আল্লার সামনে কিভাবে মিথ্যা বলব। এখন আসুন ছোট মসজিদের যে রকম, আল্লাহ আছেন তদরূপ এ-বড় মসজিদেও আল্লাহ আছেন। আল্লাহ সবকিছু দেখেন, কিন্তু আল্লাহকে কেহ দেখেন না। এ ইমানটা সকলের মধ্যে বিদ্যমান থাকা চাই। নতুবা মোমেন হওয়া যায় না। মদ খাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, যে রকম ছোট মসজিদে হারাম সেরকম বড় মসজিদে তথা বিশ্ব ভ্রাম্রণ্ডে ও নিষিদ্ধ। এ সবের উপর ইমান না আনিলে ইমানের পূর্ণতা বিধান সম্ভব নয়। এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে এ ছোট মসজিদটি নির্মাণের কারণটা কি ? এমনকি হযরত (দঃ) ও এরশাদ করেছেন

" যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য বেহেস্ত একটি ঘর নির্মাণ করবেন। প্রত্যুত্তরে আমি বলি, এ ছোট মসজিদ হল একটা আদর্শ ট্রেনিং সেন্টার। এটাকে আমি ২নং Point হিসাবে আলোচনা করিতেছি।

(খ) এ ছোট মসজিদ এসে দৈনিক পাঁচ বার এ ভূমণ্ডলে অর্থাৎ বড় মসজিদে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে তার উপযুক্ত শিক্ষা বা ট্রেনিং নিবার জন্য এ ট্রেনিং সেন্টারে খোদার অনুগৃহীতদের ও ছেরাতুল মোস্তাকিমের উপযুক্ত শিক্ষা বিদ্যমান। আল্লাহর দেওয়া কোরানের পবিত্র শিক্ষা এখান থেকে লাভ করতে হবে। যে কোরান আমাদেরকে নৈতিক চারিত্রিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানার্থে এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরান আমাদেরকে দান করেছেন মৌলানা রুমী বলেন –

অর্থাৎ একদা এক ভিক্ষুক মাথার উপর বিরিয়ানীর খাঞ্চা নিয়ে ভিক্ষা করতে বাহির হলে লোকে দেখে বলল, আরে বেওকুফ তোমার মাথার উপর বিরিয়ানীর খাঞ্চা থাকতে তুমি কেন ভিক্ষা চাও ? সেখান থেকে কয়েক লোকমা খেয়ে ফেললেত হয়।

প্রত্যুত্তরে বলল, বসে সে খেয়ালটা আমার ছিল না।

অনুরূপ ভাবে সেই পবিত্র কোরানকে মাথার উপর রেখে বক্ষে ধারণ করে উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমেরিকা, চীন, জাপান ও রাশিয়ার নিকট আমরা ভিক্ষার হাত পেতে রেখেছি। যতদিন আমাদের আত্মা সম্পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে কোরানের প্রতি রুযু না হবে ততদিন আমাদের এ হাতপাতা অবস্থায় রাশিয়ার, আমেরিকার ও চীনের মত দেশের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে হবে।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেটা জানতে পারব ছোট মসজিদে ট্রেনিং নেয়ার সাথে সাথে। মনে করুন ছোট মসজিদে যেমন মিথ্যা বলা, শীরিক করা, ঝগড়া করা, আমানত খেয়ানত করা, আজে বাজে কথা বলা, মদ খাওয়া, দুষ্টামি করা, হারাম, তেমনি পৃথিবীর এই বড় মসজিদেও উহা নিষিদ্ধ। যদি কেহ ছোট মসজিদে মিথ্যা না বলে, মদ পান না করে, গীবত না করে, খারাপ আচরণ না করে, আর এ বড় মসজিদে এসে সমস্ত কিছুর মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সে প্রকৃত মোমেন নয়। সে লোকটি মোনাফেক। সুতরাং বুঝাগেল নামাজে যে কেরাত পড়া হয়, সেখানে যে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির কথা উল্লেখ আছে, ঐগুলি সমাজে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম না করলে তথা গোটা দেশের মধ্যে বাস্তবায়িত না করলে প্রকৃত মোমেন হওয়া যাবে না। এবং আমাদের জীবনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা আসবে না।

উল্লেখিত ব্যাখ্যা হতে পরিস্কার হয়ে গেল যে বর্তমান পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম হল ছোট মসজিদের পরিচালক এবং বড় মসজিদের ইমাম হল রাষ্ট্র প্রধান। আপনারা ছোট মসজিদের ইমাম নির্বাচিত করার সময় যেরূপ নৈতিক উন্নত, মোত্তাকি পরহেজগার, দীনদার ন্যায় পরায়ন ও আরবী এলমে পারদর্শী নির্বাচিত করেন, তেমনি বড় মসজিদের ইমাম তথা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার সময় সেই সব গুণাবলীর প্রতি লক্ষই রাখেন না। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি ? এইখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা এই রাষ্ট্রপতির উপর ফরজ নয় কি ? ছোট মসজিদ পরিচালনা করার জন্য যে রকম গুণাবলী বিশিষ্ট লোকের প্রয়োজন এর চেয়ে বেশী গুণাবলীর প্রয়োজন বড় মসজিদের ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের জন্য। সুতরাং আপনাদের অতীত ভূল ভ্রান্তির প্রতি অবস্থার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ও জীবন বিধান আলকোরানের প্রতি সর্বান্তকরণে ভরসা রেখে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বা অন্যান্য কাজের জিম্মাদারী দেয়ার সময় উল্লেখিত গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

(গ) তৃতীয় Point এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ----

যদি ইমাম সাহেব ভুলকরেন তাহার ভূলকে সংশোধন করার জন্য ঠিক তাহার পিছনে প্রথম কাতারে এমন লোক দাঁড়ায় যাহারা তাহার সমসাময়িক বা আরও বেশী। ঐ সকল ব্যক্তিরা তাহার ভূলের সাথে সাথে লোকমা দিয়া নামাজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন। আর যদি উপযুক্ত মুসল্লিরা লোকমা না দেন ইমামও ভূল করতে থাকেন তাহা হলে নামাজ কাহারো হবে না।

তদরূপ বড় মসজিদের ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের ভূল সংশোধনের জন্য একটি বিরোধী দল থাকা বাঞ্ছনীয়। এই বিরোধী দলই ইসলামের বা রাষ্ট্র প্রধানের ভূল ভ্রান্তি বিবৃতি বা আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করবে। আর যদি সে সংশোধন না হয় ছোট মসজিদের মুসল্লিরা যেরকম ইমাম বরখাস্ত করেন অনুরূপ ভাবে বড় মসজিদের ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানকেও অনাস্তা দিতে পারেন। এটা ইসলামী বিধান। যদি ইমামের ভূল না হয় লোকমার প্রশ্নই আসে না। অনুরূপ রাষ্ট্র প্রধান যদি ঠিকমত রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহা হলে তাহার সমালোচনা করা বা উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। বন্ধুগণ উল্লেখিত গুণাবলীর প্রতি আপনারা যদি লক্ষ্য রাখেন তাহা হলে আমাদের দেশ কল্যাণকর রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র বাই সলামী রাষ্ট্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইহা নিশ্চিত ইহা আমাদের একমাত্র কাম্য।

কারাগার সংস্কারে খতীবে আযমের চিন্তাধারা ঃ

দুনিয়াবী মুসীবতের মধ্যে কারাপ্রথা এমন একটা মুসীবত যার সাথে আখেরাতের চরম শাস্তির স্থান জাহান্নামের তুলনা করা যেতে পারে। যেমন আখেরাতের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, পাপীকে তার সমস্ত আত্মীয়-পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন করত জাহান্নাম নামক ভীষণ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি দুনিয়াবী জাহান্নাম কারা প্রথাও চার দেয়াল দ্বারা স্বাভাবিক দুনিয়া হতে আলাদা করত বিশেষ এক জগতের সৃষ্টি করে বন্দীর নিজস্ব সমস্ত সত্তাকে হরণপূর্বক তার স্ত্রী, পুত্র, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়। অতএব, আখেরাতের জাহান্নাম ও দুনিয়ার কারা প্রথার মধ্যে আমরা একটা সাদৃশ দেখতে পাই। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, আখেরাতে একমাত্র তারাই হবে জাহান্নামী কেবল যারা পাপী বলে পরিগণিত হবে, আর বর্তমান দুনিয়ার কারাগারে বিচার সাপেক্ষে অথবা নানা কারণে অনেক নির্দোষ লোকও সাময়িকভাবে আগমন করে থাকেন। দুনিয়াবী এই কারা প্রথা সমন্ধে আমার কিছু বলার আছে।

সমাজ দেহের মহামারীময় চোর, ডাকাত, খুনী, অত্যাচারী, প্রবঞ্চক ও মদ-জুয়ায়, ব্যভিচারে লিপ্ত দুষ্কৃতিকারীদেরকে মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে কোন পৃথক স্থানে আবদ্ধ রাখবার জন্য যদিও কারাপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এই ধোকার দুনিয়ায় আমরা দেখতে পাই যে, অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠির সামনে ন্যায় ও ইনসাফের আওয়াজ তুলেছেন এবং স্বৈরাচারীদের অন্যায় ও জুলুমের সামনে মাথা নত করেন নি এখন সেই সব নির্দিষ্ট সত্যের দিশারীগণকে কারারুদ্ধ করে নানাভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়। পরশ্রীকাতর হিংসুকদের

ছল-চক্রান্তের শিকার হয়েও বহু নিরপরাধ মানুষ জেলখানায় দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করছে। আবার বিচারকদের অজ্ঞতা, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির কারণে এবং জালেম শাসকদের মনতুষ্টি করে নিজেদের চাকরী রাখা ও উন্নতি সাধন করার কুঅভিপ্রায়ে কত হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ কারাদন্ড ভোগ করছে, এমনকি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

কোরআন হাদীছ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, বহু প্রাচীনকাল হতেই এই কারাপ্রথা চলে আসছে। এই কারাপ্রথা যদিও দুষ্টের দমনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু ছল ও চক্রান্তের দুনিয়ায় তা সমানভাবে শিষ্টের দমনেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহর মাসূম পয়গাম্বর থেকে আরম্ভ করে ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাহিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, গাউস, কুতুব, ওলী, আবদাল এবং বহু সৎ দেশপ্রেমিক- কোন শ্রেণীর মনীষীগণই এই জেল যন্ত্রণা হতে রেহাই পাননি। যেমন – কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের কারাগারে ৭/৮ বৎসরকাল কারাদন্ড ভোগ করেছেন। কোরআনে বর্ণিত আছে :

অর্থাৎ - জুলায়খা বলল, ভবিষ্যতেও যদি ইউসুফ আমার কথামত কাজ না করে (অর্থাৎ আমার কাম পিপাসা নিবারণ না করে) তবে নিশ্চয়ই তাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হবে এবং অপমানিতও হবে। ইউসুফ (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, এই মেয়েলোকেরা যে পাপ কাজের দিকে আমাকে আহবান করছে তা হতে জেলখানাকেই আমি অধিক পছন্দ করি। প্রভূ হে, তুমি যদি এদের ফাঁদ-ফেরেব থেকে আমাকে রক্ষা না কর তবে আমি তাদের দিকে অনুপ্রানিত হয়ে যাব। অনন্তর তাঁর প্রভু তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং ঐ মেয়েলোকদের ফাঁদ ফেরেব থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। অতঃপর তারা নানা অবস্থার প্রতি লক্ষ করে এটাই সিদ্ধান্ত করল যে, ইউসুফ (আঃ) কে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেলখানায় আবদ্ধ করা হোক। (বাস্তবে তা-ই হল) (সূরা ইউসুফ ঃ ৩২-৩৪)

সারকথা, এই স্বার্থান্ধ দুনিয়ায় ভাল-মন্দ, শিষ্ট ও দুষ্ট সকল শ্রেণীর লোকই নির্বিচারে জেল-জুলুমের শিকার হয়ে আসছে। অপরদিকে দেশের জেলখানাসমূহের ভেতর-বাইরে বদ এন্তেজাম ও অব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে শরীর শিহরিয়ে উঠে, অন্তর কেঁপে ওঠে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে শাসকমহলকে দেশের দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের সঙ্গে সঙ্গে আপামায় জনসাধারণের ভালমন্দ সর্বপ্রকারের নাগরিকদের খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারসমূহ আদায় করতে হবে। বিশ্বস্রষ্টা আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ তায়ালারও এটাই চিরন্তন বিধান যে, তাঁর অনুগত মুমিন-মুত্তাকিন বান্দাগণকে যেরূপভাবে এই ধরাধামে তাদের মৌলিক অধিকার প্রদান করে আসছেন তদ্রুপ তাঁর অবাধ্য কাফির পাপাত্মাদেরকেও তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখেননি। অবশ্য তাদের কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি দিবেন আখিরাতে। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

অর্থাৎ-"আমি নাফরমান কাফিরদেরকে দুনিয়ার সামান্য ও সীমাবদ্ধ জীবনে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিষ দিয়ে উপকৃত করব, অতঃপর (তাদের দুনিয়ার পরীক্ষা শেষ করে মৃত্যুর পর) দোযখের শক্ত আযাবের দিকে বাধ্য করে নিয়ে যাব।"

তাজুল আউলিয়া হযরত শায়খ সা'দী (রাঃ) বলেছেন:

অর্থাৎ-এ ধরাপৃষ্ঠটা হল আল্লাহর আম ও ব্যাপক দস্তরখানা। এই অযাচিত দস্তরখানায় দোস্ত ও দোশমন একই বরাবর।

অর্থাৎ- অপরাধ হেতু কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্যপতি : করে না অন্নের দ্বার রুদ্ধ কারো প্রতি।

হযরত রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন :

হে মানব গোষ্ঠি, বিশেষ করে শাসকগোষ্ঠি, তোমরা আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবান্বিত হও। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলেছেন :

আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও, আল্লাহর রঙ থেকে ভাল রঙ কার কাছে আছে? অর্থাৎ কারো কাছে নেই। যে কোন দেশের শাসক মহল প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহরই প্রতিনিধি, যদি তারা তাদের শাসিত অঞ্চলের সমস্ত নাগরিকদের আপন-পর ভেদাভেদ না করে তাদের জীবন যাপনের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রাপ্য মৌলিক অধিকারসমূহ কড়ায় গন্ডায় আদায় করে থাকে। অন্যথা জনসাধারণের উপর জবরদস্তিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে গদী আঁকড়ে থাকার কোন যুক্তি ও অধিকার তাদের নেই। কোরআনে বর্ণিত আছে :

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, হুকুমতের আমানত আমানতদার ব্যক্তিদের হাওলা কর।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে- সরকার জনগণের, জনগণ সরকারের। আঁ হযরত (সাঃ)-এর বিবৃত নিম্নলিখিত হাদীছসমূহ তার জ্বলন্ত প্রমাণ:

তোমাদের সর্বোত্তম শাসক তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাস, তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে এবং যাদেরকে তোমরা দোয়া কর এবং তারা তোমাদেরকে দোয়া করে। আর নিকৃষ্টতম শাসক তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরাও তাদেরকে অভিশাপ কর, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।"

হুজুর (সাঃ) আরও বলেছেন :

"কোন শাসনকর্তা মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণ করার পর যদি তারা দায়িত্ব পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করেন এবং জনগণের খায়ের-খাহী করেন না তবে এরূপ শাসনকর্তা মুসলমানদের সঙ্গে কদাচ বেহেস্তে দাখেল হবে না।"

হুজুর আরও বলেছেন, "আল্লাহর কসম আমরা এরূপ ব্যক্তিকে হুকুমতের কোন পদে অধিষ্ঠিত করি না, যারা এই পদের জন্য দরখাস্ত করবো এর প্রতি লালয়িত আ-হযরত (সাঃ) আরও বলেছেন :

"সাবধান! জেনে রাখো তোমরা প্রত্যেকই রক্ষক ও নিগাহবান। (কিয়ামতের ময়দানে) তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ রক্ষিতের হক আদায় করেছ কিনা তার জ ওয়াবদিহি করতে হবে। এইরূপ রাষ্ট্রপ্রধান দেশের আপামর জনসাধারণের রক্ষক, অতএব শেষ বিচারের দিনে তাকেও তাঁর আশ্রিতদের হক সম্বন্ধে পূর্ণ জওয়াবদিহি করতে হবে।" (বুখারি-মুসলিম)

আঁ হযরত (সাঃ) আরও বলেছেন :

"কোন শাসক মুসলমানদের রক্ষার দায়িত্ব নেয়ার পর যদি তার উক্ত দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত খেয়ানত করে মারা যায় তবে আল্লহ তায়ালা তার জন্য বেহেস্ত হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।" (বুখারী-মুসলিম)

আঁ হযরত (সাঃ) আরও বলেছেন :

"সবচেয়ে খেয়ানতের ব্যবসা হল ঐ ব্যবসা, শাসক তার শাসিতদের মধ্যে যা করে।" (অর্থাৎ- শাসক কর্তৃক শাসিতদের পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা)। (কানযুল উম্মাল)

অন্য এক হাদিছে আছে :

"হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন আঁ হযরত (সাঃ) থেকে একবার হুকুমতের দায়িত্ব নেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তদুওরে হুজুর (সাঃ) জওয়াব দিয়েছিলেন যে, হে আবু বকর, হুকুমত ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার প্রতি আসক্ত নয়; ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে তার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে তা ঝাপটা দিয়ে নিতে চায়। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে (জনগণের পক্ষ থেকে) বলা হয় এটা তোমার হক ও প্রাপ্য; ঐ ব্যক্তির জন্য নয় যে নিজে বলে এটা আমার হক ও প্রাপ্য।"

এর নামই নির্ভেজাল গণতন্ত্র : আমরা বলছিলাম জনগণের ন্যূনতম মানের জীবনযাপনের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। সরকারের এই জিম্মাদারী স্বাধীন ও উন্মুক্ত নাগরিকের বেলায় যেরূপ প্রযোজ্য তার চেয়ে অধিক জিম্মাদারীর দরকার কারারুদ্ধ নাগরিকদের বেলায়। কেননা, এরা কারাগারে স্বাধীনতা বঞ্চিত অবস্থায় এক বিশেষ অবস্থায় বন্দী থাকার কারণে নিজদের স্বাধীন ইচ্ছায় কিছু জোগাড় করে ব্যবহার করতে অক্ষম। দোষী হোক অথবা নির্দোষ হোক তারাও দেশের নাগরিক। তারাও ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এমনও প্রতিনিধি থাকতে পারে যদি কারারুদ্ধ নাগরিকদের ভোট না পেতেন তবে প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ পেতেন না। অতএব, কারারুদ্ধ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুষ্ঠভাবে আদায় করা নির্বাচিত জন

প্রতিনিধিদের উপর ফরজ। সময় সময় কারাগার পর্যবেক্ষণ করে দেখা এবং কারারুদ্ধ লোকজনের কি কি অসুবিধা ও অভাব আছে তা স্বচক্ষে দেখে যাওয়া ও সেসব প্রতিকারের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের বিশ্বাস, মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ব্যবস্থাপনা কার্যকরী করা হলে এই দায়িত্বটি কোনরূপে আদায় হয়ে যাবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাত, রুটি, তরি-তরকারীর ব্যবস্থা করা। পাক প্রণালী আরও উন্নত করা। চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও তাজা হওয়া। পাক করা ভাত, রুটি, মাছ, মাংস এবং তরি-তরকারীর উপর যাতে মাছি ইত্যাদি বসতে না পারে তার কঠোর ব্যবস্থা করা।

পানি : বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। তজ্জন্য গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক কারারুদ্ধ ব্যক্তির দৈনিক গোসল, অজু, হাত-মুখ ধৌত করার ও পেশাব-পায়খানার জরুরী পানির ব্যবস্থা রাখা।

পায়খানা-পেশাবখানা ঃ সর্বপ্রথম এটা জ্ঞাত হওয়া দরকার যে, একমাত্র ইসলাম ধর্মই এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যার সত্য ও সুন্দর বিধিনিষেধ আরোপিত আছে। পেশাব-পায়খানার বেলায় ও এরূপ বিধিনিষেধ রয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

অর্থাৎ- পায়খানা-পেশাব করাকালীন কেবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ দিয়ে বসো না।

কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, অপর কোন জাতির জন্য এরূপ কোন বিধি নিষেধ নেই। যে কোন দিকে বসেই তারা পায়খানা-পেশাব করতে পারে। এমতাবস্থায় জেলখানার পায়খানা-পেশাবখানাগুলো উত্তরমুখী অথবা দক্ষিণমুখী করে নির্মাণ করলে মুসলমানরাও গুনাহ থেকে বেঁচে যায়, অন্য জাতিদেরও কোন অনিষ্ট হয় না।

পায়খানার পর্দাগুলো এরূপভাবে ফিট করা দরকার যাতে করে পায়খানারত লোকের উলঙ্গ সতর-আওরত দেখে দেখে যাতায়াত করতে না হয়। এটা এমন কোন মুশকিল কাজ নয়, যা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করলে করা যায় না। সামান্য সীমাবদ্ধ এলাকায় দু' হাজার/আড়াই হাজার লোক দিবারাত কারারুদ্ধবস্থায় থাকে। কাজেই এই বিজ্ঞানের যুগে কারাগারের পায়খানাগুলো সেনিটারী পদ্ধতিতে নির্মাণ করাই আবশ্যক। যেন পায়খানা-পেশাবের দুর্গন্ধে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি না হয় এবং মশা-মাছির উপদ্রব না বাড়ে।

শিরক ও বিদআতের প্রতিরোধে খতীবে আযমের ধর্মীয় সংস্কার ঃ

কুসংস্কার তথা শিরক ও বিদআত এমন এক সংক্রামক ব্যাধি যার সংস্পর্শে মুসলিম জাতির নিজস্ব স্বত্বা জরাগ্রস্থ হয়ে ঈমানের জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। কুসংস্কার এমন এক পরগাছা যাকে অংকুরে ধ্বংস করে না দিলে প্রশ্রয় পেয়ে মূল গাছকে গ্রাস করে বসে এবং পরগাছার আচ্ছাদনে চাপা পড়ে যায় আসল বৃক্ষের চেহারা। হিন্দু আধিপত্য এদেশ থেকে ঐতিহ্যগত ও ভৌগোলিক কারণে বিদায় নিলে ও তাদের রেখে যাওয়া অনেক রীতি নীতি, রসুমাত, জীবন ধারণ কৌশল মুসলমাণের সমাজ জীবনে ঢুকে পড়ে অবলীলাক্রমে এবং এসব শিরক মিশ্রত বিদআত ইসলামী জীবব ধারায় মৌল কাঠামোর ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। এতে করে সুন্নত তার নিজস্ব রূপ নিয়ে বিকশিত হলে বিদআতের সাথে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

অপরদিকে এক শ্রেণীর ভণ্ডপীর, স্বার্থান্বেষী মৌলভী ও ধর্ম ব্যবসায়ী কায়েমী স্বার্থে অন্ধ হয়ে পীর পূজা, কবর পূজা, ওরশ, কবর পাহারা, চেহলাম, কুলখানি হিন্দুদের অনুকরণে ফাতেহা ইত্যাকার বিদআতী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পীরগিরির আবরণে একটি সামন্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। অযোগ্য হলেও পীরের ছেলেকে পীর হতে হবে এমন রাজতান্ত্রিক ধারণা ও মুসলিম সমাজে বদ্ধমূল হতে শুরু করে। শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের সয়লাবে মুসলমান জনগোষ্ঠি তাওহীদের আলোকোজ্জল পথ হারিয়ে শিরকের চোরাগলিতে পথ হারাবার উপক্রম হয় তখন।

দেশ ও মিল্লাতের এ সন্ধিক্ষণে মুফতীয়ে আজম হযরত মাওলানা ফয়েজুল্লাহ (রহঃ) সংগ্রামী ভূমিকা ও নিরাপোষ মনোভাব নিয়ে ময়দানে এগিয়ে এলেন; সাথে আনলেন তারই হাতে গড়া ছাত্র খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ কে (রহঃ)। নির্ভেজাল তাওহীদ ও রিসালাতী জীবন ধারার পক্ষে জোরদার আন্দোলন শুরু করে দিলেন। সুন্নতের পুনরুজ্জীবনই মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের মোহ থেকে রক্ষা করতে পারে এ কথা প্রমাণ করার জন্য প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা, পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ ও বক্তৃতার আয়োজন এবং বিতর্ক অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে কাওমী মাদ্রাসা।

খতিবে আজম (রহঃ) তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতার মাধ্যমে বিদআতের উৎস- শ্রেণীবিভাগ, বিদআতের প্রভাব, শিরক ও বিদআতের পারস্পরিক সম্পর্ক, সুন্নাত ও বিদআতের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি জনসমক্ষে তুলে ধরেন স্বার্থক ভাবে। সাথে সাথে তাওহীদের স্বরূপ, রিসালাতের আবেদন হাক্কানী ওলামাদের শিরক বিদআত বিরোধী আন্দোলনের চিত্র গণ মানসে প্রোথিত করে যুক্তি ও তথ্য সহকারে।

খতিবে আজমের একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন ঃ

খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) একদা স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি পবিত্র মদীনায় রাসুলুল্লাহর (সঃ) রওজা মোবারকের পার্শ্বে অবস্থান করেছেন এবং লক্ষ্য করেন যে রওজা-ই আতহার এর উপর বেশ কিছু আবর্জনা জমেছে। তিনি নিজ জিহ্বা দিয়ে এসব ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করছিলেন। এ স্বপ্নের বিবরণ তিনি তাঁর মুরশিদ ও উস্তাদ মুফতীয়ে আজম মাওলানা ফয়েজুল্লাহকে (রহঃ) পেশ করলে তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন- "তোমার জবান ও বক্তৃতার মাধ্যমে রাসুলের সুন্নতের উপর স্তূপকৃত বিদআত ও কুসংস্কারের আবর্জনা দূরীভূত হবে।"

মরহুম মুফতী সাহেবের এ ব্যাখ্যা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ফার্সী কবি কত সুন্দরই না বলেছেন –

(১) পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার বোখারী শরীফের দরসে খতিবে আজম নিজে এ ঘটনার বিবরণ দেন ঃ ১৯৬৭। উদ্ধৃতি ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ।

অনেক চেষ্টা করেও খতিবে আজম মোট কতটা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিদের নাম, স্থান, তারিখ, বিষয়বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সব তথ্য পেয়েছি তা নিচে উল্লেখ করা হল। এ ব্যাপারে কারো কাছে প্রামাণিক কোন তথ্য থাকলে তা আমাদের পরিবেশন করলে কৃতার্থ হবো।

মোনাজেরা (সম্মুখ বিতর্ক)

১। খতিবে আজম বনাম জনৈক প্রতিনিধি, খাকসার পার্টি, প্রতিষ্ঠাতা- মাওলানা এনায়েতউল্লাহ মাশরেকী।

স্থান ঃ আকিয়াব ও রেঙ্গুন।

বিষয় ঃ "আল কোরআনের কি অলৌকিক ক্ষমতা (মোজেযা) আছে ?

২। খতিবে আজম বনাম কালা সাইয়েদ (লেবাননী ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান)

স্থান ঃ শাহারবিল সিনিয়ার মাদ্রাসা সংলগ্ন মাঠ, চকরিয়া, কক্সবাজার।

বিষয় ঃ "মিলাদ ও কেয়ামের অপরিহার্যতা।"

৩। খতিবে আজম বনাম মাওলানা আজিজুল হক (রহঃ) শেরে বাংলা)।

স্থান ঃ বৈলছড়ি।

বিষয় ঃ "বিদআতের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ওহাবী পরিভাষার পটভূমি।"

৪। খতিবে আজম বনাম মাওলানা আজিজুল হক (শেরে বাংলা)

স্থান ঃ ফতেয়াবাদ স্কুল ময়দান, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ "মহিলা কর্তৃক মোরগ জবাই এর বৈধতা।"

(১) লেখক কর্তৃক গৃহীত খতিবে আজমের সাক্ষাৎকার, ১৯৮১

(২) সাক্ষাৎকার ঃ হযরত মাওলানা মোজহের আহমদ, রেক্টর হাশেমীয়ে আলীয়া মাদ্রাসা, ১৯৮৮।

(৩) সাক্ষাৎকার ঃ মাওলানা মুফতী এজহার সাহেব, মুহতামিম, লালখান মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ১৯৮৯।

(৪) সাক্ষাৎকার ঃ কারী আহমদুল্লাহ, হাটহাজারী, ১৯৮৯

৫। খতিবে আজম বনাম মাওলানা আজিজুল হক (শেরে বাংলা)

স্থান ঃ মির্জাপুর, মোহরী হাটের উত্তরে

বিষয় ঃ "চিৎকার করে দরুদ পাঠ"।

কমবেশী প্রায় সম্মুখ বিতর্কে হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী খতিবে আজমের সহযোগী হিসেবে থাকতেন।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঃ

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে জেনা ব্যভিচারের, উপকরণ সহজ লভ্য করণের সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) ছিলেন প্রতিবাদ মুখর সব সময়। তিনি জনশক্তিকে আপদ মনে না করে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও পতিত জমি আবাদ করার মাধ্যমে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আনজুমানে তাহাফফুজে ইসলাম ঃ

নেজামে ইসলাম নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনও অব্যাহত রাখেন বিভিন্ন সংগঠন করে তোলার মাধ্যমে। শিরক ও বিদআতের সয়লাব বন্ধ করার লক্ষ্যে খতিবে আজম ও হযরত আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনূস সাহেব চট্টগ্রামে ১৭০, শাহী জামে মসজিদ মার্কেটে আনজুমানে তাহাফফুজে ইসলাম নামে একটি গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠান হতে বাতিল মতবাদের উৎখাত এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনের উপর বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ পত্র প্রকাশ ঃ

নেজামে ইসলাম পার্টি নানাবিধ অনৈসলামিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় দাঁত ভাঙ্গা ও যুক্তি নির্ভর জবাব দান এবং কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঢাকা হতে দৈনিক ও সাপ্তাহিক নাজাত, সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম, সাপ্তাহিক আল-হেলাল, লাহোর হতে সাপ্তাহিক সাউতুল ইসলাম, চট্টগ্রাম হতে দৈনিক জিন্দেগী ও মাসিক আত তাওহীদ প্রকাশ করে। এসব সংবাদ পত্র প্রকাশের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের পেছনে খতিবে আজম মরহুমের চিন্তা ও প্রেরণা ছিল অত্যন্ত ক্রীয়াশীল।

অধিকন্তু ইসলামাবাদস্থ ইসলামী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ডঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক যান্ত্রিক উপায়ে পশু জবেহসহ ইসলাম সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দানের বিরুদ্ধে মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রঃ) তাঁর সংগঠন নেজামে ইসলামের পার্টির মাধ্যমে টেকনাফ থেকে খায়বার পর্যন্ত দূর্বার গণ আন্দোলনের সূচনা করেন।

কাদিয়ানী ফেৎনার মোকাবেলা ঃ

পাঞ্জাবের গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানী নিজকে নবী দাবী করলে সারা দেশে ঘৃণা মিশ্রিত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতদসত্ত্বেও এ ফিৎনা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে অনেক মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের ধূম্রজাল সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে যায়। মুসলিম নামধারী কাদিয়ানীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব মসজিদ, সেন্টার স্থাপন ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান- বিধ্বংসী তৎপরতা জোরদার করে তুলে। অধিকন্তু তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশাসন যন্ত্রের শীর্ষে কাদিয়ানী মতবাদে বিশ্বাসী অনেক ব্যক্তির অধিষ্ঠান ছিল সুদৃঢ়।

তাওহীদ ও রিসালতের মর্যাদা রক্ষায় আপোষহীন সংগ্রামী খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহম্মদ (রহঃ) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দানে অনিচ্ছুক মুসলমান নামধারী কাদিয়ানীদের তৎপরতা নিষিদ্ধ করণ, প্রচার পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত এবং তাদের অমুসলিম ঘোষণা করার দাবীতে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি বিভিন্ন ওয়াজ ও সীরাত মাহফিলে কাদিয়ানীদের নবুয়ত দাবীর অসারতা প্রমাণ করেন জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে।

চট্টগ্রামের পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মাওলানা মুফতী আজিজুল হক (রহঃ) এর উৎসাহে "খতমে নবুয়ত" নামে বাংলা ভাষার একটি তাত্বিক ও যুক্তি নির্ভর গ্রন্থ রচনা করে খতিবে আজম সাহেব কাদিয়ানীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আহবান জানান। এ গ্রন্থে পেশকৃত তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি ও Argument লক্ষ্য করার মত।

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিবাদ ঃ

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে গৃহীত কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন। বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়ে বিবৃতি দিয়ে এ আইনের ইসলাম বিরোধী ধারা সমূহ জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং এ আইন বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

পূর্ব-পাক জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মওলানা ছিদ্দিক আহমদ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী মসজিদের ইমাম ও চিন্তাবিদদের নিকট এক জরুরী আবেদনে বলেন যে, "বিগত ২৬শে নভেম্বর ১৯৬৩ ইং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ভোটের জোরে যে ইসলাম বিরোধী কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইনটি বহাল রাখার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সে বিষয় আপনারা সকলেই অবগত। অথচ এই আইন বহাল রাখায় বিবাহ, তালাক, ইদ্দত ও মীরাস (উত্তরাধিকার) প্রভৃতি ব্যাপারে কোরআন হাদীসের সরাসরি পরিবর্তন করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিগত চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে কোন অমুসলমান সরকার ও ইহা করিতে সাহস করে নাই। সুতরাং দেশের মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম ও চিন্তাবিদগণ পূর্ব-পাক জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির সহিত সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করিয়া দেশ হইতে সকল প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করিবার সংগ্রামে, বিশেষতঃ আল্লার পবিত্র আমানত কোরআন ও উহার আহকামের হেফাযতে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।"

মাওলানা ছাহেব বলেন যে, আমরা আশা করি, ইসলামের এই সঙ্কটময় মূহুর্তে দেশের আলেমগণ তাঁহাদের যাবতীয় ও সঠিক নেতৃত্ব দানে আগাইয়া আসিবেন।"

১৯৬৩ সালের মার্চে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত নেযামে ইসলামী পার্টির প্রাদেশিক উলামা সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে জনাব মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) মুসলিম পারিবারিক আইনের উল্লেখ করে বলেন যে,

"কোরআন ও সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী এই আইনটি জোর করিয়া আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোরআনে বিবাহের জন্য বয়সের কোন পাবন্দী না থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য আইনে মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ১৬ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইসলামের নামে অর্জিত দেশ পাকিস্তানে প্রচলিত আইনে প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত ব্যভিচারের জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই অথচ শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধ বিবাহের জন্য শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। এক দিকে দ্বিতীয় বিবাহের বিরোধীতা করা হয়, অন্য দিকে নারী পুরুষের নৈতিকতা বিরোধী অবৈধ মেলামেশার পথে কোন বাধা নাই।

ভোলা মহকুমা জমিয়তে উলামা ও নেযামে ইসলাম পার্টির উদ্যোগে ১৫ই অক্টোবর ১৯৬৩ ভোলা শহরস্থ খলিফাপট্টি জামে মসজিদে পার্টির সাবেক এম.পি. এ জনাব এডভোকেট শাহ মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জনসমাবেশে খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) মুসলিম পারিবারিক আইনের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করে বলেন ঃ

"এই আইনটি সম্পূর্ণরূপে কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী এবং যেনা ও ব্যভিচারের সহায়ক।

আরবী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রতিহত করার আহ্বান ঃ

প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসার অব্যাবহিত পরে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে আরবী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার এক নির্দেশ জারী করেন। এ নির্দেশ জারী করার সাথে সাথে একটি বিশেষ চিহ্নিত মহল আরবী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালায়। খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে এ মূহুর্তে নিরব থাকতে পারেননি। তিনি বক্তৃতা, বিবৃতি ও সেমিনারের মাধ্যমে আরবী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রতিহত করার জোর আহ্বান জানান। এ চক্রান্তের ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করে তোলার লক্ষ্যে খতিবে আজম একটি মুদ্রিত প্রচার পত্র বিলি করেন দেশ ব্যাপী। এ প্রচার পত্রে খতিবে আজম সহ অন্যান্য স্বাক্ষরকারীগণ হচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুঈনউদ্দিন আহমদ খান, মাওলানা সৈয়দ আবদুল মালেক হালিম ও এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুর রকীব।

নিচে বিবৃতিটি হুবহু উদ্ধৃত হলো ঃ

বেরাদরানে ইসলাম

আচ্ছালামু আলাইকুম,

বাংলাদেশের জনগণের ধ্যান ধারণা, কৃষ্টি ও উত্তরাধিকার ঐতিহ্যে প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান সরকার আরবী ভাষাকে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে বাধ্যতামূলক করার যে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন-গোটা জাতি তাতে আনন্দিত। ইতিপূর্বেও সরকার কর্তৃক খৃষ্টানদের পবিত্র দিন রোববারের পরিবর্তে জুম্মার দিন শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা বাংলাদেশকে গোটা মুসলিম বিশ্বে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছে। এ দু'টোই ছিল এদেশের জনগণের প্রাণের প্রত্যাশিত দাবী।

কিন্তু বিশ্বের ১০০ কোটি মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা আরবীকে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে দেশীয় ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নুতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিভিন্ন উপায়ে বিশেষতঃ স্বাক্ষর সংগ্রহ ও বিবৃতির মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্তকে বাতিল করার দাবী তুলছেন এ অজুহাতে "কোমলমতি শিশুরা দু'টি বিদেশী ভাষার চাপ সহ্য করতে পারবে না"। এ চক্রান্তের নেপথ্যে কাদের কালোহাত সক্রিয় আমরা তা জানি। তাদের পরিচয় ও অতীত কার্যকলাপ দেশবাসীর কাছে অস্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, যুগ যুগ ধরে মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীকে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে বাধ্যতামূলকভাবে কচি-কাঁচাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- তখন বিদেশী ভাষার চাপ সহ্য করতে পারবে না এ প্রশ্ন উঠেনি। আরবীকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ঐ চিহ্নিত চক্র হুংকার ছাড়ছেন বিদেশী ভাষার চাপ অসহ্য বলে। অথচ আবহমান কাল ধরে মক্তব ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাঁদমণিদের আরবী শিক্ষা দেওয়ার

পদ্ধতি চালু রয়েছে। যে ছেলেটি ভোর বেলা ঐচ্ছিকভাবে আরবী শিখে দুপুর বেলা স্কুলে গিয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে ইংরেজী শিখে বাংলার পাশাপাশি এতে বুঝা যায় এ দেশের শিশুরা আগে থেকেই তিনটি ভাষার সাথে পরিচিত। বর্তমান সরকার শুধু ঐচ্ছিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করছেন। আসলে আরবী বৈরীতার পিছনে বিদেশী ভাষার চাপ নয় বরং এদেশের শিশুরা আরবীর মাধ্যমে যদি আল্লাহর রাসুল আখেরাতসহ মৌলিক বিধান গুলোর সাথে পরিচিত হয়ে পড়ে তাহলে পরবর্তী সময়ে তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, বিবর্তনবাদী ও মাকসপন্থী বানানো যাবে না। এ সঙ্গত ভয়ে তারা আতংকগ্রস্থ।

বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ জন মুসলমান। ইসলাম এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্ম। বাংলাদেশসহ বিশ্বের (দশ) কোটি মুসলমানের ভাষা আরবী। এ ভাষাতেই কালেমা শরীফ শুনে, উচ্চারণ ও হৃদয়ঙ্গম করে মুসলমানদের জন্ম ও মৃত্যু বরণ করতে হয়। আল-কোরআন ও আল-হাদিসের ভাষা আরবী। ইসলামের যাবতীয় আরকান-আহকাম এ ভাষাতেই পালন করতে হয় এবং পরকালে এ ভাষাতেই আল্লাহ পাকের সাথে প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হবে। আরবী মুসলমানদের পিতৃভাষা।

উদ্ভুত এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা দেশের ওলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, ব্যবহারজীবি ও সর্বস্তরের গণমানুষের নিকট আবেদন জানাচ্ছি আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন। সাথে সাথে বর্তমান সরকারের প্রতিও আবেদন জানাচ্ছি যেন চাপের মুখে ঘোষিত সিদ্ধান্ত থেকে পিছু না হটেন। সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে, গুটি কতক এলাকায় এ ব্যাপারে জনমত যাচাই করা হবে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, গুটি কতক এলাকায় বাংলাদেশ নয়; যদি জনমত যাচাই এর প্রশ্ন উঠে তা হলে চারশতাধিক থানায় জরীপ চালাতে হবে।

বিভিন্ন উপায়ে জনমত সৃষ্টি করে বিবৃতি, টেলিগ্রাম, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে যে, এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি পিতৃভাষা আরবীকে বাধ্যতামূলক করার সুদৃঢ় পদক্ষেপ চায়।

মহান আল্লাহ মুসলমানদের সহায় হউন। আমিন

সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ফতওয়া ঃ

১৯৭০ সালে হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আহলে সুন্নাত, দেওবন্দী, ব্রেলভী, আহলে হাদীস, শিয়া ইসনা আশারিয়া সহ বিভিন্ন মতের ২৩১ জন শীর্ষ স্থানীয় বিশিষ্ট আলেমগণের সাথে এক যুক্ত ফতওয়া প্রদান করেন। এ

ফতওয়ার মাধ্যমে ওলামাগণ ইসলাম ও পাকিস্তানের পক্ষে সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে সবচাইতে বড় বিপদ ও ফিৎনা আখ্যায়িত করেন এবং এ সবের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ বলে ঘোষণা দেন। ঐতিহাসিক এ ফতওয়ায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সে সব দল সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে খাঁটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাঁরা সবাই জিহাদে লিপ্ত এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা ও ভোট দেয়া শরীয়ত মতে জিহাদের পর্যায়ভূক্ত।

ফতওয়ায় স্বাক্ষরকারী ওলামাদের মতে সমাজতন্ত্রের (Communism) দাবীদার দলগুলো কোরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামের বিদ্রোহী। তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কুফরের সহযোগিতারই নামান্তর ও কঠোর ভাবে হারাম। তদ্রুপ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের প্রচারক দলগুলোর সাহায্য সহযোগিতা করা ও নাজায়েজ ও গুণাহ।

এ ফতওয়ার পূর্ণ বিবরণ ও স্বাক্ষরকারী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আলেম গণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

এখানে উল্লেখ্য যে, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার শেখ আবদুল আজিজ ইবনে বাজ, মদীনার কাজী, কা'বা শরীফের ইসলাম সহ পবিত্র মক্কা ও মদীনার ৪৩ জন বিশিষ্ট আলেম ও অনুরূপ ফতওয়া জারী করেছিলেন।

ফতওয়ায় স্বাক্ষরকারী ওলামাদের মধ্যে হযরত খতিবে আজমের মতো অনেকেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে আরেকটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ নামে কিন্তু পুঁজিবাদের অভিশাপ, সমাজতন্ত্রের চোখ ধাঁধাঁনো শ্লোগান, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ধুয়া ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা এখনো খায়বার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিশাল - এ দু'টি ভূখণ্ডে ভয়াবহ ফিৎনা ও বিপদরূপে সমানভাবে বিরাজিত। তাই ঐতিহাসিক এ ফতওয়ার আবেদন শাশ্বত ও চিরস্থায়ী।

ফতওয়া

প্রশ্ন ঃ

বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিশেষতঃ পাকিস্তান যে সব কুফরী মতবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তা কোন ওয়াকেফহাল ব্যক্তির অজানা নয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলির কার্যধারা পর্যালোচনা করলে তাদিগকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ কতিপয় দল পাকিস্তানে ইসলাম এবং নির্ভেজাল ইসলামী আইন প্রচলন করার ন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মেনিফেষ্টোতেও কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাদের প্রচেষ্টা এবং কার্যধারাও ইসলামী মূলনীতির অনুকূলে।

দ্বিতীয়ত ঃ এমন কিছু সংখ্যক দলও রয়েছে যারা আল্লাহর অস্তিত্বে, রসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসী নয়। যেমন কম্যুনিষ্ট পার্টি। কিন্তু পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এ দলটি নিষিদ্ধ হওয়ার পর হতে পার্টি সদস্যরা অন্য নামের ছদ্ম বরণে কয়েকটি সমাজতন্ত্রী দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তারা পাকিস্তানের আদর্শ ইসলাম এবং কোরআন ও সুন্নাহর উপর বিশ্বাস রাখে না, তাদের দলীয় মেনিফেষ্টোতেও এ সবের কোন উল্লেখ নাই। স্বকল্পিত মতাদর্শ হওয়ার দরুন কার্যতঃ তাদের কাছে অবৈধ বলে কোন জিনিসই নেই।

তৃতীয়ত ঃ যে সব দল পাকিস্তানের আদর্শ ইসলাম এবং কোরআন ও সুন্নাহর সহিত সম্পর্ক রাখে না, তাদের মধ্যে ন্যাশনালিজম অর্থাৎ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাগণ অন্যতম। তারা ভাষার দিক দিয়ে হিন্দু সাহিত্যের ভাবধারা ও হিন্দু সংস্কৃতিকে ইসলামী সাহিত্য ও তাহযীবের মোকাবেলায় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং দেশীয় হিন্দুদেরকে বিদেশী মুসলমানদের উপর প্রাধান্য দেয়। তারা ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্রের স্থলে স্বকপোলকল্পিত ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র প্রচলন করার প্রয়াসী।

চতুর্থত ঃ কতিপয় দল নিজেদের দলীয় মেনিফেষ্টোতে কোরআন ও সুন্নাহর স্বীকৃতি দেয় বটে, কিন্তু তারা সমাজতন্ত্রবাদী ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদীদের প্রবক্তাদের সহিত মিলিয়ে মিশিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে, ঐক্য-চুক্তি করে। এই সকল দলে কিছু সংখ্যক আলেমও রয়েছেন।

এ অবস্থায় উক্ত চারি শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের সদস্যভূক্ত হওয়া, তাদের মতাদর্শ প্রচার করা, তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করা, তাদেরকে আর্থিক সাহায্য, চাঁদা ইত্যাদি দেওয়া কিংবা ভোট দিয়া তাদেরকে সাহায্য করা - শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিরূপ ? এ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেম সমাজের অভিমত কি ?

বর্তমানে ইসলাম ও পাকিস্তানের পক্ষে সমাজতন্ত্রের চাইতে বড় বিপদ আর একটিও নাই। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই আপন আপন সাধ্যানুযায়ী উক্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরয। অত্যন্ত আফসোসের বিষয় নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা নিজেদেরকে সুসংগঠিত করে নিয়েছে- পক্ষান্তরে ইসলামপ্রিয় দলগুলি পারস্পরিক দলীয় কোন্দলে জর্জরিত হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে এমন একটি দলও নেই যাহা এককভাবে ইসলাম বিরুদ্ধ দলগুলির মোকাবেলা করার শক্তি রাখে।

তাই আজ ইসলাম ও পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সকল কলেমা উচ্চারণকারী, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রবক্তা ও উদ্যোগী দলগুলির পক্ষে এ মহান উদ্দেশ্য হাছিলের নিমিত্ত যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। আর এর দ্বারাই ইসলামপ্রিয় জনগণের ভোট বিভক্ত হওয়ার সুযোগ হবে না।

যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে সেগুলির আলোচনা দরস ও ফতওয়া (একাডেমিক) পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। ঐ সমস্তকে প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভের পথে প্রতিবন্ধক হতে দেওয়া উচিত নয়। নির্বাচনে এমন প্রতিনিধিকে জয়যুক্ত করার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো একান্ত দরকার, যাঁরা দেশে ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং পুরাপুরিভাবে ইসলামী বিধান প্রচলন করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়া যাবেন। আর এভাবে তাঁরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জঘন্যতম বিষফল- যা সুদ, ঘুষ, জুয়া, শোষণ, দরিদ্রের উপর নির্যাতন, মদ, উলঙ্গতা, নির্লজ্জতা, অন্যায়, অবিচার, অন্যায়ভাবে মাল গুদামজাতকরণ ইত্যাদি হতে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেশে ন্যায়-ভিত্তিক অর্থনৈতিক সমতা আনয়নে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্টা চালাবেন, আর অন্যদিকে যে সমস্ত লোক সমাজতান্ত্রিক মূলনীতি, শ্রেণী-সংগ্রামের প্রসার, লুটতরাজ ও খুন-খারাবীর উস্কানি দান এবং ব্যক্তি-মালিকানার বিরুদ্ধে ও জোরপূর্বক জাতীয়করণের সপক্ষে প্রচার করে বেড়ায়- এদের ইসলামী শ্লোগানের ধোকায় তাঁরা পড়বেন না, তাদের ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতাও সহ্য করবেন না। কেননা ঐ সমস্ত কার্যক্রম ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করারই নামান্তর। সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী আজ যদি ব্যক্তি মালিকানা না থাকে তবে কোরআনে করীমের অর্ধাংশেরই কোন কার্যকারিতা থাকবে না। সাধারণভাবে ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা মানেই কোরআনে করীমকে অস্বীকার করা।

প্রশ্নে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী যে চার প্রকার দলের কাথা উল্লেখ করা হয়েছে এদের প্রথমোক্ত দলটিও আমাদের তাহকীক অনুযায়ী দুই প্রকারের (১) যে সমস্ত দলের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা দ্বীনদার পরহেজগার ওলামায়ে কেরামের হাতে। (২) যাদের নেতৃত্ব ওলামায়ে কেরামের হাতে নেই। সাহায্য -সহযোগিতার ব্যাপারে প্রথম প্রকারের দলের ফযীলত ও অগ্রাধিকার হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক দল যারা কম্যুনিজম এবং সমাজতন্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখে, পরিস্কারভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর সন্দেহ প্রকাশ করে অথবা কোরআনে করীমকে কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, সাধারণভাবে ব্যক্তি মালিকানা মাত্রকেই জুলুম বলে অ্যাখ্যা দেয়, এ বিরুদ্ধে লুটতরাজ চালিয়ে অন্যের বিষয়-সম্পতি জবরদস্তি করে হরণ করাকে বৈধ বলে মনে করে, নিঃসন্দেহে তারা কোরআন -সুন্নাহ ও ইসলামদ্রোহী, এরা কখনও মুসলমান হতে পারে না- যদিও তারা কলেমা উচ্চারণ করে, নামায রোযা পালন করে। তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হলে কাজ করা অথবা তাদিগকে সাহায্য-

সহযোগিতা করা ইসলাম ধর্মকে বিধ্বস্ত করারই নামান্তর। তাই তাদের কাজে শরীক হওয়া, সাহায্য সহযোগিতা করা বা ভোট দেওয়া কুফরের সাহায্য বলে গন্য হবে। তা সম্পূর্ণ হারাম।

তৃতীয় প্রকার রাজনৈতিক দল যারা ইসলামী মূলনীতি কোরআন ও সুন্নাহর স্বীকৃতি দেয় না, পরিস্কারভাবে অস্বীকার করে না, যারা পাকিস্তানে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচলন করার অভিলাষী, যারা পাকিস্তানের আদর্শের বিপরীতে আঞ্চলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশীয় হিন্দুদেরকে অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, হিন্দু সাহিত্যিক ও কবিদের গীতালী গায় এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে- তারাও সন্দেহাতীতভাবে গুমরাহ ভ্রান্ত আর পাকিস্তানের আদর্শবাদের বিরোধী। তাদের সঙ্গে কাজ করা, তাদেরকে চাঁদা দেওয়া এবং ভোট দিয়া সাহায্য করা পাকিস্তান ধ্বংসের নামান্তর আর নাজায়েয ও গোনাহ হবে।

প্রশ্নে উল্লেখিত চতুর্থ প্রকারে রাজনৈতিক দল যারা, তারা তাদের মেনিফেষ্টোতে কোরআন ও সুন্নাহকে মূলভিত্তি বলে স্বীকার করে এবং দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী করে থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা এমনসব সমাজতন্ত্রীবাদের সাথে ঐক্যচুক্তি সম্পাদন করেছে - যাদের ইসলাম বিরুদ্ধ তৎপরতা ইতিপূর্বেই জাতির সম্মুখে পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে এবং যারা তাদের মেনিফেষ্টোতে এখনও বুনিয়াদীভাবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করে অন্ততঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করের লয়েছে এবং যাদের সুসংগঠিত শক্তি ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসাবে বিরাজমান। এমতাবস্থায় তাদের সঙ্গে ঐক্যচুক্তি করা তাদের বাতেল মতবাদের শক্তি যোগাইবে, সহায়ক হবে এবং দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল কারণ বলে পরিগণিত হবে। তাদের সঙ্গে ওলামায়ে কেরামদের মেলামেশা সাধারণ মানুষের মন হইতে উক্ত কুফরী ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ লাঘবে সহায়ক হবে, ভিতর হতে ইসলামী শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার এবং সরলপ্রাণ মুসলমানগণকে নিজেদের জালে আবদ্ধ করার সুবর্ণ সুযোগ হবে।

এহেন সমাজতন্ত্রীদের সহিত যাঁরা মেলামেশা করেন তাঁদের যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, কিন্তু ইহা কখনও কোন কাজের গানিতিক ও স্বাভাবিক পরিণতিকে বদলাতে পারে না। তাই উক্ত ধর্মীয় মহলের সাহায্য সহযোগিতায় ঐ সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠিই সম্পূর্ণভাবে লাভবান হবে। তাহাদেরকেও চাঁদা অথবা ভোট দেওয়া সরাসরি সমাজতন্ত্রীদেরকেই ভোট অথবা চাঁদা দেওয়ার নামান্তর হবে।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট ওলামার দস্তখত ঃ

১। শায়খুল ইসলাম মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, আমীরে আ'লা নিখিল পাকিস্তান মারকাযী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টি। ২। পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মওলানা মোঃ শফী, করাচী। ৩। মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী, করাচী। ৪।

মুফতী আবুল বারাকাত কাদেরী, লাহোর। ৫। মাওলানা আবদুল গফুর হাজারভী, সভাপতি, মারকাযী জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান, ওয়াজিরাবাদ। ৬। মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী ছিদ্দীকী, করাচী। ৭। মুফতী জা'ফর হুসাইনী, শিয়া মুজতাহিদ গুজরানওয়ালা। ৮। আল্লামা সৈয়দ ইবনে হাসান জারচুয়ী, শিয়া মুজতাহিদ, শিক্ষক, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়। ৯। আল্লামা সৈয়দ মোঃ দেহলভী, করাচী। ১০। মাওলানা হাফেজ মোঃ গোন্ধেলভী, সভাপতি, জমিয়তে আহলে হাদীস, গুজরানাওয়ালা। ১১। মাওলানা মোঃ ইউসুফ কলকাত্তাভী, করাচী। ১২। মাওলানা আবদুল গফফার সালাফী, করাচী। ১৩। মাওলানা মোঃ ইদ্রীস কান্ধেলভী, লাহোর। ১৪। মুফতী জমিল আহমদ থানভী, লাহোর। ১৫। মাওলানা মুনতাকাবুল হক, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৬। মাওঃ বাদশাহ গুল বোখারী, আকোড়া খটক, পেশাওয়ার। ১৭। মাওলানা মোঃ ইসমাঈল, উতমানজঈ, পেশাওয়ার। ১৮। মাওলানা এনায়েতুল্লাহ শাহ বোখারী, গুজরাত। ১৯। মাওঃ আবদুল লতীফ, ঠাট্টা, সিন্ধু। ২০। মাওঃ মোঃ ইসমাঈল আল-উদী, শিকারপুর। ২১। মাওঃ খলীলুল্লাহ, সক্কর। ২২। মাওঃ মোঃ শফী ওকারভী, করাচী। ২৩। মাওঃ সৈয়দ মাহমুদ আহমদ রিজভী, লাহোর। ২৪। মাওঃ সৈয়দ আবদুল জব্বার, করাচী। ২৫। মুফতী আবদুল খালেক রহমানী, জমায়াতে আহলে হাদীস, করাচী। ২৬। মাওঃ মোঃ মতীন খতীব, করাচী। ২৭। মাওঃ আবুল হাসান কাসেমী, মুলতান। ২৮। মাওলানা ফজলে এলাহী উতমানজঈ, পেশাওয়ার। ২৯। মাওঃ রুহুল্লাহ, উতমানজঈ। ৩০। মাওলানা মোঃ নজীর, উতমানজঈ। ৩১। মাওঃ নুরুল হক নূর, পেশাওয়ার। ৩২। মাওঃ মোঃ আহমদ থানভী, সক্কর, সিন্ধু। ৩৩। মাওঃ আবদুল হাদী, চরসাদ্দা, পেশাওয়ার। ৩৪। মাওঃ আবদুর রশীদ রব্বানী, ঝিলাম। ৩৫। মাওঃ গোলাম নবী, ঝিলাম। ৩৬। মাওঃ আবদুল গফুর, ঝিলাম। ৩৭। মাওলানা মোঃ বখশ মুসলিম, লাহোর। ৩৮। মুফতী মোহাম্মদ হুসাইনী নঈমী, লাহোর। ৩৯। মাওঃ আবদুর রহমান, লাহোর। ৪০। মাওঃ ওবায়দুল্লাহ, লাহোর। ৪১। মুফতী রশীদ আহমদ, করাচী। ৪২। মাওলানা মোঃ মালেক কান্ধেলভী, টেণ্ডুআলাইয়ার। ৪৩। মুফতী মোহাম্মদ ওয়াজীহ, টেণ্ডুআলাইয়ার। ৪৪। মাওঃ মুশাররফ আলী, থানবী লাহোর। ৪৫। মাওঃ ওয়াকীল আহমদ শেরওয়ানী, লাহোর। ৪৬। মাওলানা মকবুলুর রহমান, লাহোর। ৪৭। মাওঃ আবদুল শকুর তিরমিযী, সারগোধা। ৪৮। মাওঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ শাহ। ৪৯। মাওঃ আবদুল মজীদ, পেশাওয়ার। ৫০। মাওঃ মুসাররাত শাহেদ, কাকাখেল, মর্দান। ৫১। মাওঃ শের মোহাম্মদ, পেশাওয়ার। ৫২। মাওলানা সৈয়দ মীর আলম শাহ কোহাট। ৫৩। মাওঃ শের ওলী, দররা আদমলখেল, কোহাট। ৫৪। মাওঃ সৈয়দ মুবারক শাহ,ত পেশাওয়ার। ৫৫। মুফতী মোঃ গজন, পেশাওয়ার। ৫৬। মাওঃ মোঃ হাসান জান, উতমানজঈ। ৫৭। মাওঃ রহমানুদ্দীন, চরসাদ্দা। ৫৮। মওঃ মোঃ ওয়াসীম, বান্নু। ৫৯। মওঃ আবদুল লতীফ, বান্নু। ৬০। মাওলানা আবদুল হামীদ, বান্নু। ৬১। মাওঃ গোলাম নবী, দররা আদমখেল, কোহাট। ৬২। কাযী হাবিবুর রহমান, গঞ্জলবিলা। ৬৩। মাওলাানা সলীমুল্লাহ, করাচী। ৬৪। মাওঃ সৈয়দ জিয়াউল্লাহ শাহ বোখারী, গুজরাত। ৬৫। মুফতী ইত্তেদার আহমদ খান, গুজরাত। ৬৬। মাওঃ মোঃ আবদুল্লাহ, লায়ালপুর। ৬৭। মাওলানা মোঃ ইসহাক, লায়ালপুর। ৬৮। মাওঃ আবদুল ওয়াহেদ, লায়ালপুর। ৬৯। মাওঃ আবদুল মজীদ বি-এ

(নাবীনা), লায়ালপুর। ৭০। মাওঃ শামসুর রহমান আফগানী, লায়ালপুর। ৭১। মাওঃ ফজল আহমদ রাযা, লায়ালপুর। ৭২। মওঃ আঃ মোস্তফা গাজী। ৭৩। মাওঃ ফজল আহমদ রাযা, লায়ালপুর। ৭৪। মাওঃ মোঃ আমীর, সারগোধা। ৭৫। মাওঃ মোঃ হুসাইন, সারগোধা। ৭৬। মাওঃ মোঃ ইব্রাহীম, সারগোধা। ৭৭। মুজতাহিদ মোঃ হুসাইন, সারগোধা। ৭৮। মাওঃ আবদুল হক ছিদ্দীকী, সাহীওয়াল। ৭৯। মাওঃ ওয়ালীউল্লাহ (মিয়ানওয়ালী) গুজরাত। ৮০। মাওঃ মোঃ তাইয়েব, গুজরাত। ৮১। মাওঃ মোঃ আইয়ুব, গুজরানওয়ালা। ৮২। মাওঃ শামসুদ্দীন, গুজরানওয়ালা। ৮৩। মাওঃ মোঃ রফী ওসমানী, করাচী। ৮৪। মাওঃ মোঃ তকী ওসমানী, সম্পাদক, 'আল বালাগ', করাচী। ৮৫। মাওঃ শামসুল হক, করাচী। ৮৬। মাওলানা আবদুল কাদের, করাচী। ৮৭। মাওলানা আকবর আলী, করাচী। ৮৮। মাওলানা ইফতেখার আহমদ আজমী, করাচী। ৮৯। মাওঃ আবদুল জাহের আফগানী। ৯০। মাওলানা আজীজুর রহমান সোয়াতী। ৯১। মাওলানা আবদুল গফুর লশকরজঈ। ৯২। মাওলানা আবদুছ ছামাদ করীমজঈ (বালুচ), করাচী। ৯৩। মাওলানা মিয়া গুল, মর্দান। ৯৪। মাওলানা আবদুর রশীদ (বালুচ), করাচী। ৯৫। মাওলানা সাআদাত হুসাইন। ৯৬। মাওলানা আবদুল হক সোয়াতী। ৯৭। মাওলানা মোহাম্মদ আহমদ। ৯৮। মাওঃ বশীর আহমদ কাশ্মীরী, করাচী। ৯৯। মাওঃ মোঃ ইসহাক, করাচী। ১০০। মাওঃ আবদুল মান্নান ফরিদপুরী, করাচী। ১০১। মাওঃ আবদুল আহাদ, লাহোর। ১০২। মাওঃ শাহনওয়াজ সিদ্ধী, কোরাঙ্গী, করাচী। ১০৩। মাওঃ মাহমুদ আহমদ, ঝিলাম। ১০৪। মাওঃ মোঃ মা'রূপ বরনী, করাচী। ১০৫। মাওঃ আহমদ আলী ফারুকী, করাচী। ১০৬। মাওঃ মোহাম্মদ ইয়াসীন, করাচী। ১০৭। মাওঃ ওবায়দুল্লাহ, করাচী। ১০৮। মাওঃ আবদুল্লাহ টোঙ্কী, করাচী। ১০৯। মাওঃ কাযী সাঈদ নূর খান, করাচী। ১১০। মাওঃ আবদুল্লাহ নঈমী মাকরানী, মালীর, করাচী। ১১১। মাওঃ ওয়ালী মোহাম্মদ মীরপুর পাঠোরা, ঠাট্টা। ১১২। মুফতী মোঃ খলীল কাদেরী, হায়দারাবাদ। ১১৩। মাওঃ মোঃ নাজেম নদভী, সাবেক ওস্তাদ, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়। ১১৪। মাওঃ গোলাম আলী নকশবন্দী, ঠাট্টা। ১১৫। মুফতী মীর মোহাম্মদ জাতোয়ী, জাতী হায়দরাবাদ। ১১৬। মাওলানা মোঃ ইউসুফ, সাজাওয়াল, ঠাট্টা। ১১৭। মাওলানা মোঃ ইউসুফ বোলারী, দাদু। ১১৮। মাওঃ আবদুর রহমান জামালী, সিন্ধু। ১১৯। মাওঃ আবদুল্লাহ চোহড় জামালী। ১২০। মাওঃ মোহাম্মদ আমীন, চোহড় জামালী। ১২১। মাওঃ মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আমীনপুর, লায়ালপুর। ১২২। মাওঃ আবদুল্লাহ, গুজরানওয়ালা। ১২৩। মাওঃ আবুদল্লাহ, সাজাওয়াল। ১২৪। মাওলানা আজম হাশেমী, করাচী। ১২৫। মাওঃ লুৎফুল হক বোখারী, এম-এ, করাচী। ১২৬। মাওঃ আবদুল ওয়াহেদ সোবহানী, রহীম ইয়ারখান। ১২৭। মাওঃ মোঃ জা'ফর, লারকানা। ১২৮। মাওঃ মোঃ ছিদ্দিক, লারকানা। ১২৯। মাওঃ কামরুদ্দীন, লারকানা। ১৩০। মোহাম্মদ ছিদ্দিক জাতোয়ী, লারকানা। ১৩১। মাওঃ আবদুর রহমান, রারকানা। ১৩২। মওঃ ইনামুদ্দীন, লারকানা। ১৩৩। মওঃ আবদুর রসূল, লারকানা। ১৩৪। মাওঃ মোঃ আহমদ খোখর, লারকানা। ১৩৫। মাওঃ খায়র মোহাম্মদ, অধ্যাপক কর্মার্স কলেজ, লারকানা। ১৩৬। মাওঃ আবদুল কাদের, কলহোড়া। ১৩৭। মাওঃ মীর মোহাম্মদ লাশারী, কণ্ডকোট, জেকোবাবাদ। ১৩৮। মওঃ মোঃ এ'তেবার, ওস্তা মোহাম্মদ। ১৩৯। মাওঃ মোহাম্মদ হাসান, জোকোবাবাদ।

১৪০। মাওঃ কামালুদ্দীন, জেকোবাবাদ। ১৪১। মাওঃ আবদুল হক, জেকোবাবাদ। ১৪২। মাওঃ ওয়াহেদ বখশ, জেকোবাবাদ। ১৪৩। মাওঃ আবদুল মজিদ, শিকারপুর, সক্কর। ১৪৪। মাওঃ মাজহারুদ্দীন, শিকারপুর। ১৪৫। মাওঃ নেছার আহমদ, শিকারপুর। ১৪৬। শাইখুল কোরা কারী ফতেহ মোহাম্মদ পানীপতী, করাচী। ১৪৭। মাওঃ আবদুর রহমান, ঠাট্টা, সিন্ধু। ১৪৮। মাওঃ আবদুল হক আছর কাশ্মীরী, করাচী। ১৪৯। মাওঃ জমীর আলী সাম্ভলী, করাচী।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমগণের দস্তখত ঃ

১৫০৯ মাওঃ আতহার আলী, কার্যকরী সভাপতি, নিখিল পাকিস্তান মারকাযী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টি, কিশোরগঞ্জ। ১৫১। মাওঃ ছিদ্দীক আহমদ, সভাপতি, পূর্ব-পাক জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টি। ১৫২। মাওঃ আবদুল ওয়াহহাব, (পীরজী হুজুর), বড় কাটরা, ঢাকা। ১৫৩। মাওঃ হাফেজ মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর), লালবাগ, ঢাকা। ১৫৪। মাওঃ মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান, ঢাকা। ১৫৫। মাওঃ আবদুল ওয়াহ্ হাব, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। ১৫৬। মাওঃ আশরাফ আলী (ধরমণ্ডলী), সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি, ১৫৭। মাওঃ সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা মাদানী সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি। ১৫৮। মাওঃ মোঃ ইসহাক, চরমোনাইয়ের পীর ছাহেব, বরিশাল। ১৫৯। আলহাজ্ব মাওঃ মোঃ ইউনুস, পটিয়া, চট্টগ্রাম। ১৬০। মাওলানা আজীজুল হক, মোহাদ্দেস, ঢাকা। ১৬১। মাওঃ আবদুল মজীদ, মোহাদ্দেস, ঢাকা। ১৬২। মাওঃ বজলুর রহমান, ফরিদাবাদ, ঢাকা। ১৬৩। মাওঃ আমীনুল ইসলাম, সেক্রেটারী, ঢাকা সিটি নেজামে ইসলাম পার্টি। ১৬৪। মাওঃ আবদুল আজীজ, ঢাকা। ১৬৫। মাওঃ নুরুল হক কাসেমী, ঢাকা। ১৬৬। মাওঃ মুনতাছির আহমদ রহমানী, ঢাকা। ১৬৭। মাওঃ মাজাহের ইসলাম, ঢাকা। ১৬৮। মাও হাফেজ আজীজুল ইসলাম, ঢাকা। ১৬৯। মাওলানা আবদুর রহমান ফরিদী, ঢাকা। ১৭০। মাওঃ মুফতী মুহিউদ্দীন, বড়কাটরা, ঢাকা। ১৭১। মাওলানা মোঃ হাতেম, পরমেশ্বরী। ১৭২। মাওলানা আবদুল বারী, ঢাকা। ১৭৩। মাওলানা মোঃ হারুন, চট্টগ্রাম। ১৭৪। মাওলানা হাফেজ মীর আহমদ, চট্টগ্রাম। ১৭৫। আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মোঃ মাছুম, ঢাকা। ১৭৬। মাওঃ আবদুল হক, জিরি, চট্টগ্রাম। ১৭৭। মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ, জিরি। ১৭৮। মাওঃ শওকত আলী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। ১৭৯। মাওঃ মুফতী আবদুর রহমান, পটিয়া, চট্টগ্রাম। ১৮০। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ ইউনুফ, কৈয়গ্রাম, চট্টগ্রাম। ১৮১। মাওলানা ইকরামুল হক, সন্দ্বীপ। ১৮২। মাওঃ হাশমতুল্লাহ, লাকসাম, কুমিল্লা। ১৮৩। মাওলানা বেলায়েত হুসাইন, কুমিল্লা। ১৮৪। মাওলানা আলী আশরাফ, কুমিল্লা। ১৮৫। মাওলানা মুজিবুর রহমান, বরুড়া, কুমিল্লা। ১৮৬। মাওলানা আবু তাহের, আখাউড়া, কুমিল্লা। ১৮৭। মাওলানা আবদুস সালাম, লক্ষ্মীপুরী। ১৮৮। মাওলানা আহমদুল্লাহ, চাঁদপুর। ১৮৯। মাওলানা আবদুল কবির, নোয়াখালী। ১৯০। মাওঃ আবদুল গনী, প্রিন্সিপাল, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী। ১৯১। মাওঃ গিয়াসুদ্দীন, নওরতনপুর। ১৯২। মাওঃ ছিদ্দীকুল্লাহ, কলাকোপা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর। ১৯৩। মাওঃ আবদুর রহমান, পটুয়াখালী। ১৯৪। মওঃ আবু বকর, পটুয়াখালী। ১৯৫। মাওঃ আবদুল

ওয়াহেদ, পটুয়াখালী। ১৯৬। মাওঃ ছালাহুদ্দীন, ভোলা, বরিশাল। ১৯৭। মাওলানা আবদুল মজীদ ফিরোজী। ১৯৮। মাওলানা মোঃ নুরুল হক, বরিশাল। ১৯৯। মাওলানা আবদুল হক, লালমোহন, বরিশাল। ২০০। মাওঃ মুনতাজুল করিম, মোহাদ্দেছ, বরিশাল। ২০১। মওঃ নুরুল হুদা, বরিশাল। ২০২। মাওঃ আবদুল আজীজ বিহারী, চরমোনাই, বরিশাল। ২০৩। মাওঃ আবদুল মান্নান, মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল। ২০৪। মাওঃ আবদুল্লাহ, যশোর। ২০৫। মাওঃ ছাদেক আলী, যশোর। ২০৬। মাওঃ পীর মোঃ সাঈদ শাহ, নোয়াপাড়া, যশোর। ২০৭। মাওঃ সা'দুল্লাহ, যশোর। ২০৮। মাওঃ আবদুল হাকীম, টাঙ্গাইল, ২০৯। মাওঃ আবদুর রহমান, টাঙ্গাইল। ২১০। মাওঃ মুফতী সলীমুর রহমান, টাঙ্গাইল। ২১১। মাওঃ আবদুল কুদ্দুস, টাঙ্গাইল। ২১২। মাওঃ তৈয়ব আলী, রংপুর। ২১৩। মাওঃ আবদুল কুদ্দুস, কাটিপাড়া, দিনাজপুর। ২১৪। মওঃ লাল মোহাম্মদ। ২১৫। মাওঃ আকবর হুসাইন কাসেমী, দিনাজপুর। ২১৬। মাওঃ ছালেহ আহমদ, পোরশা, রাজশাহী। ২১৭। মাওলানা এরশাদুল্লাহ, রাজশাহী। ২১৮। মাওলানা আবদুল বাকী, ভাঙ্গা, ফরিদপুর। ২১৯। মাওলানা আশরাফ আলী, বাহিরদিয়া, ফরিদপুর। ২২০। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছিদ্দীকী, জৌনপুরী, ফরিদপুর। ২২১। মাওঃ আবদুল বারী, ফরিদপুর। ২২৩। মাওঃ আহমদ হাসান কাসেমী, পাবনা। ২২৪। মাওঃ মোজাম্মেলুল হক, পাবনা। ২২৫। মাওলানা মান্নান, সোনাতুনিয়া, খুলনা। ২২৬। মাওঃ নুরুল আবছার, বগুড়া। ২২৭। মাওঃ ফয়েজ আহমদ, বগুড়া। ২২৮। মাওঃ মোঃ ইসহাক, চুরখাই, সিলেট। ২২৯। মাওঃ আবুল কাসেম রহমানী, মোহাদ্দেস, ঢাকা। ২৩০। মাওঃ আলীমুদ্দীন, মোহাদ্দেস, মাদ্রাসাতুল হাদীস, ঢাকা। ২৩১। মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, ঢাকা।

ইমাম গাজ্জালীর ভূমিকা সম্পর্কে খতিবে আজমের মূল্যায়ন ঃ

গ্রীক দর্শনের প্রভাবে সৃষ্ট চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিভ্রান্তি হতে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালীর ভূমিকা ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইমাম গাজ্জালী লিখিত "আততিবরুল মসবুক" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভূমিকা লিখতে গিয়ে হযরত খতিবে আজম সংক্ষিপ্তাকারে ইমাম গাজ্জালী সম্পর্কে যে মূল্যায়ন পেশ করেন পাঠকদের খিদমতে তা হুবহু উপস্থাপিত হল ঃ

"হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ইমাম গাজ্জালীর আবির্ভাব ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরনীয় ঘটনা। এ সময় একদিকে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে মুসলিম মিল্লাতের চিন্তার রাজ্যে এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, অপরদিকে ফিরকায়ে বাতেলার উৎপত্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দস্তরমত উৎপাতের সৃষ্টি করে। সর্বোপরি মুসলিম মাসকবর্গের মধ্যে ভোগ বিলাসিতা, ক্ষমতাদর্শিতা ও নানা ধরনের চারিত্রিক অধঃপতন নেমে আসে। আব্বাসীয়া শাসকদের মধ্যে যখন এসব দোষ ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করে তখন মুসলিম খেলাফতের পূর্বাঞ্চলে তুর্কী সেলজুকী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুকী তুর্কীরা ইসলামের মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার এবং ইসলামের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেলজুকী সুলতান

আলপ আরসালান ও মালিক শাহের শাসনকালে ইতিহাস বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ও বিজ্ঞ বহুদর্শী রাষ্ট্রনায়ক নিজামউল মুলুকের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিমজাহানে জ্ঞান চর্চার এক নুতন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাঁরই উদ্যোগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় নিজামিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মুসলিম মিল্লাতের দিকপাল ও মুজাদ্দিদ ইমাম গাযযালী।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ইমাম গাজ্জালী তাঁর শক্তিশালী লিখনীর মাধ্যমে চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তি হতে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে নুতন প্রাণের সঞ্চার করেন। তিনি এক দিকে গ্রীক দর্শনের দুষ্ট প্রভাব হতে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করার জন্য দার্শনিক ভিত্তিতে ইসলামের নব মূল্যায়নে ব্রতী হন। ফিরকায়ে বাতেনীয়াও অপরাপর বাতেল পন্থীদের ভ্রান্ত মতাদর্শের বেড়াজাল হতে মুক্ত করার জন্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আলোচ্য গ্রন্থ 'আত তিবরুল মসবুক' নিজামুল মুলুকের অনুরোধে মালিক শাহের উদ্দেশ্যে লিখিত অমুল্য উপদেশনামা। গ্রন্থখানিতে ইমাম গাজ্জালী মুসলিম শাসকদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "শাসন কর্তৃত্ব আল্লার বিরাট অনুগ্রহ ও নেয়ামত। এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ও দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা, আল্লার এই অনুগ্রহ বিলীন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থখানির প্রারম্ভে তৌহিদ, রেছালত ও ঈমানের তাৎপর্য ও ততপ্রেক্ষিতে শাসকদের করণীয় সম্পর্কে হিতোপদেশ দান করেছেন। অতঃপর ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা ও সুশাসকমূলক গুণাবলীর উল্লেখ ও জালিম শাসকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কতকগুলি মুল্যবান দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে গ্রন্থখানিকে অমূল্য সম্পদে রূপান্তরিত করেছেন। দৃষ্টান্তসমূহ এতই হৃদয়গ্রাহী যে এদের কিছু উল্লেখ না করলে ভূমিকাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে মনে হয়। দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে রয়েছে রাসুলে করিম (সঃ) বলেছেন ঃ "বাদশাহর একদিনের সুবিচার ৭০ বৎসরের এবাদতের চাইতে উত্তম।" তিনি আরও বলেছেন "অত্যাচারিদের প্রতি সুবিচার করা বিবেকের জাকাত।" "যে ব্যক্তি অত্যাচারের তরবারী ধারণ করেছে সে পরাজিত হয়েছে এবং মনোবেদনা তাকে গিরে ধরেছে।" তিনি এক স্থানে লিখিয়ছেন প্রজারা যতই অত্যাচারী হয়ে পড়ে আল্লাহ তায়ালা তখন ত্যাচারী ও নিষ্ঠুর বাদশাহকে ক্ষমতাসীন করে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। একদা হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে একখানা চিঠি প্রদান করা হল। এতে লেখা ছিল, "খোদাকে ভয় কর, বান্দাদের উপর জুলুম করিও না।' হাজ্জাজ খুবই বাগ্মিতাগুণের অধিকারী ছিলেন। মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, "হে জনগন! আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের উপর নিয়োগ করেছেন। আমি যদি মরিয়াও যাই তবুও তোমরা অত্যাচার হতে রেহাই পাবে না। কেননা আমি যদি না থাকি তবে আমার চাইতে অধিক অত্যাচারী কাউকে তোমাদের উপর আসীন করে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ কোন জাতির পাপে ভরাড়ুবি হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অত্যাচারী মাসক চাপিয়ে দেন। তাহাদের অন্তরে সদগুণাবলীর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। অত্যাচারীর পরিবর্তে শুধু অপর অত্যাচারী এসে শূন্যস্থান পূরণ করে।

বুজুরুচ্ছ মেহেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন ধরনের বাদশাহ্ অধিক পবিত্রতার অধিকারী ? তিনি জবাব দিলেন : যাকে নিষ্পাপ নিরাপরাধ ব্যক্তিরা ভয় পায় না- অপরাধীরা ভয় পায়।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞাহীন বাদশাহর প্রজাদের চোখে কোন গুরুত্ব ও সম্মান থাকে না। জনসাধারণ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে এবং তাকে সব সময় মন্দের সাথে স্মরণ করে।

"জনসাধারণের সাথে পরস্পরের এক বৎসরের অত্যাচার শাসকদের শত বৎসরের অত্যাচারের সমান।" কথার মর্মার্থ এই যে, জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল ও পরস্পরে অত্যাচারী হয়ে পড়লে দেশের আইন শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু থাকে না, তখন মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, সম্মান সবকিছুই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় স্বাভাবিক। কোন দেশে এই অবস্থা এক বৎসর অব্যাহত তাকালে সে দেশ ও সমাজের যে ক্ষতি হয়, তা একশত বৎসরেও পুরণ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সর্বাবস্থায়ই সামাজিক শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব কত যে বেশি উহা অনুধাবনের জন্য দার্শনিক ইমাম সাহেবের এই গ্রন্থে সকল যুগের সকল মানুষের জন্য রয়েছে চিন্তার খোরাক।

ইমাম গাজ্জালীর "আত্ তিবরুল মাসবুক, গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রকাশক পুস্তক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রুচিশীলতা, সময়ের উপযোগিতা ও জাতীয় প্রয়োজনের বিচারে বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানির প্রকাশে দেশ ও জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হবে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইমাম গাযযালীর কর্মবহুল জীবন ও তার সাময়িক কাল সম্পর্কে সুধী পাঠকবর্গকে অবহিত করার জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও এতদসঙ্গে দেওয়া হইল।"

বিনীত-
মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (শায়খুল হাদীস)
মাদ্রাসা-ই জমিরিয়া কাসেমুল উলুম
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম
তাং ২২-২-৭৫

দায়ীদের উদ্দেশ্যে খতীবে আযমের কতিপয় উপদেশ ঃ

১। কুরআন ও ছুন্নাহর এতদূর এলম থাকতে হবে যদ্বারা আহলে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াতের আকীদা মতে নিজের ঈমান একীন দোরস্ত করে নেয়া যায়। তৌহীদ ও শেরকের মধ্যে ছুন্নাত ও বিদআতের মধ্যে পার্থক্য করে পারে।

ফরজ, ওয়াজিব, ছুন্নাতে মোয়াক্কাদা, ছুন্নাতে জায়েদা, মোস্তাহাব মোছতাহছনের মরাতিব ও দরজা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং হারাম, মাকরুহ তাহরীমা, মাকরুহ তানজীহ, মোবাহ প্রভৃতির পার্থক্য বুঝতে পারে।

২। কুরআন ছুন্নাহ ও উহার ব্যাখ্যা ফেকাহশাস্ত্র মতে অর্থাৎ কোন হককানী মোজতাহেদ ইমামের মাজহাবানুসারে নিজের এবাদাত, মোয়ামেলাত মোয়াশেরাত ও আখলাক এবং আদাব আতওয়ার দোরস্ত করে নিতে হবে।

৩। সর্বক্ষেত্রে ছুন্নতে রাছুলের পায়বন্দ থাকতে হবে। বিদয়াত ও কুসংস্কার কাজ থেকে দূরে বহু দূরে থাকতে হবে। এ কথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে ছুন্নাতে রছুলের মধ্যেই নাজাত ও মুক্তি নিহিত এবং বিদয়াত ও শেরকের মধ্যে ধ্বংশ অনিবার্য।

৪। অন্যরা যদিও তাঁকে খুব বড় বুজুর্গ বলে বিশ্বাস করে কিন্তু নিজের নজরে নিজকে সবচেয়ে হাকীর ও নগন্য বলে দেখে হবে। হুজুর (দঃ) খোদার দরবারে দোয়া করেছেন -

হে আল্লাহ! আমাকে আমার চোখে ছোট দেখাও এবং অপরের চোখে বড় দেখাও।

৫। যাবতীয় রোজী রোজগার হালাল হতে হবে হারাম মাল ও হারাম লোকমা স্পর্শ ও করিবে না।

৬। পীরি মুরীদিরকে দুনিয়া হাসেলের অছীলা করবে না।

৭। দুনিয়াবী শান শৌকাত দালান কোটার ফিকির থেকে আজাদ থাকতে হবে। আর যদি কোন সময় হালাল ধন দৌলত হস্তগত হয় উহাকে আল্লাহর দান হিসেবে গ্রহণ করবে। তদ্বারা যতদূর সম্ভব গরীব মিছকীন সর্বহারাদের সাহায্য করবে।

৮। ইত্তেবায়ে ছুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। কাশফও কেরামতের জন্য উদগ্রীব হবে না। আর যদি উহা আল্লাহর তরফ থেকে এসে যায় যথা সম্ভব উহাকে গোপন রাখবে।

৯। নিজের বুজর্গীকে ফলাও করবে না। যথাসম্ভব ছুন্নাতের আবরনে নিজকে জন সমক্ষে প্রকাশ করবে।

১০। খানায় পিনায়, লেবাছে পোষাকে ছুন্নাতানুযায়ী মধ্য পন্থা অবলম্বন করবে।

১১। নিজের ছেলে মেয়েকে দ্বীন এলম ও দ্বীনি আমলে বিভুষিত করার জন্য স্বচেষ্ট থাকতে হবে। পরের ছেলে পিলেকে(দ্বীনি শিক্ষা দ্বীক্ষা দিবে নিজের ছেলে পেলেকে) বেনামাজী বেরোজদার ছাটেকাটে খৃষ্টান মার্কা করিয়ে রাখবে না।

১২। হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল এবাদ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কারও হক যেন নষ্ট না হয়।

১৩। পাড়া প্রতিবেশী এতিম মিছকীনের খবরগিরী করবে।

১৪। নিজের থেকে যারা বয়সে বড় যদিও নিজের মুরীদ হয় তাদের সম্মান করতে হবে এবং ছোটদের প্রতি সদয় হতে হবে।

১৫। হামেশা আল্লাহর জিকির ও ফিকিরে থাকিবে।

১৬। কোন মুস্তানাদ বুজর্গের এরূপ অনুমতি বা ছনদ থাকতে হবে যে, তিনি মুসলমান সমাজের দীক্ষা গুরু হওয়ার যোগ্য ও নির্ভরশীল।

আর যে সব খেরকাপোষ বেএলম দরবেশদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুণাবলী নাই বরং তার বিপরীত নিম্নলিখিত দোষ ক্রুটিতে পরিপূর্ণ এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মুছলমান সমাজের দীক্ষা গুরুর আসনে উপবিষ্ট হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। ধর্ম গুরু হিসেবে তাদের কাছে বয়য়াত্র করা অবৈধ।

মালফুজাতে খতীবে আজম-(প্রসঙ্গ পীর-মুরীদী)

১। কুরআন হাদীছের এবং ফেকাহ শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝবার মত এলম নাই। এরূপ লোক নিজে নিজে দ্বীনদার পরহেজগার হতে পারে কিন্তু অপরের জন্য পথ প্রদর্শক হওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

২। যে ব্যক্তি নিজে মোজতাহীদ নয় তার জন্য একান্ত দরকার অন্য কোন মোজতাহীদের তকলীদ করা। কেননা কুরআন ও ছুন্নাহর মহা সমুদ্র মন্থন করে মছায়েল আবিষ্কার করা এবং উহা থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ মছায়েলা কেয়াছ করে বাহির করা সাধারণ আলেমের পক্ষে সম্ভব নহে।

৩। যে ব্যক্তি ছুন্নাতে রছুলের প্রকাশ্য রাজপথ ত্যাগ করে অপরিচিত বিদয়াতের বক্র চক্র পথে অগ্রসর হয় সে স্বয়ং শয়তানের ক্রিড়নকে পরিণত হয়ে যায়। তার মত গুমরাহ ও পথ ভ্রষ্ট লোক কিছুতেই দীনি রাহবর হতে পারে না।

৪। যে নরাধম নিজকে বড় ও যোগ্য মনে করে এবং অপরকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করে সে অহংকারী। তাকাববুর এমন মহাপাপ যার পরিণতি একমাত্র জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশন।

৫। যে ব্যক্তির রোজী রোজগার হারাম উপায়ে উপার্জিত তার কোনো এবাদত বান্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

৬। পীর মুরীদিকে যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসেল করার অছীলা বানিয়েছে সে বৈষয়িক জগতের চোর ডাকাতের চেয়েও অধিক জঘন্য।

৭। যে ব্যক্তি দুনিয়ার শান শোকত দালান কোঠার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে যায়, যার অন্তরকে দুনিয়ার মোহাব্বতে ঘিরিয়ে রেখেছে সে সমস্ত গুণার বুনিয়াদী গুনায় লিপ্ত হয়ে গেছে।

৮। পীর সাহেবকে যেই নজরানা দেওয়া হয় উহা আসলে পীরগিরীর সুদ। প্রত্যেক ফকিরী লেবাছের মধ্যে সুদখোর মহাজন লুকিয়ে আছে। পীর সাহেব প্রেতৃক মিরাছ স্বরূপ মাছনাদে এরশাদের মালিক হয়ে বসেছে। যেমন শাহবাজ পাখীর বাসা কাকের অধিকারে চলে গেছে।

৯। কাশ্‌ফ্‌ আসল মকছুদ নহে, আসল মকছুদ হল আল্লাহকে রাজী করা আর আল্লাহ রাজী হয় তরীকায়ে রছুলের আনুগত্যের দ্বারা।

১০। যে ব্যক্তি নিজের বুজর্গীকে ফলাও করে বেড়ায় সে বুজর্গীর গন্ধও পায় নাই।

১১। লেবাছে পোষাকে, খানায় পিনায়, এবাদত বন্দেগীতে এবং জিকির ও শোগলে যে ছুন্নাতে রছুলকে অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে মোহব্বত করে এবং যাবতীয় গুনাহ মাপ করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ গুনাহ মাপকারী ও দয়ালু।

১২। যে নিজের ছেলেমেয়েকে এবং নিজের খান্দানের লোক দিগকে দীনি এলম ও আমল শিক্ষা দিতে তৎপর নয়। কেবল পরের বেলায় পীর সাহেব ধর্মগুরু হিসেবে দীনি এলম ও আমলের ফজীলত সম্পকীয় ওয়াজ খায়রাত করেন জেনে রাখবেন এই ব্যক্তি আসলে দ্বীন ধর্মকে মোহাব্বত করে না। এই ব্যক্তি দ্বীনদার নহে বরং দ্বীন বেপারী। আজকাল দেখা যায় প্রায় পীরের ছেলে স্কুলে কলেজে , বেনামাযী, বে রোজদার, নাই দাঁড়ী, নাই টুপি, সুটকোট ও বুটে একজন ইংরেজ সাহেব। আর এদিকে পীর সাহেব পরের ছেলেদের নিয়ে নামায, রোজা, দাঁড়ী, টুপীর ওয়াজে মগ্ন। এরূপ বক ধার্মিক পীর হতে পারে না। এরা মোনাফিক।

১৩। আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার জন্য যে সদা সর্বদা সজাগ থাকে না সে মুত্তাকী হতে পারবে না।

১৪। নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের হক তাদেরকে দিয়ে দাও এবং মিছকীন ও মোছাফিরের হক আদায় কর। আর অপব্যয় করো না। সৎ উদ্দেশ্য ব্যতিত এতীমের মালের নিকটেও যেওনা। যতদিন পর্যন্ত এতীম বয়প্রাপ্ত ও বালেগ হয়।

১৫। যে ব্যক্তি নিজের বয়জৈষ্ঠ্যকে সম্মান করে না ও ছোটকে দয়া করে না সে আমাদের জমায়েতের লোক নহে।

১৬। পীরে কামেলের ছোহবাত ও শিক্ষা দীক্ষার বদৌলতে এলম ও আমলে তকওয়া পরহেজগারীতে, জিকর ও ফিকরে, মোয়ামেলায় ও মোয়াশরাতে বিশেষ করে এত্তেবায়ে ছুন্নতে আদর্শ মুছলমান হওয়া ব্যতিরেখে পীরের ছেলে বলিয়ে, শাহজাদা নাম দিয়ে, মুরীদানের ভোটক্রমে বাবাজানের গদ্দীনাশীন হয়ে যাওয়া এমন একটা জঘন্য মহাপাপ যার তুলনা নেই। এই সেই দিন বাবার মৃত্যুর পূর্ব মুহর্ত্তেও যে ছেলেটা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করলনা, স্কুলে কলেজে আওয়ারা গিরি করল, লেবাছে পোষাকে ফ্যাসনে ভূষণে ছুন্নাত রাছুলের নাম নিশান পর্যন্ত যার কাছে নাই। বাবাজান পীর সাহেব কেবলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুরীদেরা তাকে নিয়ে বসায় একেক বার মাছনাদে এরশাদে। হয়ে যায় একছোটে গাদ্দীনাশীন তারপর মরহুম পীর সাহেবের কবরকে পাকা পোক্ত করে আরম্ভ করে দেয়, কবরের উপর বিরাট দালান সুরম্য কুববা নির্মানের কাজ, রং বেরং এর ফুল কাটে মাজারের চতুস্পার্শ্বস্থ দেওয়ালে। হাজতীরা আসে, হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালিয়ে কবরের উপর ও চতুস্পার্শ্বে আতর ছিটে, কেহ কবরকে চুমা দেয়, কেহ সিজদা করে, কেহ কবর ওয়ালাকে হাজতরওয়া বিশ্বাস করে - হাজত পুরণের জন্য কবরে লিখিত দরখাস্ত লটকিয়ে দেয়, কেহবা দুহাত তুলে হাজত পুরণের প্রার্থনা করে, মাজারস্থ বুজর্গের দরবারে। আবার এই মাজারকে উপলক্ষ করে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক কাওয়ালী গানের ব্যবস্থা করে ঢোল বাদ্য, সারেফ বেহলা ইত্যাদি বাজিয়ে হালকা করে নাচে কুদে আরও কত । আবার ইছালে ছওয়াবের নাম দিয়ে বার্ষিক ওরশের ব্যবস্থা করে। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামান্তরে শহরে বন্দরে পোষ্টার পামলেটের ছড়াছড়ীতে কত হাজার টাকা ব্যয়িত হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। উক্ত পীরদের এজেন্টরা ভক্ত মহলে গিয়ে ক্যানভাস করে গরু মহিষ দুম্বা ভেড়া, ছাগল মুরগী দিয়া এবং টাকা পয়সা চাল-ডাল, তৈল, ঘৃত তরি তরকারী ও ফলফ্রুট পাঠিয়ে যেন ওরশ শরীফকে কামিয়াব করে। কয়েক দিন যাবত বাদ্য বাজনা গীত গজল ও হালকার শোরগোলে চতুর্দিকের কয়েক মাইল পর্যন্ত মানুষ ঘুমাতে পারে না। নর নারী এক তালে একদলে নাচ করে। কবরের উপর সিজদা দিয়ে আবার উড়ে পড়ে গদ্দীনশীনের শ্রীচরণে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এত কিছু পেয়েও মরহুম পীর সাহেবের ওয়ারিশরা তৃপ্ত হয় না। ওরশলব্ধ টাকা পয়সা ও মাল মাত্তার ভাগ বখেড়া নিয়ে পরস্পর ঝগড়া লেগে যায় শেষ ফল বঞ্চিত বা কমপ্রাপ্ত পক্ষ আশ্রয় নেয় একেবারে কোর্ট আদালতে।

এসব তামাশাকে আজকাল ফকিরী ও দরবেশী নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

মুসলমান ভাইগণ! আপনারাই বিচার করুন। এরূপ ফকিরীর সাথে আল্লাহর পবিত্র কুরআন ও আঁহযরতের হাদীছ ও ছুন্নতের সঙ্গে কোনরূপ দূর সম্পর্ক ও নাই। অথচ এরা বলে বেড়ায় এখন নবুওত ও নাই এটা এ বেলায়েতের জামানা। মৌলভীরা এসব কথা বুঝে না ইত্যাদি কুফরী কথা।

খাতমুন্নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) হলেন শরীয়াত, তরীকাত, হাকিকাত, মারফত সব কিছুরই উৎস। যদি কোন ফকিরী নুবুওতের উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে না আসে তবে উহা শয়তানের উৎসের থেকেই নির্গত হতে বাধ্য।

মাওলানা রুমী বলেছেন, বহু ইবলীছ আদম ছুরতে আত্ম প্রকাশ করে আছে- কাজেই প্রত্যেক হাতের উপর হাত দেওয়া যায় না। অবশ্য মরহুম পীর সাহেবের কোন সুযোগ্য ছেলে যদি এলমে আমলে এবং এস্তেবায়ে ছুন্নতে প্রকৃত নেক বান্দা হয়ে থাকেন এবং কামেল হককানী মুরশেদের ছোহবাতে থাকে নিজের আত্ম শুদ্ধি করিয়ে থাকেন এবং ঐ কামেল মুরশেদ তাকে সাধারণ মুছলমানের দ্বীনি খেদমত করার জন্য বয়আত ইত্যাদি লওয়ার এজাজত দিয়ে থাকেন এরূপ ছেলে যদি মরহুম পীর সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে খলকে খোদার খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন তাঁর উপর কারও কোন আপত্তি হতে পারে না। বেচারা যদি সত্যিকার কামেল ব্যক্তিই হন তবে মরহুম পীর সাহেবের ছেলে হওয়াটা উনার জন্য কোন দোষের কথা নয়। আমরা উপরে যা বলেছি ওটা নালায়েক ছেলেদের কথাই বলছি। কারণ বুজর্গী পৈত্রিক মিরাছ নহে। যার বুজর্গী তাকেই হাসেল করতে হয়।

অতএব আমার কথার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যাঁরা ঈমান, এলম আমল ও আখলাক এর দিক দিয়ে সত্যিকার ভাবে হক্কানী ও বজুর্গ বলে চিহ্নিত উনাদের নিকট বাইয়াত নেওয়া ও কবুল করা সম্পূর্ণ জায়েজ ও ছুন্নাত এবং যারা নামদারী, গদ্দীনশীল এবং পীরগিরির নামে সাংসারিক আয়ের একটা পথ খুলে বসেছে সে সব পীরদের কাছে বায়াত করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এদুটা পথই ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও মতের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং একই কথা মাছালা হুকুম দিয়া উভয়টাকে এক সাথে না জায়েজ বলা অন্যায় যুক্তি সংগত মনে হয় না। ঠিক তেমনী একই হুকুম দ্বারা উভয়টাকে জায়েজ বলাও সম্পূর্ণ বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যকে বরণ কর মিথ্যাকে বর্জন কর।

খতীবে আজমের প্রকাশিত রচনাবলী

মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ মূলতঃ বক্তা হলেও লেখায় তাঁর হাত ছিল চমৎকার। নানাবিধ ব্যস্ততার জন্য একান্তবর্তী হয়ে রচনায় মনোনিবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যস্ত

তার মাঝেও তিনি যেসব পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন তা আপন মহিমায় সমুজ্জল। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে

১। সত্যের দিকে করুণ আহবান।
২। খতমে নবুয়ত।
৩। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার।
৪। শানে নবুয়ত।
৫। ইসলামী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা।
৬। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রশ্নমালার উত্তরে।
৭।
৮। বাংলা ফরায়েজ।
৯। ওয়াবী কাহারা।
১০। মেরাজুন্নবী (সঃ)।
১১। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রম বিকাশ ধারা।

খতীবে আযমের অপ্রকাশিত কিছু রচনাবলী ঃ

১। আহলে হাদীসের স্বরূপ
২। (কাহারো মাধ্যম দিয়ে আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করা)
৩। তরীকতের গুরুত্ব, উৎপত্তি ও গুরুত্ব।
৪। ইসলাম ও সমাজ বাদ।
৫। ইসলামও পুঁজিবাদ।
৬। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জাকাতের ভূমিকা।
৭। খতমে নবুয়ত।
৮। সুদ ও সুদের পরিণতি।
৯। ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের মূল্যায়ন।
১০। ইসলামের বাণিজ্যনীতি/ ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব।
১১। মোয়াশারাত (জীবনযাপন)।
১২। ইসলামে পারিবারিক অধিকার।
১৩। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য।
১৪। পথিক ও বিপদগ্রস্থদের প্রতি কর্তব্য।
১৫। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা।
১৬। আইন ব্যবস্থা।
১৭। শাষনকর্তা ও শাষিতদের মধ্যে সম্পর্ক।
১৮। শাষনকর্তা নিয়োগের ধারা।
১৯। মানব জীবনের বিপদাপনে আক্রান্তের ব্যাপারে খতীবে আজমের ভূমিকা।

২০। খতীবে আযমের দৃষ্টিতে কারাঘরের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর জরুরী কিছু সংস্কার সম্ভাবনা।

২১। শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়।

১। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আদত ও আখলাক।
২। মুসলমান ভাই এর হক।
৩। মুয়ামালাত।
৪। ইসলামে যাকাতের স্বরূপ।
৫। যাকাত প্রদান।
৬। যাকাত ও খায়রাত।
৭। দারিদ্রতা ও ইসলাম।
৮। বায়তুল মালের গুরুত্ব।
৯। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর মিরাজ ও বিজ্ঞান।
১০। আল কুরআনের অলৌকিকতা ।
১১। হায়াতুন্নবী।
১২। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব।
১৩। খতমে নবুওত।
১৪। ইসলামে তরীকতের প্রয়োজনীয়তাও গুরুত্ব ।
১৫। বাইয়াতের হাকীকত ও গুরুত্ব।
১৬। পীর মুরিদীর হাকীকত।
১৭। আততাওয়াসসুল ফিদ্দোয়ায়ে।

মাওলানা কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসা সমূহ ঃ

খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (সাঃ) সারা জীবন ব্যাপী ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে বিজড়িত ছিলেন। অসংখ্য মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। নিম্নোলিখিত মাদ্রাসাসমূহ তিনি নিজ হস্তে প্রতিষ্ঠা করেন।

১। বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা ও হেফজখানা, চকরিয়া, চট্টগ্রাম।
২। ধনখালী ছিদ্দিকীয়া খলিলিয়া মাদ্রাসা, রামু, কক্সবাজার।
৩। চরম্বা ছিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।
৪। রাজঘাটা হোছাইনিয়া মাদ্রাসা, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

খতিবে আজমের বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ

খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক, একাডেমীক ও ধর্মীয় জীবনে অসংখ্য শিষ্য রেখে গেছেন যাঁরা এখনো আপন আপন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকের নাম বাদ দিতে হল বলে আমরা দুঃখিত। নিম্নে বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দের নাম উল্লেখিত হল।

রাজনৈতিক শিষ্য ঃ

১। জনাব মাওলানা আশরাফ আলী ধরমগুলী, সভাপতি নেজামে ইসলাম পার্টি।

২। " আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকীল, সহ-সভাপতি, জমিয়তে আহলে হাদীস

৩। " এডভোকেট এম. এ. রকীব, সিলেট।

৪। " মাওলানা আবদুল মালিক হালিম, মুহতামিম, হাইলধর মাদ্রাসা।

৫। " মাওলানা আশরাফ আলী বিজয়পূরী, কুমিল্লা মাদ্রাসা।

৬। " মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ, কুমিল্লা।

৭। " মাওলানা নুরুল হক আরমান, কক্সবাজার।

৮। জনাব মাওলানা আবদুল হাই, খতিব, তেজকুনী পাড়া জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।

৯। " মাওলানা আমিনুল ইসলাম, খতিব, লালবাগ শাহী জামে মসজিদ, ঢাকা।

১০। " মাওলানা আজিজুল হক সাহেব শায়খুল হাদীস, লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা।

১১। " হাকিম মাওলানা আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ, ঢাকা।

১২। " অধ্যাপক আবদুল্লাহ, সাভার কলেজ, ঢাকা।

১৩। " মাওলানা আবদুল করিম, প্রভাষক, তিব্বিয়া কলেজ, ঢাকা।

১৪। " মাওলানা এনায়েতুর রহমান (রহঃ) সহকারী পরিচালক মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল।

১৫। " মাওলানা নুরুল ইসলাম, প্রধান পরিচালক, মখজবুল উলুম মাদ্রাসা, ঢাকা।

১৬। " মাওলানা আবদুল মুনইম, সাবেক অধ্যক্ষ দারুল উলুম, চট্টগ্রাম।

১৭। " অধ্যাপক মাওলানা আহমদ ছগির শাহজাদা, সাবেক এম,পি, এ করাচী।

১৮। " মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী (রহঃ) চট্টগ্রাম।

১৯। " আলহাজ্ব ছলিমুল্লাহ, ঢাকা।

২০। " মাওলানা আবদুল লতীফ, ফুলতলী, সিলেট।

২১। " আবদুল বারী (ধলাবারী) সিলেট।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

খতীবে আযম মাওঃ ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) এর ইন্তেকাল ও প্রভাব ঃ

(ক) বিদায়ী রোগ শয্যায় খতীবে আযম ঃ

খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ) ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে আকস্মিক ভাবে ডায়াবেটিস জনিত কারণে পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে তাঁকে কক্সবাজার রাবেতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয় এবং পর্যায়ক্রমে ডায়াবেটিকস হাসপাতাল ও রাবেতা হাসপাতালে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয় কিন্তু অবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। চিকিৎসকদের পরামর্শে বাড়ী নিয়ে আসা হয় বিশ্রামের জন্য। স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়।

১৯৮৪ ও ৮৫ সালে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি যে কোন আগন্তককে চিনতে ভুল করতেন না। কিছু বাক্যালাপও করতে পারতেন যদিও স্বাধীন ভাবে চলাপেরা করতে অক্ষম ছিলেন। হাত ও পা ছিল অনুভূতিহীন। ১৯৮৬ সালে অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটে। স্মৃতি শক্তি অনেকাংশে লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি কোরআন শরীফের কোন আয়াতের প্রথমাংশ বা আল্লামা ইকবালের কোন কবিতার প্রথম পঙতি আবৃত্তি করতেন সাথে সাথে তিনি শেষাংশ বলে দিতে পারতেন। রোগ শয্যায় তাঁকে দেখা গেছে তিনি সব সময় লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতে পছন্দ করতেন এবং wheel chair-এ করে স্থানীয় বাজারে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। প্রক্ষাঘাত গ্রস্থ অবস্থায় তিনি প্রতি বছর তাঁর প্রিয়তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকতেন এবং অংশ গ্রহণও করেছেন।

১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে নেযামে ইসলাম পার্টির উদ্যোগে ও রাষ্ট্রপতি এরশাদের সহায়তায় তাঁকে ঢাকাস্থ পি.জি, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পি.জি. হাসপাতালে মাওলানাকে স্থানান্তরের খবর সংবাদপত্র মারফত ছড়িয়ে পড়লে যাঁরা অসুস্থ রাজনীকিকে দেখতে যান তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, খিলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, জাসদের প্রাক্তন সভাপতি মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল, ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। কিন্তু পি.জি, হাসপাতালে দু'মাস চিকিৎসার পর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা না দেয়ায় তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসা হয়। ১৯৮৩ সালের ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর আমন্ত্রণক্রমে তিনি অসুস্থবস্থায় ঢাকা কমলাপুর রেলভবন সন্নিকটস্থ ময়দানে ইত্তেহাদুল উম্মাহ কর্তৃক আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী ওলামা ও মাশায়েখ সম্মেলনে যোগদান করেন উদ্বোধক হিসেবে।

রোগ শয্যার সাড়ে তিন বছর তিনি ছিলেন একটি অবোধ শিশুর মত। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতেন আগন্তুকদের প্রতি। প্রাণ খুলে কথা বলতে চাইতেন কিন্তু কয়েক বাক্য বলার পর কথার খেই হারিয়ে যেতো। তাঁরা সামনে হাস্যকর কোন কথা বললে তিনি হাসিতে ফেটে পড়তেন, এতে বুঝা যায় মস্তিষ্ক অনেকটা সচল ছিল। অনেক সময় বলতেন "আমাকে কাপড় পড়িয়ে দাও, আমি পটিয়া মাদ্রাসায় যাবো, হাদীস পড়াবো।"

উপজেলা নির্বাচনের সময় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব সালাহুদ্দীন মাহমুদ মরহুম মাওলানার হাত দিয়ে তাঁর মনোনয়ন পত্র জমা দেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হবার পর প্রথম ফুলের মালাটি তিনি মাওলানার গলায় পরিয়ে দেন। সর্বশেষ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে নেজামে ইসলাম দলীয় প্রার্থী জনাব মাওলানা আবদুল মালেক হালিম বাঁশখালী উপজেলার জলদীতে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনী সভায় মরহুম খতিবে আজমকে প্রধান অতিথি হিসেবে নিয়ে যান- যদিও বক্তৃতা দেয়ার মত শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। সাড়ে তিন বছরের অসুস্থাবস্থায় বিভিন্ন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁদের বার্ষিক সভায় মাওলানাকে নিয়ে যান বরকতের জন্য।

১৯৮৭ সালে তাঁর স্বাস্থ্যের অধিকতর অবনতি ঘটে। সে সময় অতি পরিচিত লোককে ও তাঁর চিনতে ভুল হতো। পুরোপুরি নির্বাক হয়ে যান। মাওলানার অনুজ হাকিম মাওলানা আহমদ কবির ইন্তেকাল করলে শেষবারের মতো চেহারা দেখবার জন্য কফিন তাঁর সামনে আনলে তিনি ছোট শিশুর মত ভুকরে ভুকরে ক্রন্দন করেন আপন সহোদরের অন্তিম বিদায়ে।

অনেক সময় তিনি মীর মোশাররফ হোসেন লিখিত 'বিষাদ সিন্ধুর' কারবালা প্রান্তর' অধ্যায়টি পড়ার জন্য তাঁর মেয়ে তাবাসসুমকে হুকুম দিতেন এবং তিনি মন্ত্র মুগ্ধ শ্রোতার ন্যায় শুনতেন আর নিরবে ফেলতেন অশ্রুজল।

(খ) খতীবে আজমের ইন্তেকাল ঃ

১৯৮৭ সালের ১৬ই মে শুক্রবার আকস্মিকভাবে হযরত খতিবে আজমের শারিরীক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। স্থানীয় চিকিৎসকদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট পাচ্ছিলেন। শারিরীক পক্ষাঘাত ও আড়ষ্টতার সাথে শ্বাস-কষ্টের মতো কষ্টকর উপসর্গ যোগ হওয়ায় তাঁর জীবনের প্রদীপ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছিলো। তখন থেকে আর উঠে বসতে না পারলেও সম্বিত হারিয়ে ফেলেননি। অবশেষে ১৯শে মে ২০ শে রমজানুল মোবারক, সোমবার পৌনে বারটার সময় হযরত খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ দীর্ঘ ৮৫ বছরের সফল অবদান ও কীর্তিবহুল ইতিহাস রেখে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন (ইন্নালিল্লাহি ----------- রাজেউন)।

(গ) খতীবে আজমের নামাজে জানাযা ও দাফন ঃ

২০শে মে মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার সময় বরইতলীর শান্তির বাজারের পশ্চিমস্থ মাঠে রহমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক মাওলানা সোহাইব নোমানী জানাযার নামাজে ইমামতি করেন। গ্রীষ্মের দাবদাহ ও মরহুমের আয়াস উপেক্ষা করে প্রায় বিশ হাজার ভক্ত, অনুসারী ও শিষ্য জানাযার নামাজে শরীক হন। নামাজে জানাযার পূর্ব মুহূর্তে শান্তির বাজার শোকাকুল জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন নেজামে ইসলাম পার্টির মাওলানা আবদুল মালেক হালিম, জামায়েতে ইসলামীর মাওলানা শামসুদ্দীন ও অধ্যক্ষ আবু তাহের।

জানাজার নামাজের অব্যাবহিত পর মাওলানার লাশ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ফয়জুল উলুম মাদ্রাসায় নিয়ে আসা হয় এবং মসজিদের দক্ষিণ পাশে দাফন করা হয়। এভাবে ইসলামী ঐক্যের পুরোধা, ইলমে নব্বীর ধারক বাহক ও দ্বীনি আন্দোলনের মশালবাহী অগ্রনকীব চির দিনের জন্য মাটি চাপা পড়ে গেল।

আল্লাহ পাক তাঁর সমাধিকে জান্নাতের নূরে আলোকময় করুণ। আমীন।

(ঘ) মাওলানার ইন্তেকালে যারা হৃদয়নিংড়ানো আবেগী ভাষায় শোকবার্তা পাঠিয়ে সমবেদনা জানালেন ঃ

খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের (রহঃ) ইন্তেকালে অনেকে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি ও তারবার্তা পাঠিয়ে, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে এবং বিভিন্ন স্মরণ সভায় বক্তৃতা দিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন।

তাঁরা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা বলেন, "মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের মৃত্যু জাতির জন্য এক বিরাট ক্ষতি ও শোকাবহ ঘটনা এবং বিরল ইসলামী ব্যক্তিত্ব মরহুম মাওলানার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করতে হলে বাংলাদেশকে কল্যাণকর ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত আদর্শে বিশ্বাসী সব রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যের প্রতীক। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের ইন্তে কালে ইসলামী জগত থেকে যেন একটি নক্ষত্র খসে পড়েছে। এ অভাব পূরণ হবার নয়। মাওলানা একজন ধার্মিক মুসলমান হিসেবে মুসলমানদের কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। মাওলানার বক্তৃতায় মুসলমানদের লুপ্ত জিহাদী চেতনা শানিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্ব, তথ্য ও সুনিপুণ বিশ্লেষণে অনৈসলামিক দর্শনের অনেক বিস্ময়কর দিক উন্মোচিত হয়েছে। মাওলানার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় ইসলামের সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার মাধ্যমে খতিবে আজমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

নিম্নে শোকবার্তা প্রদানকারীদের নাম উল্লেখ করা হল ঃ --

১। শেখ আবদুল্লাহ আবদুল লতীফ আলমাইমানী, সঊদী রাষ্ট্রদূত, গুলশান, ঢাকা।

২। হযরত মাওলানা মালেক কান্দেলভী, বিশেষ উপদেষ্টা প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, পাকিস্তান ও শায়খুল হাদীস, জামেয়া আশরাফিয়া, লাহোর।

৩। হযরত আল্লামা তকী ওসমানী, বিচারপতি, শরীয়াহ ডিভিশন, সুপ্রীমকোর্ট, পাকিস্তান।

৪। জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী, ঢাকা।

৫। জনাব আব্বাস আলী খান, ভারপ্রাপ্ত আমীর, জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা।

৬। " আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, আমীর ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামী।

৭। " মীর কাশেম আলী পরিচালক, রাবেতা আলমে ইসলামী, ঢাকা।

৮। " মাওলানা খন্দকার নাসিরুদ্দীন, মহাসচিব, জমিয়তুল মোদাররেসীন, ঢাকা।

৯। " মাওলানা রুহুল আমীন খান, যুগ্ম সম্পাদক, ঐ।

১০। " মাওলানা আশরাফ আলী, সভাপতি, বাংলাদেশ নেযামে ইসলাম পার্টি, ঢাকা।

১১। " মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সহ-সভাপতি ঐ।

১২। " এডভোকেট আবদুর রকীব, সাধারণ সম্পাদক ঐ।

১৩। " মাওলানা আবদুল করিম, সহ-সম্পাদক ঐ।

১৪। " মাওলানা নুরুল হক আরমান, সহ-সম্পাদক ঐ।

১৫। " মাওলানা আকরাম হোসেন, সভাপতি ঢাকা মহানগরী নেযামে ইসলাম পার্টি।

১৬। " মাওলানা আবদুল হাই, সাধারণ সম্পাদক ঐ।

১৭। " আবদুল জব্বার বদরপুরী, ঢাকা।

১৮। " আবদুল লতীফ, ঢাকা।

১৯। " আবদুল মালেক হালিম, মুহতামিম হাইলধর মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

২০। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ইত্তেহাদুল উম্মাহ, ঢাকা।

২১। " প্রিন্সিপাল এ,এ, রিজাউল করিম, চৌধুরী, ওমর গনি কলেজ, চট্টগ্রাম।

২২। " জনাব প্রিন্সিপাল ইসহাক আলী, আহবায়ক ইসলামী কাফেলা, ঢাকা।

২৩। " ডঃ মুঈনউদ্দীন আহমদ খান, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪। " মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, নায়েবে আমীর, খিলাফত আন্দোলন, ঢাকা।

২৫। " মাওলানা হামিদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ঐ।

২৬। " মাওলানা আজিজুল হক, সভাপতি, ইসলাম শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ঢাকা।

২৭। " অধ্যাপক মাওলানা হেলালুদ্দীন, সভাপতি, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ঢাকা।

২৮। " মাওলানা রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক ঐ।

২৯। আইনুল ইসলাম, সেক্রেটারী, ইসলামী দাওয়াত সংস্থা ঢাকা।

৩০। " জনাব মাওলানা শাহ আবদুস-সাত্তার, আহবায়ক, বাংলাদেশ সীরাত মিশন, ঢাকা।

৩১। " মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দীকী, ঢাকা।

৩২। " মাওলানা আলহাজ্ব সলিমুলস্নাহ, লালবাগ, ঢাকা।

৩৩। " মওলানা আবদুল মতিন, সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ঢাকা।

৩৪। " জনাব মাসুদুল হক মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক, ইসলামী যুব শিবির, ঢাকা।

৩৫। " মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, চেয়ারম্যান, ইসলামী বিল্পবী পরিষদ, ঢাকা।

৩৬। " সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, কেন্দ্রীয় সভাপতি, ইসলামী ছাত্র শিবির।

৩৭। " দিদারুল আলম চৌধুরী, সংসদ সদস্য, কক্সবাজার।

৩৮। " সালাহুদ্দীন মাহমুদ, সংসদ সদস্য চকরিয়া, কক্সবাজার।

৩৯। " এডভোকেট ফিরুজ আহমদ চৌধুরী, সাবেক সংসদ সদস্য কক্সবাজার।

৪০। " জনাব এম, ছিদ্দিক, সাবেক সংসদ সদস্য সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৪১। " আ, ফ,ম, খালিদ হোসেন, কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ, ঢাকা।

৪২। " শেখ লোকমান হোসেন, মহাসচিব, ঐ।

৪৩। " আ,হ,ম, নুরুল কবির হিলালী, অর্থ সচিব, ঐ।

৪৪। " প্রিন্সিপাল হাফেজ হাকিম আজিজুল ইসলাম, তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ, ঢাকা।

৪৫। " মাওলানা নুরুল ইসলাম, মুহতামিম, খিলগাঁও মাদ্রাসা, ঢাকা।

৪৬। " মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, সভাপতি ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম।

৪৭। " জনাব বদিউল আলম, সাধারণ সম্পাদক ঐ।

৪৮। " মাওলানা রুহুল আমীন কোরআন প্রচার সংস্থা, চট্টগ্রাম।

৪৯। " মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম।

৫০। " মাওলানা ওবায়দুল হক, খতিব বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

৫১। " মাওলানা আমীনুল ইসলাম, খতিব লালবাগ শাহী মসজিদ, ঢাকা।

৫২। " মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী, সাধারণ সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ঢাকা।

৫৩। " হযরত মাওলানা আবদুল আজীজ, শায়খুল হাদীস, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৫৪। " মাওলানা মোজাহের আহমদ, রেক্টর হাশেমীয়া আলীয়া মাদ্রাসা, কক্সবাজার।

৫৫। " জামেয়া মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৫৬। " বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রদল, ঢাকা।

৫৭। " হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, ইমাম, রাজকীয় মসজিদ, রিয়াদ, সউদী আরব।

৫৮। " বাংলাদেশ সম্মিলিত ইমাম সংস্থা, ঢাকা।

৫৯। " বাংলাদেশ মক্তব শিক্ষক সমিতি, ঢাকা।

৬০। " বাংলাদেশ মুসলিম নারী সংস্থা, ঢাকা।

৬১। জামেয়া ইসলামিয়া, লালমাটিয়া, ঢাকা।

৬২। এমদাদুল উলুম এতিমখানা, ফরিদাবাদ, ঢাকা।

৬৩। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, প্রিন্সিপাল, সাতকানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৬৪। মাওলানা হাবিবুল্লাহ, সভাপতি, জাতীয় উলামা ফ্রন্ট, ঢাকা।

৬৫। জনাব আল্লামা সোলতান জতক, পরিচালক দারুল মায়ারিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

৬৬। " হাকিম মাওলাানা মুবারক আলী হিজাজী, পরিচালক তনজিমুল মুসলেমীন এতিমখানা, চট্টগ্রাম।

৬৭। " হাফেজ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ, পরিচালক সিকদার পারা সলিমুল উলুম এতিমখানা, চকরিয়া, কক্সবাজার।

৬৮। " হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রশীদ, গারাঙ্গীয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৬৯। জনাব ডাঃ আলী আহমদ ছিদ্দিকী, করাচী।

৭০। প্রেস ক্লাব, চট্টগ্রাম।

(ঙ) মাওলানার ইন্তেকালের খবর নিয়ে কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকীয় ঃ

দৈনিক আজাদ ঢাকা,
মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ

'খতিবে আযম' নামে বাংলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদও ইন্তে কাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেউন)। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ গত (২০শে রমজান ১৯শে মে) মঙ্গলবার বেলা পৌনে বারটায় কক্সবাজারের চকোরিয়া থানার বরইতলী গ্রামের নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি গত তিন বছর যাবৎ প্যারালাইসিসে ভুগতেছিলেন। ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। এদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক নির্ভীক সাহসী ধর্মীয় নেতার এই ইন্তেকাল এদেশের মুসলমানদের এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হবে।

গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ এদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পূর্বেও জনগণের নিকট ছিলেন অতি শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ইসলামী চিন্তাবিদ, বিখ্যাত আলেম। এমন এক সময়ও ছিল যখন মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ এর ওয়াজ-বক্তৃতা শ্রবণ করার জন্য বহুদূর- দুরান্ত হতে অসংখ্য লোক তার জনসমাবেশে যোগদান করত। অনলবর্ষী বক্তা হিসাবে তাঁর বিরাট খ্যাতি রয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি স্থানীয় মাদ্রাসায় লেখাপড়ার পর ভারতের সাহারানপুর এবং পরে দেওবন্দে তফসীর, ফিকাহ, হাদীস ও ইসলামী তর্কশাস্ত্রে উচ্চ

শিক্ষা লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমে কক্সবাজার আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তিনি পটিয়া ও হাটহাজারী দারুল উলুম মাদ্রাসায় প্রায় ৩০ বছর হাদীস শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ দীর্ঘ শিক্ষতার জীবনে বহু কীর্তিমান ছাত্রের জন্ম দিয়েছেন, যারা আজ দেশের বাহিরে ভিতরে সুনামের সহিত দ্বীন ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষার প্রাচীর প্রসারে লিপ্ত। ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের প্রচার এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে তাঁহার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন মাওলানা আতহার আলীর অনুপ্রেরণায়। তিনি ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বে আই. ডি. এল গঠন করা হয়। পরে নেজামে ইসলাম পার্টির পুনরুজ্জীবনও তাঁরই নেতৃত্বে হয়েছিল। শেখুল হাদীস মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ছিলেন। তাঁর রাজনীতি ছিল ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাভিত্তিক। কিন্তু এ পথে তিনি খুব বেশী সফলতা অর্জন করতে পেয়েছেন এমন দাবী করা যায় না। তাঁর আন্দোলনের সময়ে তিনি মুসলিম জনগণের মনোভাব প্রতিধ্বনিত করে গিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন-সংস্কারের জন্য তাঁর সংগ্রাম ছিল বিরামহীন। ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠাই তাঁর সংগ্রামের মূল আদর্শ। পয়গামে মোহাম্মদী ও মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর কতিপয় সুদীর্ঘ রচনা আজাদেও ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ আজীবন ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য যে সংগ্রাম সাধনা করে গেছেন তাহা এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাদীস বিশারদ মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত প্রার্থনা করতেছি মহান আল্লাহ এর দরবারে।

সম্পাদকীয় দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা।
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের ইন্তেকাল

এ দেশের ধর্মীয় আকাশের আরেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হলো। বিশিষ্ট আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা হাফেজ্জীর ইন্তেকালের তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হতে না হতে তাঁরই সমসাময়িক বাংলাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত, আলেম, সুবিখ্যাত বক্তা, প্রবীন রাজনীতিবিদ, হাদীস শাস্ত্র বিশারদ মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ইহকাল ত্যাগ করলেন। তিনি ১৯শে মে, ২০শে রমজান সোমবার পৌনে ১২টার সময় চকোরিয়া থানাস্থ আপন গ্রাম বরইতলীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মরহুম ৭ ছেলে ও ৬ মেয়ে রেখে যান। তিনি গত তিন বছর যাবত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে যে, "মওতুল আলেম মওতুল আলাম" কোনো বিশেষ আলেমের মৃত্যু একটি পৃথিবীর মৃত্যু। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) এর ন্যায় বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এ বাক্যটি অনেকাংশে প্রযোজ্য। গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী এই ইসলামী জ্ঞানবিশেষজ্ঞ, আলেম যেমন ছিলেন একজন যুক্তিবাদী, দক্ষ মুহাদ্দেস, বক্তা, তেমনি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। ১৯৫৪ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশে যে কয়জন আলেম অক্লান্ত পরিশ্রম করে ৫০ এর দশকে ইসলামী রাজনীতি ও গণ পরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে কাজ করেন, তন্মধ্যে মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ছিলেন অন্যতম। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ একজন জনপ্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। নিজ এলাকা থেকে তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সুফী রাজনীতিক এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সাবেক সভাপতি মরহুম মাওলানা আতহার আলীর অনুপ্রেরণায়ই মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর শায়খুল হাদীস হিসেবে হাটহাজারী ও পটিয়া মাদ্রাসায় হাদীসের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাঁরই নেতৃত্বে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠিত হয়। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ছিলেন এদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সারাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ওলামা-মাশায়েখেরই তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরাধীনতার অক্টোপাস থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ওলামা-ই-কেরামের ভূমিকা মুখ্য হলেও পরবর্তী পর্যায়ে আলেম সমাজের বিরাট অংশ রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। রাজনীতিবিমুখ আলেমদেরকে রাজনীতির ময়দানে এসে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে সেদিন যাঁর খানকাহ ও মাদ্রাসা ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশ আমলে আই. ডি. এল ছাড়াও ইত্তেহাদুল উম্মাহ গঠনকালে খতিব-ই -আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ইসলামী ঐক্যের জন্যে যে কাজ ও যেসব বক্তব্য রেখে গেছেন, তা এ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে ওলামা-ই-কেরামের জন্যে বিরাট পথ-নির্দেশনার কাজ করবে সন্দেহ নেই। ইসলামী চিন্তাবিদ ও জননেতা মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ছিলেন দেশ ও জাতির এক নিঃস্বার্থ সেবক। নিজের রাজনৈতিক পরিচিতি ও ক্ষমতাকে কোনো সময় তিনি স্বজনপ্রীতি বা অর্থোপার্জনের লোভ দ্বারা কলূষিত করেননি, যে গুণগুলো আজকাল অতীব বিরল।

ধর্মীয় জ্ঞান গভীরতা, আধুনিক জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, নিঃস্বার্থতা, আমলদার আলেম হওয়া এসব গুণ সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকের সংখ্যা আজকাল খুবই কম। এদিক থেকে খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের ইন্তেকাল বাংলাদেশের জন্যে সত্যিই এক অপূরনীয় ক্ষতি। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের ইন্তেকাল পরিণত বয়সে হলেও ইসলামী ঐক্যের পুরোধা এ মহান ব্যক্তিত্বের মতো সার্বিক গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তিরোধানে আমরা গভীরভাবে

শোকাহত। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

দৈনিক পূর্বতারা, চট্টগ্রাম

খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) ঃ

খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ গত মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না----- রাজেউন)

খতিবে আজমের জীবন একজন মর্দে মুমিনের জীবন। উপ মহাদেশে একজন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ইসলামী বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। তদীয় পুত্র শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী, সৈয়দ আহমদ বেরলভী (বালাকোট), মাওলানা কাসেম নানুতভী, মওলানা মাহমুদুল হাসান, মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী, মওলানা আতহার আলী প্রমুখ বিল্পবের পতাকা তুলে ধরেন। এ বিপ্লবের সর্বশেষ নেতা হযরত মওলানা ছিদ্দিক আহমদ।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলে পরবর্তী চিন্তাশীল আলেম সমাজ সিদ্ধান্ত করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ইসলামী বিপ্লব করতে হবে। তাই দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা। এ মাদ্রাসায় বিপ্লবী ওস্তাদের সান্নিধ্যে বিপ্লবের যে আগুন তিনি লাভ করেছিলেন সে আগুন গত মঙ্গলবার ব্যক্তি মওলানা সাহেবের তিরোধানে নিভে গেল। কিন্তু তাঁর দেশবাসী সে বিপ্লবের ঝাণ্ডা চিরদিন সমুন্নত রাখবে। সেজন্যেই তো তিনি সারা জীবন জেহাদ করে গেলেন। দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিলেন। সারাদেশ চষে বেড়ালেন। ওয়াজ করে, সংগঠন করে জাতিকে জাগিয়ে তুললেন।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিও সমর্থন করতেন তবে পদ্ধতিগত কারণে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেননি। ইসলামী দেশগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে নেজামে ইসলাম পার্টি প্রথমে অন্যান্য দলের সাথে ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করে কাজ আরম্ভ করে। পরে প্রত্যেকটি দল পুনরুজ্জীবিত হয়। এ সময় মওলানা ছিদ্দিক সাহেবের ঐতিহাসিক নেতৃত্বের কথা আমরা ভুলতে পারব না।

খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ যে কতো বড়ো মুজাহিদ ছিলেন, ত্যাগী নেতা ছিলেন, জ্ঞানী গুণী ছিলেন তা আজ বুঝতে পারবেন যখন তিনি এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগের কর্মীদের উদ্দেশ্যে একদিন তিনি বলেছিলেন আমাদের রসূল (সঃ) কখনো হাতে তসবিহ নেননি। নীরবে আল্লাহর জিকির করতেন। বদর যুদ্ধে যাত্রার

সময়ও তিনি কোন মোনাজাত করেননি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভের সময় তিনি আল্লাহর দরবারে হাতে তুলেন। ইসলাম কাজের ধর্ম। প্রার্থনার ধর্ম নয়।

সারা জীবন মওলানা সাহেব ইসলামী বিপ্লবের জন্য জাতিকে আহবান জানিয়েছেন। দ্বীনিইলম বিস্তারে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন শিক্ষা সুশিক্ষা দীনি ইসলামের শিক্ষা। আমরাও দেশবাসীর সাথে শোকাহত। মাওলানা সাহেবও ছিলেন মানুষ। মনুষ মরণশীল। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলের (দঃ) উম্মত হিসেবে আমাদের কর্তব্য আল্লাহর হুকুম রাসূলের (দঃ) সুন্নত পালন করে দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের ব্যবস্থা। মওলানা সাহেব আমাদের মতে সে দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে গেছেন। এর জন্যে জাতিকে সারা জীবন আহবান জানিয়েছেন। আজ তাঁর অবর্তমানে আমাদেরও কর্তব্য শুধু সে পথে চলা-কাফেলা এগিয়ে নেয়া।

সাময়িক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বর্ণনায় খতিবে আজম

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান,

সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।

"খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) এ দেশে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যের বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন। মরহুম মাওলানার আজীবন সাধনা ছিল কালেমা পন্থী সব মুলমানদের এক প্লাটফরর্মে সমবেত করা। বাংলার তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতির ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য দেশের আনাচে কানাচে তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন আজো তা ইথারে ইথারে ভাসছে। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের মত সর্ব গুণান্বিত ব্যক্তি এ দেশে খুব কম জন্ম নিয়েছেন। এ দেশে অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন কিন্তু তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

বাজারে যে জিনিসের কদর নেই সে জিনিসের উৎপাদন হয় না। তেমনি প্রতিভার অবমূল্যায়ন হলে নতুন করে প্রতিভা জন্ম নেয় না। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) ছিলেন নিঃস্বার্থ রাজনীতিক, প্রতিভাধর আলেমে দ্বীন ও বিপ্লবী সংস্কারক। মরহুম মাওলানাকে আমাদের চিন্তা চেতনায় ও কর্মে স্মরণ করার মাধ্যমে আত্ম-বিস্মৃতির দুর্ভোগ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে।

শহিদ মৌলভী ফরিদ আহমদ চৌধুরী
সাবেক এম,এন, এ
সাবেক কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী, পাকিস্তান

"আমাদের কোন জিনিস মূখস্ত করতে ২/৪ বার দেখতে হয় কিন্তু মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব একবার দেখেই আজীবন মনে রাখতে পারতেন এবং হুবুহু পরে বর্ণনা করতে পারতেন। এমন প্রখর স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি।

এডভোকেট ফিরুজ আহমদ চৌধুরী
সাবেক এম,পি.এ
পাবলিক প্রসিকিউটর, কক্সবাজার

"মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ছিলেন হযরত মাওলানা আতহার আলীর (রহঃ) সাফল্যের প্রতিচ্ছবি। মাওলানার মহানুবভতা ছিল প্রবল। রাজনৈতিক অঙ্গনে দলাদলী, কোন্দল ও কাদাছোড়াছুড়ি পরিহার করে সমস্ত মুসলমানকে তিনি এক প্লাট ফরমে আনার প্রয়াস চালিয়েছেন। দেশ বরেণ্য এত বড় আলেম হওয়া সত্বেও তিনি ছিলেন নিরহংকার। নিজকে কখনো প্রকাশ করতে চাইতেন না। একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে জাতিকে যদি পথ নির্দেশ কেউ দিয়ে থাকে তা হলে তিনিই মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব।

মাওলানার বক্তৃতা নীতি বহির্ভূত ছিল না; দর্শনের আমেজ থাকতো প্রতিটি ওয়াজে। যে বিষয়ে যে আয়াত ও হাদীস তিনি বর্ণনা করতেন তার পূর্ণ সরলার্থ, ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর হাদীসের প্রভাব, উসুল ইখতেলাফ প্রভৃতি সবিস্তারে উল্লেখ করতেন। তাঁর বক্তৃতায় Argument ছিল আকর্ষণীয়, উপস্থাপনা শক্তি ছিল মোহনীয়। আমি তাঁর ওয়াজে আল্লামা রাজী, ইবনুল আরবী ও মাওলানা রুমীর দর্শনের অপ্রতিহত প্রভাব লক্ষ্য করছি। মাওলানার ওয়াজের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে রয়েছে তাওহীদ, রিসালাত, আকীদা, তাসাউফ, ইসলামী জযবা। বাংলার অন্য কোন আলেম এমন যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তব্য পেশ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

জনাব এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী
প্রিন্সিপাল, ওমর গনি এম, ই , এস কলেজ, চট্টগ্রাম

"খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) এর বক্তৃতায় শানিত হয়েছে এ দেশের মুসলমানদের লুপ্ত ইমানী চেতনা। ভোগবাদী আধুনিক দর্শনের অনেক বিষময় দিক উন্মোচিত করে ইসলামী জীবন পদ্ধতির দর্শনকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন স্বার্থক ভাবে। জ্ঞানের এ সাধক, জ্ঞানের এ তাপস সারা জীবন দ্বীনে হকের বিস্তার, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং জাতীয় চেতনায় জিহাদের বীজ বপন করে গেছেন। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের (রহঃ) হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় ইসলামের সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। তাঁর বাগ্মীতা, তাঁর ভাষণ, দক্ষতা, ওয়াজ-নসীহতে তাঁর

সুনিপুণ বিশ্লেষণ এগুলোর কথা আমরা এখনো মনে রাখি এবং তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ সম্মোহিত অবস্থায় রাখতেন। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব কালামে পাকের জ্ঞান আহরণ করে বিতরণ করে গেছেন সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী এবং মানুষকে তিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করেছেন। তাঁর এ অবদানের কথা জাতি ভুলতে পারে না।

হাকিম মাওলানা আজিজুল ইসলাম

প্রিন্সিপাল

হাবিবিয়া তিব্বিয়া কলেজ, ঢাকা

"৭০ সালে পি.ডি.পি গঠিত হওয়ার পর নেজামে ইসলামকে তিনি পূনর্গঠিত করেন। এটা না করলে হয়তো নেজামে ইসলামের স্বতন্ত্র অস্থিত্ব থাকতো না। পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা তিনি ইসলামী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সাংগঠনিক প্রতিভা তাঁর সাথে মিলিত হলে সফলতা আরো বেশী আসতো। তিনি অনেক সময় হয়তো ঝুঁকি নেননি এটা যেমন সত্য আবার অধিক ঝুকি নিলে হয়তো গোটা আলেম-সমাজ সংঘাতের মুখে পতিত হতো। পারিবারিক আইন ফজলুর রহমান কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে এবং DAC, PDM, one man vote এর পক্ষে রীতিমত সংগ্রাম করেছেন। ৭০ সালে ঢাকা রেডিওতে যখন কবিতা পড়তাম তখন অনেক সময় তাঁর কাছ থেকে পয়েন্ট নিয়েছি তাঁর বিজ্ঞতা আমাকে অভিভূত করছে।

মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহুদ্দীন

সাবেক সভাপতি

পূর্ব-পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি

"শিক্ষার জন্য যেসব শর্ত ও গুণাবলী প্রয়োজন মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের মধ্যে সেসব পরিপূর্ণ ভাবে ছিল। তাঁর প্রতিভার কদর হয়নি। তাঁর অনুসারীরা তাঁকে Misuse করেছেন। তাঁর যাওয়া দরকার ঢাকায়, তাঁর অনুসারীরা আটকিয়ে রেখেছেন কক্সবাজারে, কারণ নরম অন্তরের অধিকারী ছিলেন তিনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর স্বশরীর ও জাগ্রত অবস্থায় মেরাজ প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি যে যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমম্বয় ঘটিয়ে বক্তব্য পেশ করেন তা আশ্চর্য। আমি এবং তিনি এত ঘনিষ্ট সহপাঠি ছিলাম যে, 'আপনি' ও 'তুমি' 'র' ব্যবহার হতো কম। আমরা যখনই একে অপরের সাথে মিলিত হতাম তখন ব্যবহার হতো 'তুই'।

এডভোকেট মৌলভী ফরিদ আহমদ চৌধুরীর ঢাকাস্থ বাসায় পার্টির তহবিল গঠন উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় আমি দু'লাইনের একটি কবিতা বলেছিলাম, যা এখনো আমাদের মনে আছে-

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব যখন কোন বিষয়ে বক্তৃতা করতে উঠতেন আমার মনে হচ্ছে একটি ঐশী শক্তি তাঁকে বক্তব্য উপস্থাপনে সহায়তা করছে।

আলি আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ
আমীর
জামায়াতে ইসলামী ঢাকা, মহানগরী শাখা

"হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) উপমহাদেশের বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন। এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে যে ক'জনের নাম শীর্ষ ভাগে থাকবে খতিবে আজম তাঁদের মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে। ১৯৫৬ সালের ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে হযরত খতিবে আজম ও তাঁর দল নেজামে ইসলাম পার্টি যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান জওক
প্রধান পরিচালক, দারুল মায়ারিফ, চট্টগ্রাম

"দ্বীন প্রতিষ্ঠার কঠিন আন্দোলনে সম্মিলিত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার মাধ্যমে খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কারণ মরহুম মাওলানার হৃদয়ে আজীবন আমরা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আগুন দেখেছি। খতিবে আজম সারা জীবন রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার, সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বাক শক্তি ও লেখনী দিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন এবং ইসলামী আদর্শের উজ্জীবনের ক্ষেত্রে তিনি কোন শক্তির সামনে মাথা নত করেননি, আপোষ করেননি কোন প্রলোভনের লোভনীয় মোহে।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা

"ইসলামী শিক্ষার নিরলস খেদমত এবং কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন ছাড়াও খতিবে আজম আধুনিক সভ্যতা; জীবনবোধ ও আধুনিক জাহিলিয়াত থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী চ্যালেঞ্জের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় বিরাট অবদান রাখেন। দীর্ঘ পৌনে দু'শ বছরের বৈদেশিক শাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জড়বাদী জীবন দর্শনের প্রভাবে এদেশের মুসলিম সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

৪০/৫০ এর দশকে তা অনেক আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরই ঈমান-আকীদা হরণ করে নিচ্ছিল। এখন সেগুলোর জবাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকারী ইসলামী সাহিত্য, ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদের অভাব না থাকলেও সে সময় এর অভাব ছিল সারাদেশে প্রকট। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা সেসব আধুনিক জিজ্ঞাসা-চ্যালেঞ্জের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। সে দিন তাঁর মতো যুক্তিবাদী আলেম না থাকলে আধুনিক জাহিলিয়াতের ভিত এদেশে আরও বহু মজবুত হতো। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের দ্বারা বহু পথহারা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিই কেবল পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসেনি, দেশের ওলামায়ে কেরামও তাঁর আন্দোলনের নতুন ভাবে আত্মচেতনা ফিরে পান। কারণ খতিবে আজম সে সময় একজন

দার্শনিক বক্তা এবং বেদআত, শিরক ইত্যাদি কুসংস্কারের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাক্মী হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে, তখন সাধারনভাবে সারা দেশে বিশুদ্ধ বাংলায় বক্তৃতাদাতা আলেমের সংখ্যা ছিল হাতে গোনার মতো। দেশে তখনও দারুল উলুম দেওবন্দ সহ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন বড় বড় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভকারী বহু আলেমের অস্তিত্ব থাকলেও অনেকেই বাংলা চর্চা করতেন না। শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে আসার পর অনেককে বাংলা ভাষায় স্বদেশীয় শ্রোতাদেরকে 'মোতারজেম' রেখে উর্দুতে বক্তৃতা শোনাতেও দেখা গেছে। মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম ছিল উর্দু। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ আরবী এবং উর্দু ভাষার একজন সুপণ্ডিত বক্তা হওয়া সত্বেও বাংলা ভাষাভাষী জনগণ বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের বাণী তুলে ধরার জন্যে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন। অন্যান্য আলেমদেরকে তিনি বাংলা বলার উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর এই দূর দৃষ্টির ফলে আলেম সমাজ বিশেষ করে কাওমী মাদ্রাসার ওলামা তালাবারা অনেকেই বর্তমানে বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক মনযোগী দেখা যাচ্ছে।

বৃটিশ সম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করার আন্দোলনে এবং ভারত বিভাগের পর অবিভক্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি আন্দোলন করেন। ১৯৫৪ সালে খতিবে আজম যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়যুক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলির সদস্যও হয়েছিলেন। ইসলামী শাসন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার এর লক্ষ্যে তিনি এসেম্বলির ভিতর এবং বাইরে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। আইয়ুব খানের দীর্ঘ দশবছরের শাসনামলে মৌলিক অধিকার, বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ডক্টর ফজলুর রহমান কর্তৃক তৈরি করা অনৈসলামিক পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে মাওলানা আতহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে যে সময় জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি সারা দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন জোরদার করে তোলে, সে সময় তাঁর দক্ষিণ হস্ত বরং অন্যতম নেতা হিসাবে মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ দায়িত্ব পালন করেন। ইসলাম ও মুসলিম জাতির এ মহান খাদেম ইলমে দ্বীনের প্রসার দানে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে এবং বিজাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভ্রান্ত মতাদর্শের যুক্তি খণ্ডণের মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাতে যে অবদান রেখে গেছেন, এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে, ভবিষ্যত কর্মীদের জন্য তা চিরদিন অনু প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।"

মাওলানা আঃ রহীম ইসলামাবাদী

"হিমালয়ান উপ মহাদেশে ইসলামী আদর্শের প্রচার, প্রসার ও প্রতিকার ইতিহাসে যে সমস্ত মহা মনীষীর নাম যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, মুসলিম জাহানের খ্যতনামা আলেমেদীন, ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানী খতীবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। পৃথিবী যে কোন স্থানে ইসলাম ও মুসলমানদের সংকট দেখা দিত মাওলানা সাহেব তাতে বিচলিত হয়ে উঠতেন।

৭ম অধ্যায়

খতীবে আযমের জীবনী মূল্যায়ন

খতিবে আজমের প্রতি সহযোগিদের অবহেলা

কেঁদেও পাবে না যারে

মহাকালের ঘুর্ণিপাকে যুগে যুগে যেসব সিংহ পুরুষ কুসংস্কারের পংকে নিমজ্জিত মানব গোষ্ঠিকে আলোর মশাল হাতে নিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ দেখিয়েছেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে জাগাবার তরে যারা বিপ্লবের রণ দুন্দুভি বাজিয়েছেন খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন।

মৃত্যু জীবনের চাইতেও স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু আছে যা স্বাভাবিক বলে ভাবতে কষ্ট হয়, অমোঘ বিধান বলে মেনে নিতে বেদনা বোধ হয়। বয়সের প্রেক্ষিতে বিচার করলে খতিবে আজমের মৃত্যু অনেকটা পরিণত বলা চলে। তারপরও 'কিন্তু' থেকে যায়, থেকে যায় অনেক 'প্রশ্ন'।

হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের মতো বহুমাত্রিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব প্রতিদিন জন্ম গ্রহণ করেন না; প্রতি মাসেও নয়; প্রতি বছরেও নয়। হয়তো শতাব্দীর প্রান্তিক সীমায় জন্ম নেয় একজন খতিবে আজম। পৃথিবীকে সূর্যের চারিদিকে অথবা সূর্যকে পৃথিবীর চারিদিকে অগুণিত বার প্রদক্ষিণ করতে হয় একজন মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সৃষ্টি করতে।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর (রহঃ) ইন্তেকালে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব (রহঃ) আল্লামা ইকবালের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছিলেন ---

তেমনি বাগানে হয়তো অনেক ফুলই আছে। দৈনন্দিন অনেক ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে আবার ঝরে যাচ্ছে। কিন্তু মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের মতো ফুল ইলমে নব্বীর বাগানে প্রতি দিন ফোটেন না কালে ভদ্রে অনেক চেষ্টা চরিত্রে হয়তো দেখা দেয়।

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক, দায়িত্বশীল শিক্ষক, সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং পারিবারিক পরিসরে স্নেহ বৎসল পিতা। এক কথায় তিনি একটি Institution বা Academy.

বিদায় মুহূর্তে খতিবে আজম অনেকটা অভিমান নিয়ে চলে গেলেন কারণ জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্য ও অনুসারীগণ তাঁকে যথার্থ কদর করেননি। জীবনের শেষ সাড়ে ৩টি বছর তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে নির্বাক ছিলেন। অনুভূতি ছিল অথচ কথা বলতে পারতেন না, শারীরিক অবয়ব ঠিকই ছিল অথচ হাটতে পারতেন না। ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় হাসপাতালের পরিচালক তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাবে মন্তব্য করেন "মাওলানাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্রাম ও স্বস্তি ব্যতিরেকে তাঁর মেধার যথেচ্ছা অপচয় হয়েছে। অতএব বিদেশে পাঠিয়ে খুব বেশী লাভ হবে না।"

প্রশ্ন থেকে যায় কারা আকাশের মতো উদার এ বৃদ্ধ শিশুটিকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন ?

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগের এমন কোন কাওমী ও সরকারী মাদ্রাসা নেই যেখানকার বার্ষিক রিপোর্টে মাওলানার সত্যায়িত বাণী নেয়া হয়নি। মাদ্রাসার উপদেষ্টা কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁকে নিয়োগ করা হয়নি। বার্ষিক সভার তো তিনি ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। বাংলাদেশে দেওবন্দের ধারার ওলামাদের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। কাদিয়ানী মতবাদের মোকাবেলায়, আইয়ুবী দু'শাসনের প্রতিবাদে ও বিদআত শিরকের বিরুদ্ধে তাত্বিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মাওলানাই ছিলেন অগ্রবর্তী সেনানী। বাংলাদেশী দেওবন্দী ওলামাদের মধ্যে খতিবে আজম ছাড়া সর্বাধিক যোগ্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাঁর সমসাময়িক কালে একথা বললে খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হবে না।

অসুস্থ হয়ে যাবার পর মাওলানাকে হয়তো অনেকেই দেখতে গেছেন তবে তাঁর সংখ্যা ছিল নগন্য। অনেকে হয়তো আর্থিক সাহায্য করেছেন তবে তার পরিমাণও ছিল অনুল্লেখ্য। আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ ভেঙ্গে ফেলে যিনি দুঃসাহসিক নাবিক সিন্দাবাদের মতো পাল তুলে ছিলেন জাহাজে, যাত্রা করেছিলেন ইসলামী আন্দোলনের মহাসমুদ্রে। শয়নে স্বপনে নিদ্রা তন্দ্রায় বাংলার জমিনে দ্বীনি শিক্ষার বিস্তার ও দ্বীনি আহকাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শরীরকে যিনি আরাম দেননি, বিশ্রাম দেননি মেধাকে। জীবনের শেষ মূহূর্তে অনেকটা নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণতে হয়েছে তাঁকে। নিজের আপন সতীর্থদের এ উপেক্ষা দেখে হয়তো তিনি কথা বলেন নি। বাংলার অবহেলিত আরেক বিদ্রোহী কণ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামও অন্তিম মুহূর্তে স্বধর্মাবলম্বীদের অবজ্ঞা দেখে বলে ছিলেন -

" তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু
আমি আর জাগিবনা
কোলাহল করি সারা দিনমান
কারো ধ্যান ভাঙ্গিবনা
নিশ্চল নিশ্চুপ।
আপন মনে একাকী পুবিড়

গন্ধ বিধুর ধুপ।"

মাওলানা আপন মনে একাকী বেদনা বিধুর ধুপে পুড়েছেন, কারো ধ্যান ভাঙ্গেনি।

রাজনীতির সুযোগে এবং দ্বীনি খিদমতের বিনিময়ে যেহেতু তিনি কালো টাকার পাহাড় গড়েননি। অতএব, সঙ্গত কারণে তাঁর আর্থিক অনটন ছিল। পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর পুষ্টিকর খাদ্যের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল আরো অধিকতর সেবার। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সেবার পরিসর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তাঁর পরিবারের সদস্যগণ সীমিত স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সেবার ক্ষেত্রে কোন অবহেলা করেননি।

যে দেশে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করলে পেনশন পাওয়া যায়, সে দেশের সর্বোচ্চ দ্বীনি শিক্ষায়তন পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ায় ১৭ বছর হাদীস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের (শায়খুল হাদীস) দায়িত্ব পালন শেষে পক্ষাঘাত জনিত কারণে অবসর নেয়ার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাসিক ভাতা মনজুর করে এ মনীষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নি।

অথচ হাটহাজারী দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদ্রাসার যেসব শিক্ষক অসুস্থতা জনিত কারণে অবসর নেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁদের অতীত খিদমতের কথা বিবেচনা করে নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান করে থাকেন।

লেখক ১৯৮৬ সালে আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মাওলানার সাহায্যার্থে একটি মাসিক ভাতা মনজুর করার আবেদন জানালে তিনি মাদ্রাসায় এরূপ কোন তহবিল না থাকার কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য জামেয়া প্রধানের সাথে পরামর্শ করে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার আশ্বাস দেন। জানিনা সিদ্ধান্ত আদৌ নেয়া হয়েছিল কি না। হযরত খতিবে আজম তাঁর প্রিয়তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক ভাতা না নিয়েই পরপারে মেহমান হয়ে গেলেন। অবজ্ঞা ও এবহেলার এ দুঃখ রাখার জায়গা নেই ; উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের এ বেদনা প্রকশের ভাষা নেই।

১৯৮৭ সালের ২৫শে জুলাই 'নাজাত' সাময়িকীতে যখন এ লেখটি প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই এ সত্য কথন ও বাস্তবতাকে অভিনন্দিত করেন। আবার একটি ক্ষুদ্র অংশ উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার দু'এক জন শিক্ষক প্রবন্ধের বিষয়বস্তর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে শালীনতা বিবর্জিত উক্তি করতেও ছাড়েননি। যেহেতু বিতর্ক কোন সমস্যার সমাধান দেয়না সেহেতু যথেষ্ট যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি লেখনীকে সংযত করলাম। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, পটিয়া মাদ্রাসার প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ স্বঃপ্রণোদিত হয়ে অথবা কমিটির মাধ্যমে ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত কি নিতে পারতেন না ? যেখনে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে রাষ্টীয় সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করার বিধান আছে দেশে। যুগে যুগে সেখানে এ সিদ্ধান্ত নিতে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব ছাড়া আর কোন বাধা

থাকার কথা নয়। অন্ততঃ পক্ষে এ নিয়ম চালু হলে পটিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ যারা ভাতা প্রদানের বিরোধী তাঁরা আল্লাহ না করুন কালের কষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েন তা হলে এ ভাতা থেকে উপকৃত হতেন নিজেরা এবং নিজেদের পরিবার বর্গ। যুক্তি নির্ভর ও তথ্যনির্ভর সমালোচনা সহ্য করার মত সুস্থ মানসিকতা যাদের নেই বা কৃত কলাপের জন্য দুঃখ বা অনুশোচনা প্রকাশে যারা দ্বিধাগ্রস্থ তারা নিশ্চিতভাবে বিবেকের শাসন থেকে দূরেঃ সংশোধনতো সেখানে বিলাস কল্পনা মাত্র।

ইতালীর রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলী বলেছেন "মানুষকে যত পার ব্যবহার করো, যে মুহূর্তে সে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে, তাকে ছুড়ে মারো ডাষ্টবিনে" হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের প্রতি তাঁর অনুসারীগণ, সহকর্মীগণ ও অনুরক্তগণ ম্যাকিয়াভেলীয়ান আচরণ করে হৃদয় হীনতার ও মানবিক দৈন্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করলেও রাষ্ট্র প্রধান শোকবাণী দিয়ে জাতীয় এ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে কার্পন্য করেছেন।

বন্দুকের নল থেকে গুলি ছুড়ে গেলে তা যেমন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। হারানো মাওলানা সাহেবকেও সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। আল্লামা ইকবালের ভাষায় --

অনুশোচনার গ্লানী আজীবন এ জাতিকে বহন করতে হবে। কালে ধারণ করতে হবে দুর্ভ্যাগ্যের তিলক রেখা।

দুর্ভাগ্য এ দেশের দেওবন্দী ওলামাদের, দুর্ভাগ্য এ জাতির খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেব বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছেন। খতিবে আজম যদি সউদী আরবের মাটিতে জন্ম নিতেন নিঃসন্দেহে তিনি হতেন শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজ, শেখ নাসিরুদ্দীন আলবাণী, যদি মিশরে জন্ম নিতেন তিনি হতেন সাইয়েদ কুতুব ও হাসানুল বান্না, যদি আফগানিস্তানে জন্ম নিতেন তিনি হতেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী, যদি পাকিস্তানে জন্ম নিতেন তিনি হতেন মুফতীয়ে আজম আল্লামা মোহাম্মদ শফী ও মাওলানা মুফতী মাহমুদ আহমদ, যদি তিনি ইউরোপে জন্ম নিতেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল হতেন আর যদি কিউবার মাটিতে জন্ম নিতেন তা হতেন ফিডেল কেস্ট্রো।

খতিবে আজমের সফলতা ঃ মূল্যায়ন

মানুষ হিসেবে হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের (রহঃ) জীবনে সফলতার ভর জোয়ার যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে ব্যর্থতার চৈতালী হাওয়াও। তবে সফলতার চাইতে ব্যর্থতার মাত্রা অধিক ভারী। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে ইতিহাসের রায় মাওলানার পক্ষে যাবে।

মরহুম মাওলানা ছাত্র জীবনে অত্যন্ত অধ্যাবসায়ের সাথে পড়ালেখা চালিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নে নিয়মানুবর্তিতা তাঁর জীবনে বিস্ময়কর সফলতা বয়ে আনে। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা ছিলনা তার অঙ্গনে মাওলানা কম বেশি অবাধে বিচরণ করেননি। বাস্তব জীবনে মাওলানা সমানে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ছাত্র জীবনের একাগ্রচিত্তে আহরিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এছাড়া চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসায় এক বছর হাদীসের অধ্যাপনা কালীন জীবনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন ঝামেলামুক্ত থেকে। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ওয়াজ, বক্তৃতা, ফতোয়া প্রদান, অধ্যাপনাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অতীত অধ্যায়নের সুফল পেয়েছেন বিস্ময়কর ভাবে। আল্লাহ প্রদত্ত আশ্চর্যজনক স্মৃতি শক্তি মাওলানাকে খ্যাতির তুঙ্গে শৃঙ্গে নিয়ে গেছে। পাঠ্যজীবনের খুটিনাটি বিষয়ও মনে ছিল পরিণত বয়সে।

৪০ বছরের দীর্ঘ তাঁর শিক্ষকতা জীবন অনেকটা সফলতায় পরিপূর্ণ। মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি ছিলেন অধিকতর প্রতিষ্ঠিত। কিছু কিছু হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি চিরাচরিত ব্যাখ্যার পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাখ্যা প্রদান, যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে অত্যন্ত যুক্তি নির্ভর প্রবন্ধাদি লিখেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কর্তৃক প্রচারিত প্রশ্নমালার উত্তরে তিনি যে সমস্ত সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেছেন তা মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

বক্তৃতা, ওয়াজ ও সম্মুখ বিতর্কে মাওলানা নিঃসন্দেহে সফল। ওয়াজ ও বক্তৃতায় তাঁর নিজস্ব ষ্টাইল ছিল যে, কোন সাধারণ কথা ও ঘটনাকে এমন ভাবে মনের আবেগ মিশিয়ে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপিত করতেন যে, সবাই সম্মোহিত হয়ে পড়তো। স্বার্থক উপমা প্রয়োগ, সুন্দর বাচন ভঙ্গি ও কথা ঘুচিয়ে বলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার আয়ত্বে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রতি পক্ষকে হত বুদ্ধি করে দেয়ার মত উপস্থিত বুদ্ধি ও যুক্তি তাঁকে অনন্য ও অসাধারণ করে তুলে।

মরহুম মাওলানা আজীবন ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে তাওহীদের ধর্ম উদঘাটনে সচেষ্ট ছিলেন। রিসালাতের ভূমিকা ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে সারা জীবনই দাওয়াতী কাজ করেছেন বক্তৃতার মাধ্যমে। তবে জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর ওয়াজের বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ তাসাউফ ভিত্তিক। দ্বিতীয় ভাগে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধান্য পায়। এ সময়ে তিনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস পান। শেষভাগে তাঁর ওয়াজ ও বক্তৃতায় মুসলমানদের ঐক্যের ডাকই ছিল মূল সুর। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমাদের একতাবদ্ধ করা না গেলে এবং ইসলামী দলগুলোর মধ্যে নুন্যতম ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি না হলে এদেশে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

রাজনীতির অঙ্গনে মরহুম খতিবে আজমের ভূমিকা মোটামুটি উজ্জ্বল। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করলেও রাজনীতিকে একমাত্র নেশা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে

পারেননি। দীর্ঘ ৩০ বছরের রাজনীতিতে তিনি ছিলেন খণ্ডকালীন কর্মী (Part time worker)। ইসলামী রাজনীতিতে তিনি অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছেন। তবে তা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করেননি। স্বৈরাচারী শাসনের অবস্থান করে এবং ইসলাম বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল জোরদার। তাঁর নিজের দল নেজামে ইসলামের সাংগঠনিক ভিতকে মজবুত করার ক্ষেত্রে তিনি বেশি সময় দেননি। কিন্তু নেজামে ইসলামের প্রধানের পদে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন আসীন। কারণ ওলামাদের মধ্যে মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের বিকল্প নেতৃত্ব ছিল না। ইলম ও বিজ্ঞতার কারণে ওলামাদের মধ্যে খতিবে আজমের প্রভাব ছিল অপরিসীম। নেজামে ইসলামের গতিকে তিনি বেশী দূর যেমন এগিয়ে নিতে পারেননি তেমনি তাঁকে বাদ দিয়েও দলীয় কর্মীরা নেজামে ইসলামকে দাঁড় করাতে পারেননি। সংগঠনকে একটি সিষ্টেমের আওতায় আনা যায়নি বলে দ্বিতীয় স্তরের কোন নেতৃত্বও সৃষ্টি হয়নি। ফলে খতিবে আজমের অসুস্থতার সাথে সাথে নেজামে ইসলামের বাতিও নিবু নিবু হয়ে যায়।

মাওলানার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের চারটি বৈশিষ্ট্য আমাদের মূল্যায়নে স্পষ্ট হয়েছে।

প্রথমত ঃ তিনি এমন এক সময় রাজনীতিতে এসেছেন যখন আলেমদের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ বৃক্ষের পরশে যাওয়ার মত ছিল। মাওলানা আতহার আলীর (রহঃ) পর দেওবন্দী ধারার আলেমদের মধ্যে তিনিই অন্যতম যিনি আলেমদেরকে মসজিদ খানাকাহ্ থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার রাজনীতির ময়দানে আসার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ তিনি উদারতাশ্রয়ী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। সংকীর্ণ কুট বুদ্ধি তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে কালিমা লিপ্ত করতে পারেনি। সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ আসন লাভকারী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে শাসন তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি অশালিন ও কুটক্তি করাকে তিনি অপছন্দ করতেন, তবে যুক্তি নির্ভর ও গঠনমূলক সমালোচনাকে তিনি স্বাগত জানাতেন।

তৃতীয়ত ঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে দলবদল একটা স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতার কপালে দলবদলের কলংক তিলক রয়েছে। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ইসলামী আন্দোলনের কাফেলাকে পিছনে ফেলে রেখে ক্ষমতার মঞ্চে আরোহন করেননি। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। আইয়ুব, ইয়াহিয়া ও জিয়াউর রহমানের আমলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের টোপ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনি।

চতুর্থত ঃ ইসলামী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি "একলা চলা নীতিতে" বিশ্বাসী ছিলেন না বলে সর্বদা ঐক্যের রাজনীতি করেছেন। আকীদা ও কৌশলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেশ,

জাতি ও ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন দল পার্টির সাথে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ তৈরি করেছেন। যুক্তফ্রন্ট, পি,ডি, এম, ডাক, আই, ডি, এল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কি পারিবারিক পরিবেশে, কি রাজনৈতিক চত্ত্বরে, কি শিক্ষাঙ্গনে তিনি আদেশের সুরে (Commanding Tune) কথা বলতেন না। সরোবর সলিলের মতো তিনি ছিলেন শান্ত।

মাওলানার জীবনে হযরত ওসমানের (রাঃ) সারল্য ছিল কিন্তু হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) কঠোরতা ছিল না।

শিবলীর কলম ছিল তাঁর হাতে, তিনি কিন্তু তা চর্চা করেননি; গাজ্জালীর চিন্তা ছিল তাঁর মাথায় সুতি কিন্তু তা সংরক্ষণ করেনি এবং ইবনে তাইমিয়ার উদ্যম ছিল তাঁর হৃদয়ে, কিন্তু পুরোপুরি বিকশিত হয়নি; হয়তো পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বা নিজ উদ্যোগের অভাবে।

মাওলানার সবচে বড় Set Bck তিনি নিজকে নিজে আবিস্কার করতে পারেননি। তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান তিনি করেননি। কি অফুরন্ত মেধা, কি বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য, কি চমৎকার প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, কি নজির বিহীন বিশ্লেষণ ক্ষমতা, কি অভূতপূর্ব স্মৃতি শক্তি আল্লাহ তাঁর খর্বকার দেহে কুটি কুটি করে ভরে দিয়েছিলেন সে আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি। তিনি যদি খুঁজে বের করতেন তা হলে রচিত হতো নূতন ইতিহাস; সমৃদ্ধ হতো দূর ভবিষ্যত।

মোট কথা বাঙ্গালী আলেম সমাজের যে অগ্রসর পরিমণ্ডল সে স্তর থেকে উঠার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) খুব বেশি উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। যদি ব্যতিক্রম ধর্মী হয়ে উর্ধ্বে ও উঠতেন হয়তো ওলামারা তাঁর নেতৃত্ব মানতেন না। সামগ্রিক এ অনগ্রসরতা সম্পর্কে মাওলানার পূর্ণ সচেতনতা ছিল।

মাওলানার জীবনে আর্থিক দৈন্যতা মাত্রাতিরিক্ত না থাকলেও সম্পদের প্রাচুর্য ছিলনা। ফলে সঙ্গত কারণে অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে তাঁকে অনেক মূল্যবান শ্রম ব্যয় করতে হতো। পরিবারের বিরাট ব্যয়-নির্বাহের জন্য তিনি কখনো কখনো হিমশিম খেয়ে যেতেন। কারণ তিনিই ছিলেন তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা এবং ওয়াজ মাহফিল থেকে প্রাপ্ত সামান্য আয় দিয়ে তিনি সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। যার কারণে জীবনের শেষ পর্যায়ে ও অর্থোপার্জনের এ দু'উৎসের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়েছে বেশী। অর্থ উপার্জনের বিকল্প কোন পন্থা তিনি হয়তো উদ্ভাবন করেনি, ইচ্ছাকৃত ভাবে অথবা প্রয়োজন মনে করেননি। পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে যে সব পাওনা বা ইচ্ছা করলে যে সব পেতেন কিছুই তিনি গ্রহণ করেননি। ৫৪- ৫৬ সালে ধানমণ্ডী এলাকা অনেকটা পরিত্যক্ত ছিল। অনেক এম,পি, নামমাত্র মূল্যে অনায়াসে এক বা একাধিক প্লটের মালিক হয়েছেন বা তাদের রাজনৈতিক জীবনে প্রকৃত কাজে এসেছে। রাজধানীতে মাওলানার মাথা গোজার নিজস্ব কোন ঠাই না থাকায় পরবর্তী জীবনে তাঁকে অনেক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেখেছি এজন্য তাঁর আক্ষেপ ছিল না। কোন রাজনীতিবিদের পক্ষে এ যুগে নিঃস্বার্থ হতে পারাটা সত্যিই বিস্ময়কর ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। রাজনীতির বিনিময়ে পার্থিব সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করাকে হয়তো মাওলানা রাজনৈতিক অসততা মনে করতেন, তাই এ পথে পা বাড়াননি।

منشور

کل پاکستان مرکزی جمعیت علمائے اسلام و نظام اسلام

منجانب

مولانا صدیق احمد صاحب

ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت علمائے اسلام و نظام اسلام

۲۰۰ - النور چیمبرز پریڈی اسٹریٹ

کراچی

تمہید

سیاست کی جدید اصطلاحات میں سے منشور بھی ایک اصطلاح ہے جس سے
مراد وہ دستاویز ہے جو کسی پارٹی کی طرف سے شائع کی جاتی ہے جس میں پارٹی اور جماعت کے سیاسی
عزائم اور منصوبوں کا اظہار کیا جاتا ہے تاکہ قوم منشور میں درج شدہ وعدوں کی بنا پر اپنی ہمدردیاں
وابستہ کرنے اور ووٹ دینے کا صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اس بنا پر آج کل جماعتوں اور پارٹیوں کے
منشور بھی زیادہ تر سیاسی سوگن یا مستقبل کے سبز باغ کی طرح نمائشی ہوتے ہیں جن میں عوام سے ایسے
خوشنما وعدے کئے جاتے ہیں جن کے ایفاء کا خود جماعتوں کو یقین بھی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات
ان کا ایفاء ممکن بھی نہیں ہوتا جس کا لازمی نتیجہ ابھر کر دشمنی اور مایوسی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے
اسلامی منشور میں اس قسم کے فریب اور خوشنما وعدوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ
اسلامی نظام میں اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کا ہے اور وہی قانون کا منبع اور سرچشمہ ہے جو حقوق
قرآن و سنت نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں وہ کوئی سلب نہیں کر سکتا اور جو اللہ اور اس
کے رسول نے نہیں دئے ان کو دنیا کی کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتی اس لئے قرآن و سنت پر
مبنی منشور کا عنوان ہی ملک کے تمام باشندوں کے لئے انفرادی و اجتماعی سیاسی، معاشی اور
معاشرتی و اقتصادی تمام حقوق کا ضامن ہے

اغراض کرکے دولت کی منصفانہ گردش ... تقسیم کے منصوبے ...
حقیقت میں انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کرکے قائم ہونے والے اسلامی ملک کے یہی دو بنیادی مقصد تھے جو کسی اجنبی ملک میں پورے نہیں ہو سکتے تھے اور جن کے بروئے کار لانے کے لئے اسلامی ملک اور دارالاسلام قائم کرنے کی ضرورت تھی۔

اس منشور کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ حقائق کی تعبیر اور اظہار مدعا کے لئے ہم نے کوئی ایسا لفظ اور ایسی اصطلاح استعمال نہیں کی جس سے لادینی مغربیت سے مرعوبیت ٹپکتی ہو۔ کیونکہ ہمارے نزدیک اسلامی اور دینی مفہوم کو ظاہر کرنے کے لئے لادینی نظام کی کوئی اصطلاح اس مفہوم کو ادا کرنے سے قاصر ہے اور ہماری دینی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ قرآن و سنت کے مفہوم کو ظاہر کرنے کے لئے تعبیر الفاظ کی بھیک دوسرے لادینی نظاموں سے مانگیں۔ حتی الامکان قرآن و سنت کی اصطلاح اور دینی الفاظ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

احیاء دین کیلئے عملی اقدامات

۱۔ اسلام کے ضروری احکامات کو ہر مسلمان باشندے تک پہنچانے کے لئے نشر و اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کر ایسا معاشرہ تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں خدا کے خوف و آخرت کی فکر اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو زندگی کے ہر شعبہ میں اولیت حاصل ہو جس میں خالص اسلامی جذبات پروان چڑھیں اور جس میں بدی کی طرف بڑھنا مشکل اور نیکی کی طرف جانا آسان ہو۔

۲۔ اقامت صلوٰۃ کیلئے ملک گیر مہم چلائی جائے گی اور اس کی ابتدا حکومت ... سرکاری ادارو

سے ہوگی۔

۳۔ مساجد کو علمی اور دینی مرکز کی مقام کی حیثیت دی جائے گی۔ ان میں ایسے آئمہ کو مقرر کیا جائیگا جو دین کے ضروری علم اور دیانت و تقویٰ کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کی اخلاقی اور دینی تعلیم و تربیت میں رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے سکیں۔ اس غرض کے لیے آئمہ کے علمی اور دینی رتبے کو ان کے شایان شان بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کئے جائیں گے۔

۴۔ ارکان اسلام کی ادائیگی اور شعائر اسلام کے فروغ کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جائیگا

۵۔ حج کے سفر پر تمام وہ پابندیاں اٹھالی جائیں گی جس کی وجہ سے بہت سے مومن حج اپنے فریضہ کی ادائیگی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ زرمبادلہ کی بچت کے لیے دوسرے غیر ضروری اخراجات کو ختم کیا جائیگا۔

۶۔ اوقاف کا انتظام ایسے مستند علماء دین اور صاحب الرائے اشخاص کے سپرد کیا جائیگا جن کے علم و دیانت اور انتظامی صلاحیت پر امت اعتماد کرتی ہو تاکہ وہ اوقاف کی آمدنی کو شریعت کے مطابق صرف کریں۔

۷۔ ایسے لٹریچر پر پابندی عائد کی جائے گی جس میں اسلام، انبیاء علیہم السلام، صحابہ و تابعین اور آئمہ دین کی شان میں گستاخی کی گئی ہو یا کسی اسلامی فرقہ کے مقتداؤں پر سب وشتم یا اشتعال انگیزی کی گئی ہو یا جس سے پاکستان یا نظریہ پاکستان کی اہانت ہوتی ہو۔ یا جو فحاشی و عریانی پھیلانے والا ہو۔

۸۔ مسلمانوں کے لیے شراب اور فحاشی و عریانی پر سختی کے ساتھ ممنوع ہوگی۔ سب سے پہلے سرکاری تقریبات اور پاکستان سفارت خانوں کو ان خرافات سے پاک کیا

٢۔ عام انتظامی معاملات میں ان کے راستے مسلمانوں کی طرح متعین ہونگے۔

٣۔ خالص اسلامی معاملات میں ان کے ذہن کے مجاز نہ ہونگے۔

صنعت و تجارت

١۔ ملکی صنعت کو اس حد تک اس حد تک ترقی دی جائے گی کہ ملک اپنی بنیادی ضروریات خود پیدا کرنے کے لیے قابل ہو جائے۔ اور صنعتی ترقی کا فائدہ چند افراد کی حد تک محدود رہنے کے بجائے ملک کے عوام تک پہنچے اور اس سے عام خوشحالی کی فضا پیدا ہو جس کی صورت یہ ہوگی کہ صنعتی اجارہ داریاں جو کارٹیل (سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ) وغیرہ کی شکل میں رائج ہیں ان سب کو ممنوع قرار دے کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے گی اور اس طرح ناجائز نفع خوری کا سد باب کیا جائے گا۔

٢۔ وہ نئی قائم ہونے والی کلیدی صنعتیں جو اس وقت نیم سرکاری نوعیت رکھتی ہوں گی مثلاً جہاز رانی جہاز سازی، ریلوے، نور و سوزی تیل وغیرہ۔ انہیں حکومت خود اپنی نگرانی میں چلاتی رہے گی۔ لیکن ان میں بھی حصص صرف ان لوگوں کے قبول کئے جائیں گے جن کی آمدنی ایک ہزار روپیہ ماہانہ سے کم ہو یا جن کا بنک بیلنس پانچ ہزار روپے یا اس سے کم ہو۔

٣۔ سود کی تمام صورتیں خواہ وہ صرفی سود ہو یا تجارتی ممنوع ہونگی۔ اور بنکاری سسٹم سود کے بجائے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کی صورت میں شرکت اور مضاربت کے اسلامی اصولوں پر چلایا جائے گا۔ جو ماہرین بنکاری کے نزدیک نہ صرف ممکن بلکہ زیادہ مفید ہیں۔ چھوٹی صنعتوں کا رواج دے کر ملک کو زیادہ ترقی دی جائےگی

کی تدریج سے آزاد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جب تک یہ ممکن نہ ہو سود
قرضے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سخت مجبوریوں کی حالت میں غیر سودی
مدت سے ... [illegible] جو کوشش شریعت نے دکھائی ہے ... [illegible]
... کے کاروبار کو ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اور کوئی شخص کسی چیز پر قبضہ حاصل کرنے
سے پہلے اسے آگے بیچ نہ سکے گا۔

قمار کی تمام صورتوں کو جن میں انشورنس کے مروجہ طریقے، سٹہ بازی اور انواع
واقسام کی لاٹریز شامل ہیں ممنوع قرار دیا جائے گا۔ انشورنس کے بجائے شرعی
اصول کے مطابق امداد باہمی کا نظام قائم کیا جائیگا۔

غیر شرعی ذخیرہ اندوزی کو سختی سے روکا جائیگا۔ اور اس پر قید و بند و جسمانی تعزیرات
مقرر کی جائیں گی۔

اسلامی اصول کے مطابق تجارت کو لائسنس پرمٹ کی پابندیوں سے آزاد رکھا جائیگا
تاہم [illegible] یعنی صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے درآمد پر پابندی عائد کرنا۔

( ) کا طریقہ اسلام میں صرف بدرجہ مجبوری ہی گوارا کیا
جا سکتا ہے۔ لہذا اسلامی حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ غیر ملکی تجارت پر عائد
شدہ پابندیاں رفتہ رفتہ ختم کرکے تدریجاً تجارت کو آزاد کیا جائیگا۔ اس مقصد کے
لیے حکومت زر مبادلہ کی مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ مثلاً اس غرض کے
لیے غیر ملکی تجارت میں تبادلہ اشیا (بارٹر) کے طریق کار کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے
کی کوشش کی جائے گی۔ اور جب تک زر مبادلہ کی مشکلات باقی ہیں اس وقت تک
غیر ملکی تجارت کے لائسنس انصاف اور معقولیت کے ساتھ اس طرح جاری کئے

جو پاکستان میں مناسب معیار کی تیار ہونے لگی ہیں۔ شراب سور کا گوشت [illegible] دیگر نشہ آور و مضر صحت ناجائز حرام اشیا نیز سامان تعیش کی پیداوار [illegible] پر مکمل طور پر بندکر دی جائے گی۔

۱۲۔ مشرقی پاکستان میں [illegible] پی آئی اے [illegible] اور این ڈی بی کے خود مختار مستقل دفتر قائم کئے جائیں گے۔

۱۳۔ چوتھے اور پانچویں منصوبوں میں مشرقی پاکستان خصوصاً اس کے شمالی حصہ کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور اب تک ملک کے مشرقی حصہ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کی جائے گی۔

عام معاشی اصلاحات

۱۔ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولیابی اور ادائیگی کا باقاعدہ اور مکمل انتظام کیا جائے گا اور اس کے تحت حسب ذیل اقدامات کئے جائیں گے۔

(الف) ایسا قانون بنایا جائیگا جس کی رو سے زکواۃ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

(ب) قیام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکواۃ ادا نہیں کی ہے ان سے گذشتہ سالوں کی زکواۃ ادا کرنے کے لئے قانوناً مجبور کیا جائیگا۔

نظام زکواۃ سے متعلق جملہ امور کی نگرانی کے لئے ایک مستقل محکمہ قائم کیا جائیگا جس میں ایسے افراد شامل ہونگے جو احکام شرع سے بھی واقفیت رکھتے ہوں اور متدین بھی ہوں۔

۲۔ ملک کے ہر باشندے کے لئے روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کئے جائیں گے۔

۳۔ "النفقات" کے بارے میں اسلامی قانون کو مکمل طریقے پر نافذ کیا جائیگا اور جن یتیموں، بیواؤں
بیماروں اور اپاہجوں کی کفالت شریعت کی رو سے ان کے رشتہ داروں کے ذمہ ہے ان
کے رشتہ داروں کو ان کی کفالت پر مجبور کیا جائیگا۔ اور اگر رشتہ داروں اور اولیاء
میں اس کے تحمل کی گنجائش نہیں یا ان کا وجود ہی موجود نہیں تو سرکاری بیت المال سے
اس کی کفالت کی جائے گی۔

۴۔ بیت المال کی طرف سے ایسے ادارے قائم کئے جائیں کہ جو ملک کے عام باشندوں
کے لئے رفاہ عام کا کام دے سکیں۔ مثلاً ایسے ہسپتال اور شفاخانوں کا قیام جو کہ
غریبوں کی بر وقت مفت طبی امداد مہیا کریں گے۔

۵۔ سرکاری اخراجات میں اصراف پر کڑی نگرانی کر کے تمام محرمات فضول اخراجات کو بند
کر دیا جائیگا۔

۶۔ پورے ملک میں سادہ طرز معیشت ایک تحریک کی شکل میں اختیار کیا جائے گا اور
اعلیٰ حکام اس کی ابتدا اپنے آپ سے کریں گے۔

---

۵ اگر ملک کے موجودہ حالات پر غور کیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ ہمارے عوام کی معاشی مشکلات کی
بڑا دخل اسکو ہے کہ طرز معیشت یورپ کا پیدا کیا ہوا نیشن پرستی کی بیماری عام ہوتی ہے بہت سی غیر صحت مند قسم کے
کھیل تماشے زندگی کا جز بنا دیئے گئے ہیں۔ ایک نیک انسان اپنی برادری میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لئے طرح طرح
سے فضولیات کا پابند ہونے پر مجبور ہو گیا ہے اگر کسی معمولی مثلاً انسان کبھی اپنے اخراجات کا جائزہ لے تو اس
کا ایک بڑا حصہ اس قسم کی فضولیات پر صرف ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جائز آمدنی ان کی معیشت کے لئے کافی
نہیں ہوتی تو رشوت دھوکہ بازی وغیرہ کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

کی کوشش کی جائے گی کہ جس سے دیہی آبادی کا روزگار متاثر نہ ہو۔

۱۴۔ بٹائی کے معاملے میں کاشتکاروں کو مالکان زمین کے ظلم سے بچانے کے لئے ان تمام ناجائز شرطوں کو قانوناً ممنوع قرار دیا جائے گا جو زمیندار قولی یا عملی صورت سے کاشتکاروں پر عائد کرتے ہیں۔ پیداوار کے مقررہ حصہ کے علاوہ اور کوئی حق کاشتکار کے ذمہ زمیندار کا زمین کاشتکار پر نہیں ہوگا۔ ضرورت سمجھی گئی تو بٹائی کی مناسب شرح بھی مقرر کر دی جائیگی اور اگر ان اقدامات کے ذریعے زمینداروں کے ظلم و ستم پر خاطر خواہ طریقے سے قابو نہ پایا جا سکے تو ایسی ناسد بٹائی کے بجائے ٹھیکہ کے طریقے رائج کئے جائیں گے۔

۱۵۔ ہر قسم کی بیگار کو سختی کے ساتھ روک دیا جائیگا۔ اور خلاف ورزی پر تعزیر مقرر کی جائیگی۔

۱۶۔ زرعی تنازعات کے تصفیہ کے لئے ایسی سہل الحصول پنچایتیں عدالتیں قائم کی جائیں گی جو آسان طریقہ پر مقدمات فیصل کر سکیں

۱۷۔ ایسے قوانین کو ختم کیا جائیگا جن کی رو سے زرعی زمینوں پر بنی ہوئی مساجد، مدرسوں اور وقف شدہ دینی اداروں سے کسی بھی شکل میں لگان وصول کیا جاتا ہو۔

۱۸۔ قرضوں کے سلسلے میں آلات زراعت اور مزدوروں اور کاریگروں کے آلات اور بقدر ضرورت غلہ قرق نہیں کیا جا سکیگا۔

۱۹۔ ایسا انتظام کیا جائیگا جس سے پاکستان کا ہر صوبہ غذا کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ چیزیں برآمد بھی کی جا سکیں۔

تعلیم

۱۔ ملک کے باشندوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں علم و فن کا ماہر بنانا جو سچے مسلمان ہونے

کے ساتھ ساتھ ایک آزاد ملک اور ایک اسلامی حکومت ہونے کے قابل ہو سکیں۔

۲۔ حکومت کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ملک کے باشندوں کو کم از کم میٹرک تک تعلیم دے اور بتدریج تعلیم کو مفت بنانے کی کوشش کرے۔

۳۔ مرکز کی طرف سے ایک ایسا تعلیمات کا محکمہ قائم کیا جائے گا۔ جو پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں کے تعلیمی اداروں میں ذہنی اور فکری طور پر تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کر سکے

۴۔ تعلیم کا نصاب اور نظام اس طرز پر بنایا جائے گا کہ طلبہ کے سامنے تعلیم کا مقصد محض حصول معاش نہ ہو۔ بلکہ ذات کی تکمیل اعلیٰ انسانی اوصاف کا حصول اور ملک و ملت کی خدمت ہو۔

۵۔ نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر علم و فن کے نصاب کو اس طرح مرتب کیا جائے گا کہ:۔

(الف) اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے نکتہ نظر ہر علم و فن میں رچے بسے ہوئے ہوں۔

(ب) ہر علم و فن کی تعلیم اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر کے ساتھ دی جائے۔

۶۔ اسلامیات کی تعلیم کا معیار بلند کیا جائے گا اور عربی تفسیر حدیث فقہ اور عقائد کی [illegible] تعلیمات اتنی مقدار میں دی جائیں گی کہ دسویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ہر طالب علم کے سامنے اسلام کی ایک صحیح اجمالی تصویر آ جائے۔ اور پانچویں جماعت تک ناظرہ قرآن کریم ختم کرا دیا جائے۔

۷۔ اسلامیات کی تعلیم گریجویشن تک لازمی قرار دی جائیں گی۔ اور عربی زبان کو اس کا لازمی جز بنایا جائے گا۔

۸۔ ملک کے مسئلہ صحت کو حل کرنے اور معالجہ کی سہولت کو عام اور سستا پہنچانے کی خاطر طب یونانی

ہومیوپیتھی اور آیورویدک وغیرہ طریقہ علاج کو سرکاری سرپرستی میں ترقی دی جائیگی

۹۔ ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا جائے گا جو اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ اسلام اور پاکستان سے کما حقہ محبت وعقیدت اور نظریاتی وابستگی رکھتے ہوں۔

۱۰۔ درسگاہوں کے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگا جائیگا۔

۱۱۔ مخلوط طریقہ تعلیم کو ختم کرکے عورتوں کی تعلیم کے لئے الگ نظام اور نصاب بنایا جائیگا جو ان کے مقصد تخلیق کے ہم آہنگ ہو اور انہیں ایک صحت مند اسلامی معاشرہ کو ابھار بنا سکے

۱۲۔ ملک کی دونوں قومی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ اور مغربی پاکستان میں اردو کے ساتھ بنگلہ اور مشرقی پاکستان میں بنگلہ کے ساتھ اردو کو ثانوی درجہ میں لازمی قرار دیا جائیگا

۱۳۔ دینی مدارس کو منظم کرکے ایک آزاد اور خود مختار بورڈ بنایا جائیگا۔ جو ایسے ایسے مستند علمائے دین پر مشتمل ہوگا جن کے علم و دیانت پر امت اعتماد کرتی ہو اور جو دینی مدارس کا تجربہ رکھتے ہوں۔ یہ بورڈ دینی مدارس کے نظام میں ہم آہنگی پیدا کرکے ان کے نصاب کو ایک آزاد اسلامی ملک کے تقاضوں کے مطابق بنائے گا۔ اور اس بورڈ کی دی ہوئی اسناد منظور شدہ ہونگی۔ جن کا درجہ گریجویشن سے کم نہ ہوگا۔ کسی خاص فن میں تخصص اور ترتیب کامیاب ہونے والوں کو ایم اے کا درجہ دیا جائیگا۔ اور ان دینی مدارس کے بقا و تحفظ اور ہر قسم کی ترقی کا مکمل انتظام کیا جائیگا۔

۱۴۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سائنس اور ٹیکنیکل تعلیم سے اب تک جو کوتاہی برتی گئی ہے اس کو ختم کرکے تعلیم سے ان شعبوں میں وہ خصوصی مقام دیا جائے گا جن کے وہ پاکستان کی ضروریات کے لحاظ سے فی الحقیقت مستحق ہوں۔

۱۵۔ اس تذکرہ [illegible] شایان شان بنایا جائے گا۔

۱۶۔ اساتذہ کی تربیتی کورس میں اسلامیات کو خاص اہمیت دی جائے گی

۱۷۔ شعبہ تعلیم حکومت کی انتظامیہ سے آزاد ہوگا تاکہ سیاسی پارٹیوں اور انتظامیہ کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے۔

۱۸۔ ملک میں ایک اسلامی یونیورسٹی اعزازی قائم کی جائے گی جس کی شاخیں ملک کے تمام گوشوں میں پھیلائی جائے گی۔

۱۹۔ تمام ان مشنری تعلیمی اداروں کو جو کہ وقت اسلام دشمن سرگرمیوں کے مرکز بنے ہوتے ہیں بند کر دیا جائیگا۔ پاکستان کے غیر مسلم باشندے خود تعلیمی ادارے قائم کر سکیں گے۔ لیکن ان کے لئے غیر ملکی امداد کا حصول ممنوع ہوگا۔ اور ان اداروں میں صرف غیر مسلم طلباء ہی تعلیم پا سکیں گے۔

سرکاری ملازمین

۱۔ موجودہ حالت میں تنخواہوں کے درمیان جو غیر معمولی تفاوت پایا جاتا ہے اس کو بتدریج کم کرکے ایک اور دس کی حد تک رکھا جائے گا۔ پنشن کی شرح بھی اونچے درجات میں کم اور نیچے درجات میں زیادہ مقرر کی جائے گی۔ البتہ پاکستان کے مخصوص فنی اور تکنیکی ماہرین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے خصوصی الاؤنس بھی جاری کئے جا سکیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو ناانصافیاں اب تک ہو چکی ہیں تقریباً پانچ سال تک ان کی مکمل تلافی کی جائے گی۔

۲۔ ملازمتوں کے سلسلے میں تمام صوبوں کے ساتھ ان کی آبادی کے تناسب سے منصفانہ سلوک کیا جائیگا۔ اور ترجیح صرف اہلیت کی بنا پر ہوگی۔

۳۔ ملازمین کے تقرر میں ان کی متعلقہ اہلیت اور کارکردگی کے علاوہ ان کے اخلاق و کردار

پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی ۔ ورنہ ترقی دیتے ہیں اس کا نقص دور نہ کیا جائے گا ۔

۴۔ ہفتہ واری تعطیل اتوار کے بجائے جمعہ کو مقرر کی جائے گی ۔ دو غیر ضروری کی تعطیلات ختم کر کے اسلامی تہواروں کی تعطیلات میں اضافہ کیا جائیگا

۵۔ دفاتر اور تعلیمی اداروں کے اوقات میں نمازوں کی رعایت رکھی جائے گی ۔

مقننہ

۱۔ مقننہ ملک کا کوئی بھی قانون قرآن وسنت کے خلاف بنانے کی مجاز نہ ہوگی

۲۔ قرآن وسنت کے اور باشندوں کے مقرر کردہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی صورت میں مقننہ کی قانون سازی کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا ۔

۳۔ ملک کے کسی بھی باشندہ کو مشرعی اصول پر مقدمہ چلائے بغیر اور صفائی پیش کرنے بغیر قید نہیں کیا جائیگا ۔ اور ایسے قوانین منسوخ کر دیئے جائیں گے ۔ جن کی رو سے حکومت کو اس قسم کے اختیارات ملتے ہیں ۔

۴۔ پاکستان کا ہر باشندہ قانون کی نظر میں برابر ہوگا ۔ لہذا کوئی شخص قانون سے بالاتر متصور نہیں ہوگا ۔

مرکزی اور صوبائی بجٹ

الف :۔ ملک کا بجٹ بناتے ہوئے اسلام کا یہ اصول سامنے رکھا جائیگا کہ ملک کے تمام سرکاری خزانے درحقیقت ملک و ملت کی امانتیں ہیں اور حکام کی حیثیت سے صرف نگران اور امین کی ہے لہذا سرکاری خزانوں میں سے ملک کے کاموں پر جو کچھ خرچ کیا جائے اس میں ملک کے

--

تمام باشندوں کی معیارِ زندگی کو سب سے ملحوظ ہونا چاہیے۔ زیادہ سے
زیادہ حصہ ملک کے عوام پر صرف ہونا چاہیے۔ سرکاری خزانے حکومت کی فضول
خرچیوں اور حکام کی عیش پرستیوں پر خرچ ہونے نہیں دیا جائے گا۔

(ب) غربا و مساکین کے لئے معدنیات پر خمس کا طریقہ مقرر کیا جائے گا اور خمس کی یہ
رقم بیت المال میں جمع کی جائے گی۔

(۱) اس رقم سے غربا و مساکین کے لئے قومی دستی کارخانے قائم کئے جائیں گے یا ان کے لئے
روزگار کے لئے کاروبار مہیا کئے جائیں گے۔

(۲) اس مد میں لقطے، متروکہ لاوارث، کسٹم سے ضبط شدہ اور اسمگلروں کے متروکہ
اموال بھی جمع کئے جائیں گے۔

(۳) ملک کے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ افسران کو رفتہ رفتہ سادہ زندگی پر لانے کے لئے ہر مالی بجٹ
میں مندرجہ بالا مد کے لئے رقم مختص کی جائے گی تاکہ رفتہ رفتہ اس رقم میں توسیع ہوتی رہے
(۴) اس مد کی رقوم سے قائم شدہ قومی صنعتوں اور کارخانوں کو ہر قسم کے مراعات و سہولتیں دی
جائیں گی

عدلیہ

۱۔ انصاف کو مفت اور سہل الحصول بنایا جائے گا۔

۲۔ ضابطہ شہادت میں اسلامی احکام کو سختی کے ساتھ نافذ کیا جائے گا۔ اور ان برائیوں
کی روک تھام کی جائے گی جو موجودہ نظام شہادت میں پائی جاتی ہے۔

۳۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا۔

۴۔ انصاف کو سہل الحصول بنانے کے لئے ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری کے موجودہ طریقے کو بدل کر ایسے شرعی طریقے وضع کئے جائیں گے جن کے ذریعہ غریب سے غریب انسان دادرسی کے لئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ اور مختصر مدت میں انصاف حاصل کر سکے۔

۵۔ مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے مخصوص جلد انصاف مہیا کرنے والی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔

۶۔ ججوں کے تقرر ان کی علمی قابلیت کے علاوہ خدا ترسی اور کردار وعمل کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اور علمی قابلیت میں اسلامی قانون کا واقف ہونا بھی شرط لازمی ہوگا۔

۷۔ سپریم کورٹ کی ایک مستقل بنچ ڈھاکہ میں رکھی جائے گی۔

۸۔ ملک کے ہر حصہ میں ابتدائی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ اور مشرقی پاکستان میں ان ابتدائی عدالتوں کو تھانوں تک قائم کیا جائیگا۔

انتظامیہ

۱۔ تمام غیر شرعی ٹیکس فوراً منسوخ کئے جائیں گے اور بوقت ضرورت اسلامی ضرورت کے مطابق ٹیکس کم سے کم لگائے جائیں گے۔

۲۔ سالانہ بجٹ میں تبلیغ اسلام کے لئے معقول رقم مختص کی جائے گی۔

۳۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے پسماندہ علاقوں کو دوسرے علاقوں کے مساوی درجہ میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔

۴۔ ریڈ کراس کی تنظیم کا نام بدل کر "ہلال احمر" رکھا جائے گا۔ اور اس تنظیم کو غیر مسلموں کے

جن سے ان حادثات میں نمایاں کمی بھی واقع ہوگی جو محض بے احتیاطی اور لاپرواہی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

۱۵۔ مشرقی پاکستان کی انتظامیہ کو بہتر بنانے کے لیے اس کو شہر ڈھاکہ کے علاوہ مزید تین صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

۱٦۔ مہاجروں کی آبادکاری کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے گا۔ اور ان کی جائیدادوں کے تبادلہ کی تمام تکالیف دور کی جائیں گی۔ اور اس کی پوری کوشش کی جائے گی کہ مقامی باشندوں اور مہاجروں میں مکمل طور پر اسلامی اخوت کا رشتہ قائم ہو۔

۱۷۔ پبلک سروس کمیشن کا مستقل دفتر مشرقی پاکستان میں ہوگا۔

مواسلات

۱۔ ریلوے اور ہوائی جہازوں میں نماز کی ادائیگی کا معقول انتظام کیا جائیگا

۲۔ ریلوے اور ہوائی جہازوں کے اوقات کے تعین میں نماز کے اوقات کا لحاظ رکھا جائیگا

۳۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں بحری اور بری سواریوں کی تعداد میں اس طرح اضافہ کیا جائیگا کہ یہ عوام کی ضروریات پوری کر سکیں۔

دفاع

۱۔ ملک کے تمام مسلمان باشندوں میں جذبۂ جہاد کو ترقی دی جائے گی۔

۲۔ تمام تعلیمی اداروں میں بنیادی فوجی تربیت کو لازمی قرار دیا جائے گا۔

۳۔ شہری دفاع کو منظم کرکے ہر شہری کو اس کی باقاعدگی کے ساتھ تربیت دی جائیگی

۳۔ مسلمان ممالک کی دولت مشترکہ قائم کرنے اور اس مقصد کے لئے [illegible] کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

۴۔ اسلامی ممالک کو جہاں جہاں غیر مسلموں کے ظلم کا سامنا ہے وہاں ان کی ہر ممکن امداد و حمایت کی جائے گی۔

۵۔ کشمیر، جوناگڑھ، مانادر پر ہندوستان کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف ایسے موثر مضبوط اقدامات کئے جائیں گے جن کے ذریعہ یہ مسائل ایک معقول مدت میں پرامن طور پر حل ہو جائیں اور اگر بھارت کی موجودہ مسلم کش پالیسی پر برقرار رہے تو ان مسائل کو جہاد کے ذریعہ حل کیا جائیگا۔

نیز فرخا بند امور کی طرح کے دوسرے مسائل جن سے پاکستان کو نقصان پہنچا قصور ہو ان پر بھارت کی جارحانہ طاقت کے ساتھ پوری شدت سے مقابلہ کیا جائیگا۔

۶۔ ہندوستان اور دوسرے تمام غیر مسلم ممالک کی مسلم اقلیتوں کی ہر ممکن امداد و اعانت کی جائے گی۔ اور ان پر ہونے والے ظلم ستم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر موثر کوشش کی جائے گی۔

۷۔ مسلم ممالک کے باہمی تنازعات کو ہر قیمت پر پرامن طریقے سے نپٹنے کی کوشش کی جائے گی

۸۔ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کو یہود کی استبداد سے آزاد کرانے کے لئے بھرپور جد وجہد کی جائے گی۔ اور ہر ممکن مالی اور فوجی وسائل استعمال کئے جائیں گے۔

۹۔ پاکستان کے سفارت خانہ کو ہر ملک میں ایسا فعال بنایا جائے گا کہ وہ غیر ممالک میں پاکستان و نظریہ پاکستان کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ اور ہر معاملہ میں ملک کے موقف کو زیادہ سے زیادہ موثر انداز میں ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔

١٠۔ تمام سفارت خانوں کے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگا جائے گا۔ دوران میں کسی تمباکو نوشی اور دیگر حرام و ناجائز حرکات قطعی ممنوع ہوں گی۔

معاشرتی اصلاحات

١۔ سادہ طرز معاشرت کو ایک تحریک کی شکل میں اپنایا جائے گا۔

٢۔ اسلامی طرز معاشرت کو فروغ دیا جائے گا۔ مغربی اور غیر اسلامی طرز معاشرت کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔

٣۔ ایسی تفریحات کو فروغ دیا جائے گا جو صحت و اخلاق کے لئے مفید اور اسلام کی رو سے جائز ہوں۔

٤۔ ان تفریحات کو ممنوع کیا جائے گا جو اسلام کی رو سے ناجائز ہیں۔

٥۔ معاشرے سے بے حیائی، فحاشی، عریانی اور دیگر اخلاقی کمزوریوں اور بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

٦۔ موجودہ عائلی قوانین کو منسوخ کیا جائے گا اور ایسے قوانین بنائے جائیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ اور جن میں عورتوں کی مشکلات کا حقیقت پسندانہ حل موجود ہو۔ خاندانی منصوبہ بندی اور تمام غیر شرعی قوانین کو فوراً ختم کیا جائے گا

٧۔ اسلام نے عورتوں کو دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ جو حقوق عطا کئے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے لئے خصوصی انتظامات کئے جائیں گے جن کے ذریعے ستم رسیدہ عورتیں ظلم سے بآسانی نجات حاصل کرسکیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اخراجات بے جا اور نام و نمود کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ تکمیل منشور کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین

۲۲ نکات

وہ بائیس نکات جو حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کے زیر صدارت ملک کے مختلف فرقوں کے نمائندہ علماء کے کنونشن نے متفقہ طور پر پاس کیے تھے

۱۔ اصل حاکم تشریعی و تکوینی حیثیت سے اللہ رب العالمین ہے۔

۲۔ ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا اور کوئی ایسا قانون نہ بن سکے گا نہ کوئی ایسا حکم دیا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

(تشریحی نوٹ) اگر ملک میں پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہوں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں تو اس کی تصریح بھی ضروری ہے کہ وہ بتدریج ایک معینہ مدت کے اندر منسوخ یا شریعت کے مطابق تبدیل کر دیئے جائیں گے۔

۳۔ مملکت کسی جغرافیائی، نسلی، لسانی یا کسی اور تصور پر نہیں بلکہ ان اصول و مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی اساس اسلام کا پیش کیا ہوا ضابطۂ حیات ہے۔

۴۔ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معروفات کو قائم کرے منکرات کو مٹائے اور شعائر اسلام کے احیاء و اعلاء اور متعلقہ اسلامی فرقوں کے لئے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔

۵۔ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ مسلمانان عالم کے رشتہ اتحاد و اخوت سے قوی تر کرنے اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان عصبیت جاہلیہ کی بنیادوں پر نسلی، لسانی، علاقائی یا دیگر مادی امتیازات کے ابھرنے کی راہیں مسدود کرکے ملت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ و استحکام کا انتظام کرے۔

(٦) مملکت بلا امتیاز مذہب ونسل وغیرہ تمام ایسے لوگوں کی لابدی انسانی ضروریات یعنی غذا، لباس، مکان، معالجہ اور تعلیم کی کفیل ہوگی جو اکتساب رزق کے قابل نہ ہوں یا نہ رہے ہوں یا عارضی طور پر بے روزگار ہوں، بیماری یا دوسرے وجوہ سے فی الحال سعی اکتساب پر قادر نہ ہوں۔

(٧) باشندگان ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت اسلامیہ نے ان کو عطا کیے ہیں یعنی حدود قانون کے اندر تحفظ جان و مال و آبرو، آزادی مذہب و مسلک، آزادی عبادت، آزادی ذات، آزادی اظہار رائے، آزادی نقل و حرکت، آزادی اجتماع، آزادی اکتساب رزق، ترقی کے مواقع میں یکسانی اور رفاہی ادارات سے استفادہ کا حق

(٨) مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانون کی سند جواز کے بغیر کسی وقت سلب نہ کیا جائے گا اور کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فراہمی موقع صفائی و فیصلہ عدالت کوئی سزا نہ دی جائے گی

(٩) مسلمہ اسلامی فرقوں کو حدود قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیروؤں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے۔ ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا انتظام کرنا مناسب ہوگا کہ انہیں کے قاضی یہ فیصلے کریں گے۔

(١٠) غیر مسلم باشندگان مملکت کو حدود قانون کے اندر مذہب و عبادت، تہذیب و ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی ہوگی اور انہیں اپنے شخصی معاملات کا فیصلہ اپنے فقہی مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق کرانے کا حق حاصل ہوگا۔

(١١) غیر مسلم باشندگان مملکت سے حدود شریعت کے اندر جو معاہدات کیے گئے ہیں ان کی پابندی لازمی ہوگی اور جن حقوق شہری کا ذکر دفعہ نمبر ۷ میں کیا گیا ہے ان میں غیر مسلم باشندگان ملک برابر کے شریک ہوں گے

(١٢) رئیس مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے جس کے تدین، صلاحیت اور اصابت رائے پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔

(۱۳) رئیس مملکت ہی نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا۔ البتہ وہ اپنے اختیارات کا کوئی جزو کسی فرد یا جماعت کو تفویض کرسکتا ہے۔

(۱۴) رئیس مملکت کی حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ شورائی ہوگی یعنی وہ ارکان حکومت اور منتخب نمائندگان جمہور سے مشورہ لے کر اپنے فرائض سرانجام دے گا۔

(۱۵) رئیس مملکت کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کو کلاً یا جزواً معطل کرکے شوریٰ کے بغیر حکومت کرنے لگے۔

(۱۶) جو جماعت رئیس مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی وہی کثرت رائے سے اسے معزول کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔

(۱۷) رئیس مملکت شہری حقوق میں عامۃ المسلمین کے برابر ہوگا اور قانونی مواخذہ سے بالاتر نہ ہوگا۔

(۱۸) ارکان و عمال حکومت اور عام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون و ضابطہ ہوگا اور دونوں پر عام عدالتیں ہی اس کو نافذ کریں گی۔

(۱۹) محکمہ عدلیہ محکمہ انتظامیہ سے علیحدہ اور آزاد ہوگا تاکہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہیئت انتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔

(۲۰) ایسے افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت ممنوع ہوگی جو مملکت اسلامی کے اساسی اصول و مبادی کے انہدام کا باعث ہوں۔

(۲۱) ملک کے مختلف ولایات و اقطاع مملکت واحدہ کے اجزاء انتظامی متصور ہوں گے۔ ان کی حیثیت نسلی، لسانی یا قبائلی واحدہ جات کی نہیں بلکہ محض انتظامی علاقوں کی ہوگی جنہیں انتظامی سہولتوں کے پیش نظر مرکز کی سیادت کے تابع انتظامی اختیارات سپرد کرنا جائز ہوگا۔ مگر انہیں مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہوگا۔

(۲۲) دستور کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔